Contents

আল্লামা জালালুদ্দীন সিয়ূতী (রাহ্.) রচিত

খাসায়েসুল কুবরা

নবী (সা.) জীবনের অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলী

২য় খণ্ড

অনুবাদ
মওলানা মুহিউদ্দীন খান
সম্পাদক : মাসিক মদীনা

মদীনা পাবলিকেশান্স

Contents

খাসায়েসুল কুবরা ঃ ২য় খণ্ড
জালালুদ্দীন আবদুর রহমান সিয়ুতী (রাহঃ)
অনুবাদ ঃ মুহিউদ্দীন খান

প্রকাশক ঃ
মদীনা পাবলিকেশান্স এর পক্ষে
মোস্তফা মঈনউদ্দীন খান
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ ঃ
রবিউল আওয়াল ঃ ১৪২০ হিজরী
আষাঢ় ঃ ১৪০৬ বাংলা
জুলাই ঃ ১৯৯৯ ইংরেজী

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
রবিউস সানি ঃ ১৪২০ হিজরী
শ্রাবণ ঃ ১৪০৬ বাংলা
আগষ্ট ঃ ১৯৯৯ ইংরেজী

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
অরণি কম্পিউটার্স
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় ঃ
মোস্তফা মঈনউদ্দীন খান

মুদ্রণ ও বাঁধাই ঃ
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ১১০·০০ টাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের আরজ

'খাসায়েসুল কুবরা' বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী মনীষা আল্লামা জালালুদ্দীন আবদুল রহমান সিয়ুতীর (রাহঃ) একটি বিস্ময়কর রচনা। আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহোত্তম জীবনের আশ্চর্যজনক দিকগুলো সম্পর্কিত সহীহ বর্ণনার এক অপূর্ব সমাহার এই মহাগ্রন্থটি। হিজরী নবম শতাব্দীর পর সারা দুনিয়াতে সীরাতে নববীর (সাঃ) যতগুলো পরিপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে এমন গ্রন্থ খুব কমই পাওয়া যাবে যাতে 'খাসায়েসুল-কুবরা' নামক গ্রন্থটির উদ্ধৃতি দেখা যায় না।

দুই খণ্ডে সমাপ্ত এই অসাধারণ গ্রন্থটি সম্পর্কে খোদ আল্লামা সিয়ুতী (রাহঃ) গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "আমার শ্রমসাধ্য এই রচনাটি এমন উচ্চ মর্তবাসম্পন্ন একখানা কিতাব, যার অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলেম ব্যক্তিমাত্রই সাক্ষ্য দিবেন।এটি এমন এক রহমতের মেঘখন্ড যার কল্যাণকর বারি সিঞ্চনে নিকটের এবং দূরের সবাই উপকৃত হবেন। নিঃসন্দেহে এটি একটি অসাধারণ মূল্যবান রচনা। অন্যান্য সীরাত গ্রন্থের মোকাবেলায় এটি এমন একটি কিতাব, যাকে কোন সম্রাটের মাথার মুকুটে সংস্থাপিত একখানা উজ্জ্বল হীরক খন্ডের সাথেই তুলনা করা যেতে পারে। ...... এটি এমন একটি সুগন্ধ ফুলের সাথেই শুধু তুল্য হতে পারে, যার সুগন্ধি কখনও বিনষ্ট হয় না। হৃদয়-মন আলোকোজ্জ্বলকারী এই অনন্য গ্রন্থটি পাঠ করে সবাই উপকৃত হবেন, আলোকিত হবেন এবং অসীম পুণ্যের অধিকারী হবেন।

আমার এই গ্রন্থটি অন্যান্য সকল কিতাবের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। মুমিনগণের অন্তরে এই কিতাব দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টিতে সহায়ক হবে, ঈমান বৃদ্ধি করার মাধ্যমে প্রতিপন্ন হবে। কেননা, বিশেষ সতর্কতার সাথে অত্যন্ত পুণ্যবান বুযুর্গগণের বর্ণনা চয়ন করে এই কিতাবে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।"

জালালুদ্দীন সিয়ুতীর (রাহঃ) জন্ম ৮৪৯ হিজরীর ১লা রজব মোতাবেক ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর তারিখে মিসরের রাজধানী কায়রোতে। তাঁর পিতা শায়খ কামালুদ্দীন (মৃ-৮৫৫ হিঃ) ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলেম ও কাযী। কায়রোতে খলীফার প্রাসাদে ইমামের দায়িত্ব পালনকালে সিয়ুতীর (রাহঃ) জন্ম হয়। সে যুগের দুইজন সেরা আলেম তাঁর মহিমময় জীবন গঠনের মূল স্থপতি ছিলেন। শিশুকালে পবিত্র কোরআন হেফয করার পর পরই পিতা শায়খ কামাল উদ্দীনের ইন্তেকাল হয়ে যাওয়ার পরও তাঁর উচ্চশিক্ষা গ্রহণে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি। তিনি হাদীস শাস্ত্রে ইবনে হাজার আস্‌কালানীর (রাহঃ) নিকট থেকে সনদপ্রাপ্ত ছিলেন। হাদীস, তাফসীর, উলুমুল-কোরআন, ফেকাহ, ইতিহাস,

দর্শনসহ দ্বীনী এলেমের সবক'টি শাখাতেই সিয়ুতীর (রাহঃ) অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিলএবং সব ক'টি বিষয়েই তিনি অত্যন্ত মূল্যবান রচনা রেখে গেছেন। বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর জালালাইন শরীফের প্রথম অর্ধাংশ জালালুদ্দীন সিয়ুতীর (রাহঃ) রচনা। কথিত আছে যে, মাত্র চল্লিশ দিনের মধ্যে তিনি এই কিতাবটির রচনা সমাপ্ত করেন। এ ছাড়াও হাদীস, তাফসীর, ফেকাহ, কোরআনের তত্ত্বজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি দ্বীনী এলেমের গুরুত্বপূর্ণ সবক'টি বিষয়েই তাঁর রচিত মূল্যবান গ্রন্থ সারা দুনিয়াতেই অত্যন্ত যত্নের সাথে পঠিত হয়ে থাকে। সিয়ুতীর (রাহঃ) রচিত পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যা ছিল সহস্রাধিক। তন্মধ্যে নানা বিতর্কিত বিষয়ে রচিত কিছু পুস্তিকা তিনি নিজ হাতে বিনষ্ট করে দিয়েছেন। তারপরও এখনও পর্যন্ত যেসব গ্রন্থ সমগ্র বিশ্বময় প্রচলিত আছে, সেগুলোর সংখ্যা বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ ব্রুকল্‌ম্যানের মতে চারশো পনেরোটি।

আল্লামা সিয়ুতী (রাহঃ) জীবনীকার শামসুদ্দীন দাউদী (মৃ. ৯৪৫ হিঃ) লিখেছেন যে, হাদীস, তাফসীর, ইতিহাস এবং দ্বীনী এলেমের অন্যান্য শাখায় সিয়ুতী (রাহঃ) ছিলেন তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। তাঁর তুল্য আর কেউ ছিলেন না।

সিয়ুতীর (রাহঃ)-এর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন ইরানের অধিবাসী। 'আস্‌য়ুত' নামক জনপদে তাঁরা বসতি স্থাপন করেছিলেন বলেই তিনি নামের সাথে সিয়ুতী লিখতেন।

সিয়ুতী (রাহঃ) কর্মজীবনের সূচনা করেছিলেন তখনকার মিসরের সর্বোচ্চ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার মাধ্যমে। কিন্তু ৯০৬ হিজরীতে অধ্যাপনা ত্যাগ করে আররোখা নামক একটি দ্বীপে বসবাস করে অবশিষ্ট জীবন গ্রন্থ রচনায় নিমগ্ন থাকেন। এখানেই ৯১১ হিজরীতে ১৯ শে জুমাদাল-উলা (খৃ১৫০৫) ইন্তেকাল করেন।

'খাসায়েসুল-কুবরা' আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় গ্রন্থগুলোর একটি। বাংলা ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকাগণের খেদমতে এই মহৎ গ্রন্থটি পেশ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। এবার এর দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশ করা হল। সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

বিনয়াবনত
মুহিউদ্দীন খান
রবিউল আওয়াল, ১৪২০ হিঃ

মদীনা ভবন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Contents

সূচীপত্র

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাজন্যবর্গের নিকট পত্র প্রেরণ

বুখারী ও মুসলিম হযরত হাসান (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কেস্‌রা (পারস্য সম্রাট), কায়সর (রোম সম্রাট), নাজ্জাশী প্রমুখ বড় বড় রাজন্যবর্গের কাছে পত্র লিখেন, যাতে তাঁদেরকে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেওয়া হয়। (বলা বাহুল্য, এই নাজ্জাশী সেই নাজ্জাশী নয়, যার জানাযার নামায রসূলুল্লাহ (সাঃ) পাঠ করেছিলেন।)

ইবনে আবী শায়বা মুসান্নাফ গ্রন্থে বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) চারজন বড় বাদশাহের কাছে চারজন দূত প্রেরণ করেন। কেস্‌রা, কায়সর এবং মুকাউকিস। আর নাজ্জাশীর কাছে প্রেরণ করেন আমর ইবনে উমাইয়াকে। দূতগণ যেখানে যেখানে প্রেরিত হন, তাঁরা সেই জন গোষ্ঠীর ভাষায় কথা বলতেন।

ইবনে সা'দ বুরায়দা যুহরী ও ইয়াযীদ ইবনে রুমান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদল লোককে অন্য এক দল লোকের কাছে প্রেরণ করলেন, যাতে তাঁরা তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন। এই দল যে জনগোষ্ঠীর কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন, তাঁরা সেই জনগোষ্ঠীর ভাষায় কথা বলতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যখন তাদের এই অভূতপূর্ব কৃতিত্বের কথা জানানো হল, তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহর বান্দাদের হেদায়াতের খাতিরে আল্লাহর যে হক তাদের উপর অর্পিত ছিল, এটা তার চেয়েও মহান।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আবূ সুফিয়ানের এই ভাষ্য রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ সুফিয়ান যখন একদল কুরায়শের সাথে শামদেশে ছিলেন, তখন ইলিয়ায় অবস্থানরত রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকে ডেকে পাঠান। আবূ সুফিয়ান সঙ্গীয় কুরায়শগণ সহ সেখানে গেলে সম্রাট তাদেরকে দরবারে তলব করলেন। তখন সম্রাটের চারপাশে রোমের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপবিষ্ট ছিলেন। সম্রাট দো'ভাষীর মাধ্যমে কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কথিত নবীর সাথে বংশের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কার সম্পর্ক অধিক নিকটবর্তী? আবূ সুফিয়ান জওয়াব দিলেন, বংশের দিক দিয়ে আমার সম্পর্ক অধিক নিকটবর্তী। অতঃপর হিরাক্লিয়াস তাকে কাছে ডেকে নিলেন এবং অন্য কুরায়শ নেতৃবৃন্দকেও আবূ সুফিয়ানের পিছনে বসতে বললেন। অতঃপর সম্রাট তাদেরকে বললেন ঃ আমি আবূ সুফিয়ানকে কিছু প্রশ্ন করব। যদি সে কোথাও মিথ্যা জওয়াব দেয়, তবে

তোমরা তা ধরে ফেলবে। পরবর্তীতে আবূ সুফিয়ান বলেছিলেন ঃ আল্লাহর কসম, ভবিষ্যতে কুরায়শরা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে এই আশংকা না থাকলে আমি নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে প্রত্যেকটি কথা মিথ্যা বলতাম।

হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে এই নবীর বংশ-গরিমা কেমন?

আবূ সুফিয়ান ঃ তিনি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত বংশীয়।

হিরাক্লিয়াস ঃ তাঁর আগেও কি এ বংশের কেউ নবুওয়ত দাবী করেছিল?

আবূ সুফিয়ান ঃ না।

হিরাক্লিয়াস ঃ এই নবীর পিতৃপুরুষদের মধ্যে কেউ কি বাদশাহ ছিল?

আবূ সুফিয়ান ঃ না।

হিরাক্লিয়াস ঃ জাতির প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর অনুসরণ করে, না দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা?

আবূ সুফিয়ান ঃ দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা অনুসরণ করছে।

হিরাক্লিয়াস ঃ অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, না হ্রাস পাচ্ছে?

আবূ সুফিয়ান ঃ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

হিরাক্লিয়াস ঃ একবার তাঁর দীন কবুল করার পর কেউ তা বর্জন করে কি?

আবূ সুফিয়ান ঃ না।

হিরাক্লিয়াস ঃ নবুওয়ত দাবী করার আগে তোমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে করতে কি?

আবূ সুফিয়ান ঃ না।

হিরাক্লিয়াস ঃ তিনি বিশ্বাস ভঙ্গ করেন কি?

আবূ সুফিয়ান ঃ না। তবে বেশ কিছুদিন যাবত তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে আমরা বেখবর। আবূ সুফিয়ান পরে বলেন ঃ এই কথাবার্তার মধ্যে এই একটি বাক্যই আমি বাড়াতে পেরেছিলাম।

হিরাক্লিয়াস ঃ তোমরা কি তাঁর সাথে কখনও যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছ?

আবূ সুফিয়ান ঃ হ্যাঁ।

হিরাক্লিয়াস ঃ যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছে?

আবূ সুফিয়ান ঃ সমান সমান। কখনও আমরা জয়ী হয়েছি এবং কখনও তিনি জয়লাভ করেছেন।

হিরাক্লিয়াস ঃ এই নবীর দাওয়াত কি?

আবূ সুফিয়ান ঃ তাঁর দাওয়াত হচ্ছে এক আল্লাহর এবাদত কর। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। তোমাদের বাপ-দাদাদের পথ বর্জন কর। এ ছাড়া

তিনি আমাদেরকে নামায, যাকাত, দান-খয়রাত, পবিত্রতা এবং আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার শিক্ষা দেন।

এসব কথা শুনে হিরাক্লিয়াস বললেন ঃ আমি তোমাকে এই নবীর বংশগৌরব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। জওয়াবে তুমি তাঁকে সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলেছ। আসলেও রসূল তাঁর সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত বংশে প্রেরিত হন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর পূর্বে কেউ নবুওয়ত দাবী করেছে কিনা? তুমি জওয়াবে "না" বলেছ। পূর্বে কেউ নবুওয়ত দাবী করে থাকলে আমি বলতাম যে, এটাও তাঁরই অনুকরণ। আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে, তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ বাদশাহ ছিল কিনা? তুমি বলেছ "না"। এরূপ হলে আমি বুঝতাম যে, সে পূর্বপুরুষের রাজত্ব পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে এরূপ করছে। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, নবুওয়ত দাবী করার আগে সে মিথ্যা বলত কিনা? তুমি বলেছ "না"। এরূপ হলে আমি মনে করতাম যে, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলতে পারে, সে উপাস্যের ব্যাপারেও মিথ্যা বলতে পারবে। আমার প্রশ্ন ছিল প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর অনুসরণ করে, না দুর্বল লোকেরা? তুমি বলেছ দুর্বল লোকেরা। আসলেও রসূলগণের অনুসরণ শুরুতে দুর্বল লোকেরাই করে থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম অনুসারীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, না কমছে? তুমি বলেছ "বাড়ছে"। ঈমানের ব্যাপারটি তদ্রূপই। পূর্ণাঙ্গ হওয়া পর্যন্ত তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমি প্রশ্ন করেছিলাম যারা এই দীন কবুল করে, তাঁরা পরবর্তীতে তা ত্যাগ করে কিনা? তুমি বলেছ "না"। আসলেও ঈমান অন্তরে প্রবেশ করার পর কখনও বের হয়ে যায় না। আমার প্রশ্ন ছিল তিনি বিশ্বাসভঙ্গ করেন কি না? তুমি জওয়াব দিয়েছ "না"। আসলেও সত্যিকার রসূল কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করেন না। আমি তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তুমি বললে, তিনি আল্লাহর এবাদত করা, তাঁর সাথে শরীক না করা, প্রতিমা পূজা না করার এবং নামায, যাকাত ও পবিত্রতা অবলম্বন করার শিক্ষা দেন। তোমার এসকল কথা সত্য হলে তিনি এই ভূভাগ পর্যন্ত দখল করে নিবেন, যেখানে এখন আমার পা রয়েছে। আমি জানতাম যে, শীঘ্রই একজন নবীর আগমন ঘটবে। তবে এটা জানা ছিল না যে, এই নবী তোমাদের মধ্য থেকে হবেন। অতঃপর হিরাক্লিয়াস সেই পত্র তলব করলেন, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) দেহইয়া কলবীর হাতে বুসরার গভর্নরের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। হিরাক্লিয়াস পত্রটি পাঠ করলেন। তাতে লিখা ছিল ঃ

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম–আল্লাহর বান্দা ও রসূল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে রোম সম্রাটের প্রতি — যে হেদায়াতের অনুসরণ করে, তাকে সালাম –আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। মুসলমান হয়ে যান। নিরাপত্তা

পাবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ ছওয়াব দিবেন। আর আপনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে প্রজাকুলের পাপের শাস্তিও আপনাকে ভোগ করতে হবে।

হে গ্রন্থধারিগণ! আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন এক কলেমার দিকে এস। তা এই যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও এবাদত করব না। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না। আল্লাহকে ছেড়ে আমাদের কেউ কাউকে প্রভু বানাবে না। যদি তোমরা এই আহ্বানে সাড়া দিতে ব্যর্থ হও, তবে সাক্ষী থাক আমরা মুসলমান।"

আবূ সুফিয়ান বর্ণনা করেন ঃ হিরাক্লিয়াসের কথাবার্তা শুনে এবং রসূলুল্লাহর (সাঃ) পত্রের বিষয়বস্তু শুনে দরবারে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। আমাদেরকে দরবার থেকে বের করে দেওয়া হল। আমি আমার সঙ্গীদেরকে বললাম ঃ ইবনে আবী কাবশার ব্যাপারটি তো বিরাট রূপ পরিগ্রহ করেছে। শ্বেতাঙ্গদের সম্রাটও তাকে ভয় করে। এসব বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমার সর্বদাই বিশ্বাস ছিল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) অবশ্যই বিজয়ী হবেন। অবশেষে আল্লাহ আমাকে ইসলামের তওফীক দান করলেন।

ইলিয়ার গভর্নর ইবনে নাতূর এবং হিরাক্লিয়াস সিরিয়ার খৃস্টানদের ধর্মীয় নেতা এবং বাদশাহ ছিলেন। ইবনে নাতূর বলেন–হিরাক্লিয়াস ইলিয়ায় এসে পৈশাচিক আচরণ করতে লাগলেন। জনৈক ধর্মযাজক তাঁকে বলল ঃ আপনার মুখাবয়ব বিকৃত কেন? হিরাক্লিয়াস জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি বললেন ঃ মাঝরাতে আমি নক্ষত্রের মধ্যে দৃষ্টিপাত করে দেখলাম যে, খতনাকারীদের বাদশাহ্ আত্মপ্রকাশ করেছে। বল, এই উম্মতের মধ্যে কারা খতনা করে? ধর্মযাজক বলল ঃ ইহুদী সম্প্রদায় ছাড়া কেউ খতনা করে না। তাদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। শহরে শহরে যত ইহুদী আছে, তাদেরকে হত্যা করার আদেশ জারি করা হোক। এই আলোচনা চলছিল, এমন সময় গাসসান-অধিপতি কর্তৃক প্রেরিত এক ব্যক্তিকে হিরাক্লিয়াসের কাছে আনা হল। সে সম্রাটকে নবী করীম (সাঃ)-এর সংবাদ দিল। হিরাক্লিয়াস বললেন ঃ লোকটিকে নিয়ে যাও এবং পরীক্ষা করে দেখ সে খতনা করা কি না? অতঃপর তাকে বলা হল যে, লোকটির খতনা করা। সম্রাট তাকে আরবদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলে সে বলল ঃ আরবরা খতনা করে। সম্রাট বললেন ঃ যে লোকটি আত্মপ্রকাশ করেছে, সে এই উম্মতেরই বাদশাহ। অতঃপর সম্রাট জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর সমকক্ষ এক উযীরকে রোমে পত্র লিখলেন এবং নিজে হেম্‌স রওয়ানা হয়ে গেলেন। উযীর রসূলুল্লাহর (সাঃ) আবির্ভাব সম্পর্কে সম্রাটের সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করে জওয়াব প্রেরণ করলেন। অতঃপর হিরাক্লিয়াস হেম্‌সের রাজপ্রাসাদে

রোমের সকল নেতৃবর্গকে আমন্ত্রিত করলেন। যখন সকলেই প্রাসাদের অভ্যন্তরে সমবেত হল, তখন সম্রাট প্রাসাদের ফটক বন্ধ করিয়ে দিলেন এবং উচ্চাসনে আরোহণ করে সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ রোমের প্রধান ব্যক্তিবর্গ! নিজেদের দেশকে অটুট রাখার খাতিরে আপনারা এই নবীর দাওয়াত কবুল করে নিতে রাযী আছেন কি? একথা শুনে রোমের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ হৈহুল্লোড় করতে করতে বের হওয়ার জন্য গাধার ন্যায় উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল। কিন্তু তাঁরা ফটক বন্ধ পেয়ে আরও বেশী চীৎকার করতে লাগল। হিরাক্লিয়াস তাদের ঘৃণা লক্ষ্য করে তাদেরকে পুনরায় ডাকলেন এবং বললেন ঃ আপনারা খৃষ্টধর্মে কতটুকু পাকাপোক্ত, তা পরীক্ষা করার জন্যেই আমি কথাটি বলেছিলাম। ধর্মের প্রতি আপনাদের অটল বিশ্বাস দেখে আমি আশ্বস্ত হয়েছি। একথা শুনে সকলেই সম্রাটকে ভক্তিভরে সেজদা করল এবং আনন্দিত হল। এটা হিরাক্লিয়াসের সর্বশেষ সংবাদ।

বায়হাকী মূসা ইবনে ওকবা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ সুফিয়ান বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে শামদেশে গেলেন। রোম সম্রাট আবূ সুফিয়ানকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে লোকটি আবির্ভূত হয়েছেন, তিনি প্রত্যেক যুদ্ধে তোমাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন কি? আবূ সুফিয়ান বললেন ঃ প্রত্যেকবার জয়লাভ করেন না। তবে আমি যখন অনুপস্থিত থাকি, তখন জয়লাভ করেন। সম্রাট প্রশ্ন করলেন ঃ তোমার ধারণায় তিনি সত্যবাদী, না মিথ্যাবাদী? আবূ সুফিয়ান বললেন ঃ মিথ্যাবাদী। সম্রাট বললেন ঃ এরূপ বলো না। মিথ্যার মাধ্যমে কেউ জয়লাভ করতে পারে না। তোমরা এই নবীকে হত্যা করো না নবীগণকে হত্যা করা ইহুদীদের কাজ।

আবূ নঈম আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ সুফিয়ান বলেন ঃ আমি সর্বপ্রথম যেদিন থেকে মোহাম্মদ (সাঃ)-কে ভয় করতে শুরু করি, সেটা ছিল সেই দিন, যখন রোম সম্রাট স্বীয় দরবারে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করেন। আমি যখন তাঁর কাছে পৌছলাম, তখন তাঁর কপাল ছিল ঘর্মাক্ত। মোহাম্মদ (সাঃ)-এর চিঠির কারণেই তাঁর এই অবস্থা হয়েছিল। সম্রাটের এই অবস্থা দেখে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ভয় করতে লাগলাম এবং অবশেষে মুসলমান হয়ে গেলাম।

বায়হাকী যুহরীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, যখন দেহইয়া কলবী (রাঃ) রসূলুল্লাহর (সাঃ) পত্র নিয়ে হিরাক্লিয়াসের কাছে যান, তখন দরবারে উপস্থিত ছিল এমন একজন ধর্মীয় নেতার ভাষ্য অনুযায়ী পত্রের বিষয়বস্তু এরূপ ছিল ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম–আল্লাহর রসূল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে

রোম-প্রধান হিরাক্লিয়াসের প্রতি– তাকে সালাম, যে হেদায়াত অনুসরণ করে। ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপত্তা পাবেন। আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন। যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে দ্বীন অস্বীকার করার গোনাহ্ আপনার উপর বর্তাবে।

হিরাক্লিয়াস পত্র পাঠ করে সেটি স্বীয় উরু ও কোমরের মাঝখানে রেখে দিলেন। অতঃপর জনৈক ব্যক্তিকে এই পত্র ও দূতের বিবরণ লিখে পাঠালেন। লোকটি কেবল হিব্রু ভাষা পড়তে পারত। লোকটি জওয়াবে লিখল ঃ ইনিই প্রতীক্ষিত নবী। তাঁর অনুসরণ করা উচিত। হিরাক্লিয়াস রোমের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গকে রাজপ্রাসাদে সমবেত করলেন এবং প্রাসাদের দরজা বন্ধ করে দিলেন। তিনি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে প্রাসাদের উপরতলায় আরোহণ করে সকলকে সম্বোধন করে বললেন ঃ রোমের প্রধান ব্যক্তিবর্গ! আমার কাছে উম্মী নবীর পত্র এসেছে। আমার ধারণায় তিনিই সেই প্রতীক্ষিত নবী, যাঁর অপেক্ষায় আমরা ছিলাম, যাঁর উল্লেখ আমাদের কিতাবসমূহে আছে। তাঁর আবির্ভাব-মুহূর্তের নিদর্শনাবলী আমাদের সামনে এসে গেছে। অতএব, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর অনুসরণ কর, যাতে তোমরা দুনিয়া ও আখেরাতে নিরাপত্তা পাও। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ একথা শুনে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল। তাঁরা হৈচৈ করতে করতে দরজার দিকে ধাবিত হল। কিন্তু দরজা বন্ধ পেয়ে থমকে দাঁড়াল। হিরাক্লিয়াস ভীত অবস্থায় তাদেরকে ডেকে এনে বললেন ঃ তোমরা তোমাদের ধর্মের প্রতি কতটুকু নিষ্ঠাবান, তা পরীক্ষা করার জন্যেই আমি কথাগুলো বলেছিলাম। এখন তোমাদের দৃঢ়তা দেখে আমি সত্যিই আনন্দিত। একথা শুনে সকলেই তাকে সেজদা করল। অতঃপর প্রসাদের দরজা খুলে দেওয়া হল এবং সকলেই প্রস্থান করল।

বায়হাকী ও আবূ নঈমের রেওয়ায়েতে হেশাম ইবনে আস বলেন ঃ খলীফা হযরত আবূ বকর (রাঃ) আমাকে ও জনৈক কোরায়শীকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে ইসলামের দাওয়াতের জন্যে প্রেরণ করেন। আমরা দামেশকে জাবালা ইবনে আবহাম গাসসানীকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখলাম। সে কথা বলার জন্য জনৈক দূতকে প্রেরণ করলে আমরা বললাম ঃ আমরা দূতের সঙ্গে কথা বলব না। কেননা, আমাদেরকে বাদশাহের কাছেই প্রেরণ করা হয়েছে। অতঃপর তিনি আমাদেরকে ডেকে নিলেন। আমি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলাম। তাঁর পরনে কাল বস্ত্র দেখে আমি তার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ আমি প্রতিজ্ঞা করেছি। যতদিন তোমাদেরকে মুলকে শাম থেকে বের করে না দিব, এই কাল পোশাক খুলব না। আমরা বললাম ঃ আল্লাহ্র কসম, আমরা তোমার এই বসার জায়গাটুকুও দখল করব এবং ইনশাআল্লাহ্ এ দেশ

জয় করে নিব। জাবালা বলল ঃ তোমরা এদেশ জয় করবে না। যারা এদেশ জয় করবে, তাঁরা দিনের বেলায় রোযাদার হবে এবং রাতে ইফতার করবেন। এখন বল, তোমাদের রোযা কিরূপ? আমরা তাঁকে বললাম। শুনে তাঁর মুখমণ্ডল কাল হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ তোমরা প্রস্থান কর। তিনি আমাদের সঙ্গে একজন দূত সম্রাটের কাছে প্রেরণ করলেন। আমরা রোম সম্রাটের কাছে পৌঁছে গেলাম। আমরা সওয়ার হয়ে ঘাড়ে তরবারি ঝুলিয়ে রোম সম্রাটের কক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। অতঃপর কক্ষের পাদদেশে উট বসিয়ে দিলাম। সম্রাট আমাদের দিকে দেখছিলেন। আমরা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিলাম। এ শব্দে কক্ষ কম্পিত হয়ে গেল এবং আঙ্গুর অথবা খেজুর শাখার মত শূন্যে দুলতে লাগল। সম্রাটের নিকটে গেলে তিনি বললেন ঃ তোমরা পরস্পরে যেভাবে সালাম কর, আমাকেও সেই ভাবে সালাম করলে দোষ হবে না। সেমতে আমরা তাঁকে সালাম করলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তোমরা তোমাদের বাদশাহকে কিভাবে সালাম কর? আমরা বললাম ঃ তোমাকে যেভাবে সালাম দিলাম সেই একই পদ্ধতিতে সালাম করি।

প্রশ্ন ঃ বাদশাহ কিভাবে জওয়াব দেয়?

উত্তর ঃ এই কালেমার মাধ্যমেই জওয়াব দেয়।

প্রশ্ন ঃ তোমাদের ধর্মের মূল বাণী কি?

উত্তর ঃ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। একথা বলতেই কক্ষ প্রকম্পিত হয়ে গেল। সম্রাট কক্ষের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাদের এই কালেমা দ্বারা আমার এই কক্ষে কম্পন ধরে গেছে। তোমরা যখন আপন গৃহে থাক, তখন তোমাদের গৃহ ধসে পড়ে কি?

উত্তর ঃ এরূপ হয় না। আমরা এই কালেমার কারণে কোন কিছুকে বিদীর্ণ হতে দেখিনি। সম্রাট বললেন ঃ আমার বাসনা এই যে, তোমরা যখন এই কালেমা বল, তখন প্রত্যেক বস্তু বিদীর্ণ হয়ে তোমাদের উপর পতিত হোক এবং আমি আমার অর্ধেক রাজত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নিই। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এরূপ বাসনার কারণ কি? সম্রাট বললেন ঃ যদি এই কালেমা মানবীয় কৌশল হয়, তবে অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া আমার পক্ষে সহজ। আর যদি এটা নবুওয়তের ব্যাপার হয়, তবে আমার করার কিছুই নেই। এরপর সম্রাট আরও কিছু প্রশ্ন করলেন এবং আমরা জওয়াব দিলাম। তিনি নামায ও রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। আমরা তা-ও বললাম। এরপর বৈঠক সমাপ্ত হয়ে গেল এবং আমরা প্রস্থান করলাম। সম্রাট আমাদের পানাহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করলেন। আমরা তিন দিন অবস্থান করলাম। রাতে তিনি লোক পাঠিয়ে

আমাদেরকে ডাকলেন। আমরা পূর্বে যা বলেছিলাম, তিনি আবার শুনতে চাইলেন। আমরা আগেকার কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলাম। অতঃপর সম্রাট একটি স্বর্ণখচিত সিন্দুক আনালেন। তাতে কয়েকটি ছক ছিল এবং প্রত্যেক ছকের পৃথক দ্বার ছিল। তিনি একটি ছক খুলে তা থেকে কাল রেশমী বস্ত্র বের করে ছড়িয়ে দিলেন। তাতে একটি হস্তাঙ্কিত চিত্র ছিল। চিত্রের নেত্রদ্বয় ও কর্ণদ্বয় বড় বড় ছিল। গ্রীবা দীর্ঘ ছিল। মুখে দাড়ি ছিল না। মস্তকে প্রচুর কেশ ছিল। সব মিলে সেটি ছিল এক সুশ্রী পুরুষের চিত্র। সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন ঃ চিন, ইনি কে? আমরা বললাম ঃ না। তিনি বললেন ঃ ইনি হলেন আদম (আঃ)। অতঃপর সম্রাট দ্বিতীয় ছক খুললেন। তা থেকেও একটি কাল রেশমী বস্ত্র বের করলেন। এতে একটি শুভ্র চিত্র ছিল। যার কেশ কোঁকড়ানো, নেত্রদ্বয় লোহিত বর্ণ, মস্তক বৃহৎ এবং দাড়ি সুশ্রী ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এঁকে চিন? আমরা অজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি বললেন ঃ ইনি হচ্ছেন হযরত নূহ (আঃ)। অতঃপর সম্রাট আরও একটি দ্বার খুলে তা থেকে কাল রেশমী বস্ত্র বের করলেন। হঠাৎ আমরা অত্যন্ত শুভ্র এক পুরুষের চিত্র দেখলাম। তাঁর নেত্রদ্বয় সুন্দর, প্রশস্ত ললাট, উন্নত গন্ড ও সাদা দাড়ি ছিল। চিত্রটি হাস্যরত মনে হচ্ছিল। সম্রাট বললেন ঃ ইনি হযরত ইবরাহীম (আঃ)। অতঃপর তিনি আরও একটি ছক খুলে তা থেকেও একটি চিত্র বের করলেন, যা শুভ্র ও সুন্দর ছিল। সেটা ছিল রসূলুল্লাহর (সাঃ) চিত্র। সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইনি কে? আমরা বললাম ঃ ইনিই মোহাম্মদ (সাঃ)। একথা শুনে সম্রাট অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন, অতঃপর বসে পড়লেন। তিনি বললেন ঃ নিশ্চিতই তিনি? আমরা বললাম ঃ নিঃসন্দেহে তিনিই। সম্রাট বললেন ঃ এটা ছিল শেষ ছক। কিন্তু আমি এটি খুলতে তাড়াহুড়া করেছি, যাতে জানা যায় যে, এটি তোমাদের নবীরই চিত্র।

এরপর সম্রাট আরও একটি ছক খুলে তা থেকে কাল রেশম বের করলেন। এতে এমন একটি চিত্র ছিল, যার রঙ গোধূম, কোকড়ানো ক্ষুদ্র কেশ এবং চক্ষু কোটরাগত ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ছিল। মুখাকৃতি বিকৃত, দাঁত ক্রুদ্ধ অবস্থায় উপরে নীচে আগত ছিল এবং ক্রুদ্ধ অবস্থা বিরাজমান ছিল। সম্রাট বললেন ঃ ইনি হযরত মুসা (আঃ)। এ চিত্রের পার্শ্বে তারই অনুরূপ আরও একটি চিত্র ছিল। তাঁর মাথায় তৈলাক্ততা ছিল। কপাল প্রশস্ত এবং চোখের কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি নাকের দিকে প্রসারিত ছিল। সম্রাট বললেন ঃ ইনি হযরত হারুন (আঃ)। এরপর তিনি আরও একটি ছক খুলে তা থেকে শুভ্র রেশম বের করলেন। অতে একজন গোধূম বর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তির চিত্র ছিল। তাঁর মাথার কেশ ঝুলন্ত ছিল এবং মাঝারি গড়ন ছিল। সম্রাট বললেন ঃ ইনি হযরত লূত (আঃ)। এরপর সম্রাট পরপর

আরও কয়েকটি ছক খুলে সেগুলো থেকে হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকূব, হযরত ইসমাঈল, হযরত ইউসুফ, হযরত দাউদ, হযরত সোলায়মান এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর চিত্র প্রদর্শন করলেন।

আমরা বললাম ঃ এসব চিত্র আপনার কাছে কোথা থেকে এল? আল্লাহ তা'আলা এই পয়গাম্বরগণকে যেভাবে সৃষ্টি করেছিলেন, এসব চিত্র ছিল হুবহু তদ্রূপ। কেননা, আমাদের নবীর চিত্র ঠিক তেমনি, যেমন তিনি আছেন। সম্রাট বললেন ঃ আদম (আঃ) তাঁর রবের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তাঁর সন্তানদের মধ্যে যে সকল পয়গাম্বর আগমন করবেন, তাদের সকলের চিত্র তাঁকে দেখানো হোক। সেমতে আল্লাহ তা'আলা এসব চিত্র নাযিল করেন। এগুলো আদম (আঃ)-এর ভাণ্ডারে সূর্যের অস্তাচলে রক্ষিত ছিল। সেখান থেকে যুলকারনাইন এগুলো বের করে দানিয়াল (আঃ)-এর কাছে সমর্পণ করেন।

সম্রাট বললেন ঃ আমার বাসনা এই যে, আমি এদেশ থেকে বের হয়ে যাই, অতঃপর তোমাদের কোন শক্তিশালী ব্যক্তির আমৃত্যু গোলাম হয়ে থাকি।

অতঃপর সম্রাট আমাদেরকে কিছু মূল্যবান উপহার দিয়ে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। আমরা ফিরে এসে হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে অবগত করলাম। তিনি অশ্রুসিক্ত হয়ে বললেন ঃ আল্লাহ এই হতভাগার মঙ্গল করতে চাইলে সে যা কিছু বলেছে, তা কাজেও পরিণত করত। খলীফা আরও বললেন ঃ খৃস্টান ও ইহুদীদের কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গুণাবলী বিদ্যমান আছে।

পারস্য-রাজের নামে পত্র

বুখারী ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) পারস্য-রাজের কাছে পত্র প্রেরণ করেন। পত্র পাঠ করে সে সেটি ছিঁড়ে ফেলে দেয়। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বদদোয়া করলেন, হে আল্লাহ, অগ্নি উপাসকদেরকে এমনিভাবে খণ্ড-বিখণ্ড করে দাও।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) পারস্য-রাজের কাছে পত্র প্রেরণ করেন। সে পত্রটি ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আসলে পারস্যরাজ তাঁর রাজত্বকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। বাযযার, আবূ নঈম ও বায়হাকী দেহইয়া কলবী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) যখন পারস্য-রাজকে পত্র লিখলেন, তখন পারস্য-রাজ ইয়েমেনের সানআয় নিযুক্ত তাঁর প্রশাসককে এই বলে শাসাল যে, তুমি তোমার শাসনাধীন এলাকায় আত্মপ্রকাশকারী ব্যক্তিকে দমন করতে পার না? সে আমাকে তার ধর্মের দাওয়াত দিয়েছে। তাকে দমন করা তোমার কর্তব্য। অন্যথায় তুমি আমার পক্ষ থেকে

মন্দ আচরণের সম্মুখীন হবে। প্রশাসক জনৈক ব্যক্তির হাতে একটি পত্র রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে প্রেরণ করলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) পত্র পাঠ করলেন এবং পনের দিন পর্যন্ত প্রেরিত ব্যক্তিকে কিছু বললেন না। এরপর তাকে বললেন ঃ তুমি তোমার মালিকের কাছে চলে যাও। তাকে বল ঃ আমার রব তোমার প্রভু পারস্য-রাজকে আজ রাতে হত্যা করেছেন। দূত ফিরে গিয়ে সানআর প্রসাসককে একথা বলল। দেহইয়া বলেন ঃ এরপর খবর এল যে, পারস্য-রাজকে সে রাতেই হত্যা করা হয়েছে।

ইবনে ইসহাক, বায়হাকী, আবূ নঈম ও যারাবেতীর রেওয়ায়েতে আবূ সালামা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ বলেন ঃ আমি খবর পেয়েছি যে, পারস্য-রাজ তাঁর প্রাসাদে থাকাকালে দূত তাঁর কাছে পৌঁছে রসূলুল্লাহর (সাঃ) পত্র পেশ করেন। এক ব্যক্তি লাঠি হাতে সেখানে ঘুরাফেরা করছিল। সে পারস্য রাজকে জিজ্ঞাসা করল ঃ তুমি ইসলামকে পছন্দ করবে, না আমি এই লাঠি ভেঙ্গে ফেলব? পারস্য-রাজ বলল ঃ আমি ইসলামকে পছন্দ করি। তুমি লাঠি ভেঙ্গো না। এরপর লোকটি চলে গেল। তার যাওয়ার পর পারস্য-রাজ দ্বাররক্ষীদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল ঃ এই ব্যক্তিকে আমার কাছে আসার অনুমতি কে দিল? দ্বাররক্ষীরা বলল ঃ এখানে তো কেউ আসেনি। সম্রাট বলল ঃ তোমরা মিথ্যা বলছ। অতঃপর তাদেরকে ছেড়ে দিল। পরবর্তী বছরের শুরুতে পারস্য-রাজের কাছে সেই ব্যক্তি পুনরায় লাঠি হাতে আগমন করল এবং বলল ঃ হে পারস্য-রাজ! তুমি ইসলামকে পছন্দ করবে, না আমি এই লাঠি ভেঙ্গে ফেলব? সম্রাট বলল ঃ হাঁ, পছন্দ করব। তুমি লাঠি ভেঙ্গো না। লোকটি চলে গেল। পারস্য-রাজ আবার দ্বাররক্ষীদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল ঃ এখানে কেউ আসেনি। অতঃপর দ্বাররক্ষীদেরকে বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত করা হল। পরের বছর পারস্য-রাজের কাছে আবার সেই ব্যক্তি আগমন করে পূর্ববৎ কথা বলল। পারস্য-রাজ আবার লাঠি না ভাঙ্গার অনুরোধ করে ইসলামকে পছন্দ করার ওয়াদা করল। কিন্তু এবার লোকটি তাঁর ওয়াদায় আশ্বস্ত না হয়ে লাঠি ভেঙ্গে ফেলল। সাথে সাথে পারস্য রাজের প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেল।

আবূ নঈম ও ইবনে নাজ্জার হাসান বসরী (রহঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! পারস্য-রাজের উপর আপনার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জব্দকারী প্রমাণ কি? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা পারস্য-রাজের কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করেন। ফেরেশতা তাঁর হাত পারস্য-রাজের প্রাসাদের প্রাচীর থেকে বের করলে তাতে নূরের বিদ্যুৎ চমকে উঠে। পারস্য-রাজ সেটি দেখে ভীত হয়ে গেল। ফেরেশতা

বলল ঃ ভয় পাও কেন? আল্লাহ তা'আলা একজন রসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি গ্রন্থধারী। তুমি তাঁর অনুসরণ কর। এতে তুমি ইহকাল ও পরকালে নিরাপত্তা পাবে। পারস্যরাজ বলল ঃ আমি ভেবে দেখব।

বায়হাকী ওমায়র ইবনে ইসহাক থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) রোম সম্রাট ও পারস্য রাজের কাছে পত্র লিখলেন। রোম সম্রাট তাঁর পত্র গ্রহণ করে এবং পারস্য রাজ পত্রটি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই সংবাদ রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে পৌছলে তিনি এরশাদ করলেন ঃ অগ্নি-উপাসকরা স্বয়ং ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে আর রোমকরা বাকী থাকবে।

ইবনে সা'দ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, পারস্য-রাজের কাছে রসূলুল্লাহর (সাঃ) পত্র পৌছলে সে ইয়ামনের গভর্নর বাযানকে নির্দেশ প্রেরণ করল, দু'জন শক্তিশালী ব্যক্তিকে এই লোকের কাছে পাঠিয়ে তাকে গ্রেফতার করে আমার কাছে নিয়ে এস। সেমতে বাযান একটি পত্র সহ দু'ব্যক্তিকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে প্রেরণ করল। পত্র পেয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুচকি হাসলেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তাদের স্কন্ধদেশ কাঁপতে লাগল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আগামী কাল তোমরা উভয়েই আমার কাছে আসবে। আমি আমার সিদ্ধান্ত তোমাদেরকে জানিয়ে দিব। পরের দিন সকালে যখন তারা উপস্থিত হল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা তোমাদের প্রভুকে সংবাদ পৌছিয়ে দাও যে, আমার রব আল্লাহ বাযানের রব পারস্য-রাজকে আজ রাতের সপ্ত প্রহর অতিক্রান্ত হওয়ার পর হত্যা করেছেন এবং তার পুত্র শেরওয়াযকে তার উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। সে পিতাকে হত্যা করেছে। এরা উভয়েই বাযানের কাছে যেয়ে এই সংবাদ পৌছে দিল। এরপর বাযান ও ইয়ামনের লোকজনের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার এটাই ছিল বড় কারণ।

হারেছ গাসসানীর নামে পত্র প্রেরণ

ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) শুজা ইবনে ওয়াহাব আসাদীকে হারেছ গাসসানীর কাছে পত্রসহ প্রেরণ করেন। শুজা বলেন ঃ আমি হারেছকে দামেশকে পেয়ে তাঁর দেহরক্ষীর কাছে গেলাম এবং বললাম ঃ আমি আল্লাহর রসূলের দূত। সে বলল ঃ তুমি এখন আমার প্রভুর সাথে দেখা করতে পারবে না। অমুক দিন দেখা হতে পারে। দেহরক্ষী ছিল মরী নামক জনৈক রোমক। সে স্বয়ং আমার কাছ থেকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) বৃত্তান্ত জানতে শুরু করল। আমি তাঁর ও তাঁর দাওয়াত সম্বন্ধে তাকে বিস্তারিত বললাম। সে অশ্রুসজল হয়ে গেল এবং বলল ঃ ইনজীলে হুবহু এসব গুণের কথাই লিপিবদ্ধ আছে। আমি তাঁর প্রতি

ঈমান আনছি এবং তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করছি। কিন্তু আমার আশংকা এই যে, হারেছ আমাকে হত্যা করবে। এরপর হারেছ গৃহ থেকে বাইরে এল। মুকুট পরিধান করে সিংহাসনে বসলে আমি তার হাতে পত্রটি তুলে দিলাম। সে পত্র পাঠ করে ক্রুদ্ধ হয়ে গেল এবং পত্রটি দূরে নিক্ষেপ করে বলল ঃ আমার রাজত্ব আমার হাত থেকে কে ছিনিয়ে নিবে? আমি স্বয়ং তাঁর কাছে যাব। এবং এয়ামনে থাকলেও যেতাম। আমার লোকজনকে সমবেত কর। অতঃপর সে উঠে দাঁড়াল এবং অশ্বসজ্জিত করার আদেশ দিল। সে আমাকে বলল ঃ তুমি যা কিছু দেখলে, সে সম্পর্কে তোমার সঙ্গীকে বলবে। অতঃপর সে রোম সম্রাটকেও এ সম্পর্কে অবহিত করল। রোম সম্রাট লিখে পাঠাল ঃ এই লোকের কাছে যেয়ো না এবং এই ইচ্ছা পরিত্যাগ কর। রোম সম্রাটের এই চিঠি পেয়ে হারেছ আমাকে ডেকে পাঠাল এবং জিজ্ঞাসা করল ঃ কবে ফিরে যাবে? আমি বললাম ঃ আগামীকাল। সে আমাকে একশ মেসকাল স্বর্ণ দিল এবং বলল ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আমার সালাম বলবে। আমি ফিরে এসে হারেছ ও রোম সম্রাটের মধ্যকার পত্র বিনিময়ের কথা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললাম। তিনি শুনে বললেন ঃ তাঁর রাজত্ব খতম হয়ে গেছে। মক্কা বিজয়ের সালে হারেছও মৃত্যুমুখে পতিত হল।

মুকাউকিসের নামে পত্র প্রেরণ

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হাতেব ইবনে আবী বালতাআ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুকাউকিসের কাছে পত্রসহ প্রেরণ করলেন। আমি সেখানে পৌছলে সম্রাট আমাকে তাঁর প্রাসাদে স্থান দিলেন। আমি তাঁর কাছে অবস্থান করলাম। একদিন তিনি আমাকে ডাকলেন এবং পাদ্রীদেরকেও সমবেত করলেন। অতঃপর সম্রাট বললেন ঃ তুমি তোমার নবী সম্পর্কে বল। সত্যিই তিনি নবী নন? আমি বললাম ঃ নিঃসন্দেহে তিনি নবী। সম্রাট বললেন ঃ তা হলে তাঁর সম্প্রদায় যখন তাঁকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করল ঃ তখন তিনি বদদোয়া করলেন না কেন? আমি বললাম ঃ আপনারাও তো বলেন যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) আল্লাহর রসূল। তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলানোর জন্য আটক করলে তিনি বদদোয়া করলেন না কেন? তিনি বদদোয়া করেননি। আল্লাহ তাঁকে আকাশে তুলে নিয়েছেন। মুকাউকিস বললেন ঃ তুমি সমঝদার এবং সমঝদারের কাছে এসেছ।

ওয়াকেদী ও আবূ নঈম রেওয়ায়েত করেন যে, মুগীরা বনী মালেকের সঙ্গে মিলিত হয়ে মুকাউকিসের কাছে গেলে মুকাউকিস বললেন ঃ তোমরা আমার কাছে কিরূপে পৌছলে? তোমাদের মধ্যে ও আমার মধ্যে তো মোহাম্মদ (সাঃ) ও

তাঁর দলবল অন্তরায় ছিল। মুগীরা বলল ঃ আমরা সমুদ্রের কিনার ধরে ভয়ে ভয়ে এ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছি। মুকাউকিস বললেন ঃ মোহাম্মদ (সাঃ)-এর দাওয়াতের ব্যাপারে তোমরা কি করেছ? সে জওয়াব দিল ঃ আমাদের কেউ তাঁর অনুসরণ করেনি। মুকাউকিস কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল ঃ তিনি যে ধর্ম এনেছেন, আমাদের বাপ-দাদা কেউ এ ধর্ম পালন করেনি। আমাদের শাসনকর্তাও এ ধর্ম মানে না। আমরা আমাদের পৈতৃক ধর্মের উপরই আছি। মুকাউকিস প্রশ্ন করলেন ঃ তাঁর আপন গোত্র কি করেছে? মুগীরা বলল ঃ যুবক শ্রেণীই তাঁর অনুসরণ করেছে। এছাড়া তাঁর গোত্র এবং আরবের অধিবাসীরা তাঁর বিরোধিতা করেছে। তারা তাঁর সাথে যুদ্ধেও লিপ্ত হয়েছে। জয়-পরাজয় উভয় পক্ষেই হয়েছে। মুকাউকিস বললেন ঃ আমাকে তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে অবগত কর। তারা বলল ঃ তাঁর দাওয়াত হচ্ছে এক আল্লাহর এবাদত করবে, যাঁর কোন শরীক নেই। আমাদের বাপ-দাদারা যে সকল প্রতিমার পূজা করত, সেগুলো ছেড়ে দিতে হবে। নামায পড়তে হবে এবং যাকাত দিতে হবে। মুকাউকিস জিজ্ঞাসা করলেন ঃ নামায ও যাকাতের ওয়াক্ত ও পরিমাণ কি? তারা বলল ঃ মুসলমানরা দৈনিক পাঁচ বার নামায পড়ে। এগুলো নির্ধারিত ওয়াক্তে পড়া হয়। আর বিশ মেছকাল স্বর্ণের উপর যাকাত দিতে হয়। পাঁচটি উট থাকলে একটি ছাগল যাকাত দিতে হয়। মুকাউকিস প্রশ্ন করলেন ঃ মোহাম্মদ (সাঃ) যাকাত নিয়ে কোথায় ব্যয় করেন? তারা বলল ঃ তিনি এই যাকাত নিঃস্বদের মধ্যে বন্টন করে দেন। এছাড়া তিনি আত্মীয়তা বজায় রাখা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করার আদেশ দেন এবং ব্যভিচার, মদ্যপান এবং সুদ খেতে নিষেধ করেন। তাঁরা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা জন্তুর গোশ্‌ত খায় না। এসব কথা শুনে মুকাউকিস বললেন ঃ তিনি সমগ্র মানুষের জন্য প্রেরিত নবী। মিসরীয় কিবতী এবং রোমকরাও তাঁর অনুসরণ করবে। এসব বিধিবিধান নিয়েই হযরত ঈসা (আঃ) আগমন করেছিলেন এবং আল্লাহর প্রত্যেক নবী এসব বিধিবিধান নিয়ে আগমন করে থাকেন। এই নবীর পরিণাম শুভ হবে। কেউ যেন তাঁর সাথে কলহে লিপ্ত না হয়। এই দ্বীন সেই পর্যন্ত পৌঁছবে, যে পর্যন্ত উট ও ঘোড়া যেতে পারে। সমুদ্রের গভীরতা পর্যন্ত এই ধর্ম প্রবল হবে। কিন্তু মুগীরা ও তাঁর সঙ্গীরা বলল ঃ সমস্ত মানুষ এই দ্বীনকে কবুল করে নিলেও আমরা কখনও এই দ্বীন মেনে নিব না। একথা শুনে মুকাউকিস মাথা হেলালেন এবং বললেন ঃ তোমরা ক্রীড়া ও প্রতিযোগিতায় মেতে আছ। এরপর তাদের মধ্যে আরও প্রশ্নোত্তর হল ঃ

মুকাউকিস বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বংশপরিচয়

মুগীরা ঃ তাঁর বংশ মর্যাদা মাঝারি স্তরের।

মুকাউকিস ঃ পয়গাম্বরগণ এরূপই হয়ে থাকেন। তাঁর সত্যবাদিতা কেমন?

মুগীরা ঃ তিনি এমন সত্যবাদী যে, সকলের কাছে "আমীন" নামে পরিচিত।

মুকাউকিস ঃ তিনি যদি তোমাদের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী না হন, তবে সৃষ্টি-কর্তার ব্যাপারে কিরূপে মিথ্যাবাদী হবেন? আচ্ছা বলতো কোন শ্রেণীর মানুষ তাঁর অনুসরণ করছে?

মুগীরা ঃ প্রধানতঃ যুবক শ্রেণীই তাঁর অনুসারী হয়েছে।

মুকাউকিস ঃ এটাই হয়ে এসেছে। পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের অনুসরণও প্রথম প্রথম যুবকরাই করেছে। ইয়াসরিবের তাওরাত গ্রন্থধারী ইহুদীরা তাঁর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছে?

মুগীরা ঃ ইহুদীরা তাঁর বিরোধিতা এবং তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছে। এসব যুদ্ধে ওরা নিহত হয়েছে, বন্দী হয়েছে এবং দাসত্ব বরণ করেছে। এখন তারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

মুকাউকিস ঃ ইহুদীরা এই নবী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছে। কিন্তু হিংসার বশবর্তী হয়ে তারা এই আচরণ করেছে।

মুগীরা বলেন ঃ আমরা মুকাউকিসের কথাবার্তায় প্রভাবিত হয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলাম। বলতে গেলে আমরা তখন মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রায় অনুগতই হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা ভাবছিলাম, যে অনারব বাদশাহদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, তাঁরাও মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্যতায় বিশ্বাস করে এবং তাঁকে ভয় করে। আমরা তো তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী, আমরা তাঁর সঙ্গে নই। অথচ তিনি আমাদের ঘরে ঘরে এসে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। মুগীরা বলেন ঃ আমি আলেকজান্দ্রিয়াতেই রয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন গির্জায় যেতাম এবং গির্জার কিবতী ও রোমক পাদ্রীদের কাছ থকে তাঁর গুণাবলী জেনে নিতাম। জনৈক কিবতী পাদ্রী খুব গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন নবীর আগমন বাকী আছে কি? সে বলল ঃ হাঁ, একজন সর্বশেষ নবী আছেন, যাঁর মধ্যে ও ঈসা (আঃ)-এর মধ্যে কোন নবী নেই। হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর অনুসরণের আদেশ দিয়েছেন। তিনি হবেন উম্মী আরবী নবী। তাঁর নাম হবে আহমদ। তিনি না দীর্ঘদেহী, না অধিক বেঁটে। তাঁর চোখে লালিমা থাকবে। তিনি না অধিক শ্বেতকায়, না অধিক গোধূম রঙের। মাথার কেশ লম্বিত, পোশাক মোটা, যা সহজলভ্য হবে, তাই আহার করবেন। তাঁর স্কন্ধে তরবারি ঝুলবে। তিনি যুদ্ধবাজদের পরওয়া করবেন না। তাঁর সঙ্গে থাকবে প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবীগণ। তাঁরা তাঁকে আপন পিতামাতার চাইতেও অধিক ভালবাসবে। সেই নবী এক হেরেম থেকে অন্য হেরেম তথা লবণাক্ত

ভূমির দিকে হিজরত করবেন। সেই ভূমি হবে খেজুরবৃক্ষ শোভিত। ইবরাহিমী দ্বীনই হবে তাঁর দ্বীন।

মুগীরা বর্ণনা করেন ঃ আমি তাকে বললাম ঃ এই নবীর আরও কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। সে বলল ঃ তিনি দেহের অর্ধাংশে লুঙ্গি বাঁধবেন এবং হাত পা ধৌত করবেন। তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য এমন হবে, যা পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের ছিল না। তা এই যে, পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণ কেবল আপন আপন সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন; কিন্তু তিনি প্রেরিত হবেন সমগ্র মানবজাতির প্রতি। সমগ্র ভূপৃষ্ঠ হবে তাঁর সেজদার স্থল এবং পবিত্র। যেখানেই নামাযের সময় হবে, তাঁরা পানি না পাওয়া গেলে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিবে। পূর্ববর্তী ধর্মসমূহে নামায কেবল গির্জা ও উপাসনালয়সমূহেই পড়তে পারত। মুগীরা বলেন ঃ এই খৃষ্টান পাদ্রীদের কথা আমি মনে রাখলাম এবং দেশে ফিরে মুসলমান হয়ে গেলাম।

ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) কিবতী প্রধান মুকাউকিসকে পত্র প্রেরণ করলে তিনি জওয়াব দিলেন, আমার জানা ছিল একজন নবী আসবেন। কিন্তু আমার ধারণা ছিল তিনি শামদেশে আবির্ভূত হবেন। আমি তাঁর দূতের সম্মান করেছি এবং তাঁর কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করেছি।

হেমইয়ারী রাজন্য বর্গের কাছে পত্র প্রেরণ

ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হারেছ, মকরুহ, নাঈম ইবনে আবদে কেলাল প্রমুখ হেমইয়ারী রাজন্যবর্গের কাছে ইসলামের দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন। পত্রবাহক ছিলেন আইয়াশ ইবনে রবীআ মখযুমী। বাহককে এই মর্মে উপদেশ দেওয়া হলো যে, যখন তুমি হেমইয়ারের ভূমিতে পৌঁছবে, তখন রাতের বেলায় সেখানে প্রবেশ করবে না। ভোরে উযূ করে দু'রাকআত নামায পড়বে এবং আল্লাহর কাছে প্রয়োজন পূরণের দোয়া করে প্রবেশ করবে। আমার পত্র ডান হাতে রাখবে এবং তাদের ডান হাতে দিবে। যখন তারা পত্র গ্রহণ করবে তখন তুমি এই আয়াত পাঠ করবে لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ الخ এরপর اٰمَنْتُ بِمُحَمَّدٍ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ বলবে। তোমার সামনে পেশকৃত প্রমাণাদি বাতিল হয়ে যাবে। তারা যখন তোমার সামনে কোন অনারব ভাষার বাক্য পাঠ করবে, তখন তুমি বলবে–এর অনুবাদ কর। তারা যখন মুসলমান হয়ে যাবে, তখন তুমি তিনটি শাখা সম্বন্ধে জেনে নিবে, যেগুলো সেজদা অবস্থায় তাদের সম্মুখে আসে। তুমি

সেই শাখাগুলো বের করে প্রকাশ্য জায়গায় আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করে দিবে। আইয়াশ বলেন ঃ আমি হেমইয়ারে পৌছে আদেশ অনুযায়ী কাজ করলাম এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) যা বলেছিলেন, তাই হল।

জলবসীর নামে পত্র প্রেরণ

ইবনে ইসহাক রেওয়ায়েত করেন, রসূলে করীম (সাঃ) আমর ইবনুল আসকে পত্রসহ আম্মানের বাদশাহ্ জলবসীর কাছে প্রেরণ করেন। সে বলল ঃ আমি কয়েকটি কারনে এই নবীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। তিনি যে বিষয়ের আদেশ করেন, প্রথমে নিজে তা করেন এবং যে বিষয়ে নিষেধ করেন, প্রথমে নিজে তা ত্যাগ করেন। বিজয় লাভের কারণে গর্ব ও অহংকার করেন না। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ জয়ী হলে তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে পরিত্যাগ করে না। তিনি অঙ্গীকার পূর্ণ করেন। আমি সাক্ষ্য দেই যে, তিনি নবী।

বনী-হারেছার কাছে পত্র প্রেরণ

আবূ নঈম রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বনী-হারেছা ইবনে আমরকে পত্র লিখেন এবং ইসলামের দাওয়াত দেন। আমর তাঁর পত্র বালতির পানিতে ধৌত করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এদের জ্ঞানবুদ্ধি ছিনিয়ে নিয়েছেন। এরা ভীরু ও অসহিষ্ণু। তাদের কথাবার্তা মিশ্র। এরা সীমাহীন নির্বোধ। ওয়াকেদী বলেন ঃ আসলেও এই সম্প্রদায়ের কতক লোক স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতেও সক্ষম ছিল না।

বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন একজন সাহাবীকে জনৈক মুশরিক সরদারের কাছে প্রেরণ করেন এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। মুশরিক সরদার বলল ঃ যে আল্লাহর দিকে আপনি আমাকে দাওয়াত দেন, সে সোনার তৈরী, না রূপার তৈরী, না পিতলের তৈরী? একথা শুনে সাহাবী ফিরে এলেন। আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে বজ্রপাতের মাধ্যমে সেই মুশরিককে জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেন। দূত সাহাবী তখনও পথিমধ্যেই ছিলেন এবং তিনি এ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলে দিলেন সেই মুশরিক ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেমন বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ ও ব্যক্তিবর্গের কাছে ইসলামের দাওয়াতনামা প্রেরণ করেছিলেন, তেমনি আরবের বিভিন্ন গোত্রের পক্ষ থেকে অনেক দূত ও প্রতিনিধিদল তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়েছিল। এই দূতদের আগমনের সময় যে সকল মোজেযা প্রকাশ পেয়েছিল, নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হল ঃ

বনী-ছকীফের দূতের আগমন

বায়হাকী ও আবূ নঈম রেওয়ায়েত করেন যে, ওরওয়া ইবনে মসউদ ছাকাফী রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি সেখানে গেলে ওরা তোমাকে হত্যা করবে। অন্য এক হাদীসে আছে-ওরা তোমার সাথে যুদ্ধ করবে। ওরওয়া বললেন ঃ এরূপ আশংকা নেই। কারণ, তারা আমাকে অত্যন্ত সমীহ করে। তারা আমাকে নিদ্রিত পেলেও জাগ্রত করবে না। তারপর ওরওয়া আপন কওমের মধ্যে ফিরে গেলেন। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা মানল না। তিনি তাদেরকে শাস্তির কথা শুনালেন। এতেও কাজ হল না। একদিন তিনি শেষ রাত্রে গাত্রোত্থান করলেন। সোবহে-সাদেক উদিত হলে তিনি আপন কক্ষে দণ্ডায়মান হয়ে নামাযের জন্যে আযান দিলেন এবং কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করলেন। জনৈক ছাকাফী ব্যক্তি তাঁকে লক্ষ্য করে তীর মারল এবং তাঁকে হত্যা করল। ওরওয়ার শাহাদতের খবর রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে পৌছলে তিনি বললেন ঃ ওরওয়ার দৃষ্টান্ত ইয়াসীন (আঃ)-এর সঙ্গীর অনুরূপ। সে-ও তার কওমকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার ফল স্বরূপ নিহত হয়েছিল। ওরওয়ার শাহাদতের পর বনী-ছাকীফের উনিশ ব্যক্তির একটি প্রতিনিধি দল আগমন করল। তাদের মধ্যে কেনানা ইবনে আবদে ইয়ালীল ও ওছমান ইবনে আসও ছিলেন। তাঁরা উভয়েই মুসলমান হয়ে গেলেন। এক রেওয়ায়েতে আছে-তীর লাগার পর ওরওয়া বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, মোহাম্মদ আল্লাহর রসূল। তিনি আমাকে পূর্বেই বলেছিলেন যে, তোমরা আমাকে হত্যা করবে।

আবূ নঈম রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে ওরওয়া ইবনে মাসউদ গায়লান সালামাহ্কে বললেন ঃ তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ যে, আল্লাহ এই নবীর ব্যাপারটিকে কেমন সাফল্যের দ্বার-প্রান্তে পৌছিয়ে দিচ্ছেন। এখন সকলেই ক্রমে ক্রমে তাঁর অনুসরণ করতে শুরু করেছে। দেশের মানুষ এখন দু'ভাগে বিভক্ত-কতক তাঁর দিকে আকৃষ্ট এবং কতক ভীত। আমরা শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান। তিনি আমাদেরকে যেদিকে আহ্বান করেন, আমরা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু তিনি নবী-একথা সত্য। আমি তোমাকে একটি কথা বলছি, যা এপর্যন্ত কাউকে বলিনি। এই নবীর আবির্ভাবের পূর্বে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নাজরান গিয়েছিলাম। সেখানকার পাদ্রী ছিল আমার বন্ধু। সে আমাকে বলেছিল ঃ হে আবূ ইয়াকূব! তোমাদের মধ্যে একজন নবীর আগমনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তিনি তোমাদের হেরেমে আত্মপ্রকাশ করবেন।

তিনিই শেষ নবী। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আদ সম্প্রদায়ের মত কাবু করবেন। তিনি যখন জাহির হবেন এবং আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিবেন তখন অবশ্যই তাঁর অনুসরণ করবে। আমি এসব কথা কখনও কারও কাছে বলিনি। কিন্তু এখন আমি তাঁর অনুসরণ করতে যাচ্ছি। অতঃপর ওরওয়া মদীনায় উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়ে গেলেন।

বায়হাকীর রেওয়াতে ওয়াহাব বলেন ঃ আমি জাবেরকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ছাকীফ গোত্র যখন ইসলামের বায়আত করে, তখন তাদের অবস্থা কি ছিল? জাবের বললেন ঃ ছাকীফ গোত্র এই শর্ত যোগ করে যে, তারা যাকাত দিবে না এবং জেহাদ করবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তখন যাকাতও দিবে, জেহাদও করবে।

মুসলিমের রেওয়ায়েতে ওছমান ইবনে আবুল আস ছাকাফী বলেন ঃ আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! শয়তান আমার এবং আমার নামায ও কেরাআতের মাঝখানে অন্তরায় হয়ে গেছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ হ্যাঁ, এই শয়তানের নাম খাতরাব। তুমি যখন এই শয়তানকে অনুভব কর, তখন আউযুবিল্লাহ পাঠ করবে এবং বামদিকে তিনবার থুথু ফেলবে। ওছমান বলেন ঃ আমি তাই করলাম। ফলে আল্লাহ শয়তানকে আমা থেকে বিতাড়িত করলেন।

বায়হাকী ও আবূ নঈমের রেওয়ায়েতে ওছমান ইবনে আবুল আস ছাকাফী বর্ণনা করেন ঃ আমার শরীরে এত ব্যথা ছিল যে, মৃত্যুর আশংকা দেখা দিল। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এলে তিনি বললেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّمَا اَجِدُ

(আল্লাহর নাম সহকারে-আমি আল্লাহর ইযযত ও কুদরতের আশ্রয় চাই, যা অনুভব করি, তার অনিষ্ট থেকে)। তুমি এই দোয়া সাতবার পাঠ কর এবং ডান হাতকে ব্যথার স্থানে বুলাও। আমি সর্বদা আমার পরিবারবর্গ ও অন্যদেরকে এই দোয়া পাঠ করার উপদেশ দেই।

বনী-হানীফার দূতদের আগমন

বুখারী ও মুসলিম ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মুসায়লামা তুল্ কাযযাব তার গোত্রের অনেক লোকজনসহ মদীনায় এসে বলতে লাগল ঃ যদি এই নবী তাঁর পরে নবুওয়তের দায়িত্বভার আমার উপর সোপর্দ করেন, তবে আমি তাঁর অনুসরণ করব। নবী করীম (সাঃ) ছাবেত ইবনে কায়সকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে আগমন করলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি খেজুর-শাখা। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি আমার কাছে এই শাখাটিরও ভাগ চাও,

তবু আমি তা দিব না। আল্লাহর বিধান থেকে তুমি মুক্ত নও। যদি তুমি পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর, তবে আল্লাহ তোমাকে এর বদলা দিবেন। আমি যা দেখেছি এবং যা দেখানো হয়েছে, আমার মনে হয় সেই ব্যক্তি তুমিই। এই ছাবেত ইবনে কায়স আমার পক্ষ থেকে তোমাকে জওয়াব দিবে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফিরে গেলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, "আমি যা দেখেছি এবং যা দেখানো হয়েছে"–এই বাক্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) আমাকে বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, আমার হাতে দু'টি সোনার কংকণ। এগুলো দেখে আমি খুবই দুঃখিত হলাম। স্বপ্নের মধ্যেই আমার কাছে ওহী এল–কংকণদ্বয়ে ফুঁ মার। আমি ফুঁ মারলে উভয় কংকণ উড়ে গেল। আমি এ স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা করেছি যে, আমার পরে দু'জন নবুওয়তের মিথ্যা দাবীদার আত্মপ্রকাশ করবে। তাদের একজন হবে সানআর সরদার আনাসী এবং অপরজন ইয়ামামার সরদার মুসায়লামা।

মোহাম্মদ ইবনে জাফরের দাদা সিনান ইবনে আলাক ইয়ামানী রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে বনী হানীফার প্রথম দূত হয়ে আগমন করেন। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মাথা ধৌত করতে দেখলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ হে ইয়ামামার ভাই, বসে যাও এবং মাথা ধুয়ে নাও। অতঃপর আমি তাঁর মাথা ধোয়া থেকে বেঁচে যাওয়া পানি দিয়ে নিজের মাথা ধৌত করলাম। এরপর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। তিনি আমার জন্যে একটি পত্র লিখলেন। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে আপনার জামার একটি খণ্ড প্রদান করুন, যাতে আমি তদ্বারা বরকত লাভ করি। তিনি আমাকে তাঁর জামার একটি খন্ড দান করলেন। মোহাম্মদ ইবনে জাবের বর্ণনা করেন, আমার পিতা বলেছেন যে, সেই খণ্ডটি তাঁর কাছে থাকত। তিনি রোগীদেরকে জামার টুকরা ধোয়া পানি পান করাতেন এবং তারা আরোগ্য লাভ করত।

আবদুল কায়সের দূতের আগমন

আবূ ইয়ালা ও বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন যে, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের সাথে কথাবার্তার মধ্যে এরশাদ করলেন ঃ এই দিক থেকে একটি প্রতিনিধি দল আসবে, যারা পূর্বদিকের লোকজনদের মধ্যে সর্বোত্তম। হযরত ওমর (রাঃ) মজলিস থেকে উঠে সেই দিকে রওয়ানা হলেন। তিনি তেরজন উষ্ট্রারোহীর দেখা পেলেন। তিনি তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল ঃ আমরা বনী-আবদুল কায়সের লোক।

ইবনে সা'দ ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন সকালে দিগন্তের পানে দৃষ্টিপাত করে বললেন ঃ উষ্ট্রারোহীদের একটি দল পূর্ব দিক থেকে আগমন করছে। তারা ইসলামের প্রতি অনীহা প্রকাশ করবে না। এই দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করতে যেয়ে তারা তাদের উটগুলোকে শীর্ণ করে ফেলেছে। অনেকে পাথেয় নিঃশেষ করেছে। তাদের সরদারের একটি আলামত আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের জন্যে এই দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ! আবদুল কায়সকে ক্ষমা কর। তারা আমার কাছে দুনিয়া অন্বেষণ করতে আসেনি। তারা পূর্ব দিককার সর্বোত্তম মানুষ। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশ ব্যক্তি আগমন করলেন। তাদের সরদার ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আউফ আল আশাজ্জ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এসে তাঁকে সালাম করলে তিনি জওয়াব দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আউফ আল আশাজ্জ কে? তিনি আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি।

এই আবদুল্লাহ শারীরিক দিক দিয়ে দুর্বল ও দেখতে তেমন একটা আকর্ষণীয় ছিলেন না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করলে তিনি বললেন ঃ পুরুষদের চামড়া দিয়ে না মশক তৈরী হয়, না অন্য কোন কাজে আসে। তাদের কাছে রয়েছে দুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু–একটি জিহ্বা, অপরটি অন্তর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমার দু'টি স্বভাব আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। আবদুল্লাহ বললেন ঃ স্বভাব দু'টি কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ একটি সহনশীলতা, অপরটি গাম্ভীর্য। আবদুল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ স্বভাবগুলো পরে সৃষ্টি হয়েছে, না মজ্জাগত? উত্তর হল ঃ না এগুলো তোমার মজ্জাগত স্বভাব।

হাকেম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হিজরের অধিবাসী বনী আবদুল কায়েস রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আগমন করে। কথাবার্তার মধ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমাদের দেশে অমুক ধরনের খেজুর আছে, যার নাম তোমাদের কাছে এই। আর অমুক প্রকার খেজুর আছে, যার নাম এই। এভাবে তিনি হিজরের সকল প্রকার খেজুরের প্রচলিত নামসহ উল্লেখ করলেন। প্রতিনিধি দলের এক ব্যক্তি বলল ঃ আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ, যদি আপনি হিজরে জন্মগ্রহণ করতেন, তা হলেও সেখানকার খেজুর সম্পর্কে আপনার জ্ঞান তার চেয়ে বেশী হত না, যা এখন আছে। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এখানে তোমাদের উপস্থিতির সময় তোমাদের ভূখণ্ড আমাকে দেখানো হয়েছে এবং আমি সবকিছু দেখে নিয়েছি। তোমাদের এক প্রকার খেজুর আছে বরনী, যা অসুখ-বিসুখে ফলপ্রদ।

আহমদ ও তিবরানীর রেওয়ায়েতে ওয়াসে বর্ণনা করেন ঃ আমি এবং আশাজ্জ উষ্ট্রারোহীদের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে পৌঁছলাম। আমাদের সঙ্গে একজন জিনে ধরা ব্যক্তি ছিল। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার মামা জিনে ধরা। আপনি তাঁর জন্যে দোয়া করুন। তিনি বললেন, তাকে আমার কাছে আন। আমি নিয়ে গেলে তিনি রোগীর চাদরের একটি প্রান্ত ধরে উপরে তুললেন। এমনকি, আমি তার বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। অতঃপর তিনি রোগীর পিঠে মৃদু আঘাত করে বললেন ঃ আল্লাহর দুশমন, বের হয়ে যা। রোগী সম্মুখে এসে ঠিক ঠিক তাকাতে লাগল। সে আর পূর্বের মত ছিল না। এরপর হুযূর (সাঃ) তাকে নিজের কাছে বসালেন এবং তার জন্যে দোয়া করলেন। তার মুখমণ্ডলে হাত বুলালেন। এই দোয়ার পর আমার মামা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন। অতঃপর তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি কেউ ছিল না।

আহমদের রেওয়ায়েতে বনী আবদুল কায়সের জনৈক প্রতিনিধি বর্ণনা করেন–আশাজ্জ আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের ভূখণ্ড শীতপ্রধান এবং সেখানকার আবহাওয়া আমাদের অনুকূল নয়। যখন আমরা মদ্যপান ছেড়ে দেই, তখন আমাদের রঙ বদলে যায় এবং পেট বড় হয়ে যায়। আপনি আমাদেরকে এই পরিমাণ মদ্যপানের অনুমতি দিন (তিনি হাতের তালু খুলে এই পরিমাণ দেখালেন)। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ হে আশাজ্জ! যদি আমি এই পরিমাণ পান করার অনুমতি দেই, তবে তোমরা এই পরিমাণ পান করে ফেলবে। (তিনি দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করে এই পরিমাণ নির্দেশ করলেন।) আর এই পরিমাণ শরাব পান করে তোমরা মাতাল অবস্থায় আপন ভাইয়ের পায়ের গোছায় তরবারি মারবে এবং আহত করে দিবে। তখন প্রতিনিধি দলে হারেছ নামক এক ব্যক্তি ছিল, যার পায়ের গোছায় জখম ছিল। ঘটনা ছিল এই যে, হারেছ কোন এক মহিলা সম্পর্কে স্তুতিগাথা রচনা করেছিল, যাতে মহিলার আপাদমস্তক সৌন্দর্য বিবৃত হয়েছিল। মদ্যপানের মজলিসে সে এই স্তুতিগাথা পাঠ করলে এক ব্যক্তি তার পায়ের গোছায় তরবারি মারল। ফলে সে আহত হয়ে যায়। হারেছ বর্ণনা করে, আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) মুখে শরাবের নিন্দা শুনে কাপড় দিয়ে আমার গোছা আবৃত করতে লাগলাম। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে পূর্বেই সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করে দেন।

বনী-আমেরের প্রতিনিধি দলের আগমন

বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন যে, বনী আমেরের একটি প্রতিনিধিদল রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আগমন করে। তাদের মধ্যে ছিল আমের ইবনে

তোফায়ল, আরবাদ ইবনে কায়স ও খালেদ ইবনে জা'ফর। এরা কওমের সরদার ও শয়তান প্রকৃতির লোক ছিল। এরা রসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যা করার কুমতলব নিয়ে এসেছিল। সেমতে আমের আরবাদকে বলল ঃ আমরা যখন এই নবীর কাছে পৌঁছব, তখন আমি তাঁর মুখমণ্ডল তোমার দিকে করে দিব। সেই মুহূর্তেই তুমি তাঁকে তলোয়ার মেরে দিবে। অতঃপর রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে উপস্থিত হয়ে আমের বলল ঃ হে মোহাম্মদ! আমাকে বিদায় দিন। হুযুর (সাঃ) বললেন ঃ এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে ছাড়ব না। আমের বলল ঃ আল্লাহর কসম আমি এই শহরকে লাল রঙের ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারদের দ্বারা পূর্ণ করে দিব এবং আপনার স্থান সংকীর্ণ করে দিব। এরপর আমের পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ! আমাকে আমের ইবনে তোফায়ল থেকে হেফাযতে রাখ।

বাইরে আসার পর আমের আরবাদকে বলল ঃ তুমি আক্রমণ করলে না কেন? আরবাদ বলল ঃ আমি যতবারই আক্রমণের ইচ্ছা করেছি, ততবারই তুমি মাঝখানে এসে পড়েছ। আমি কি তোমাকে হত্যা করতে পারতাম? এরপর ওরা আপন আপন শহরের পানে রওয়ানা হয়ে গেল। পথিমধ্যে আমের প্লেগে আক্রান্ত হল এবং বনী-সলুলের এক নারীর গৃহে মারা গেল। অবশিষ্টরা দেশে ফিরলে কওমের লোকেরা জিজ্ঞাসা করল ঃ কি খবর আনলে? আরবাদ বলল ঃ না, সে আমাদেরকে এমন বস্তুর এবাদত করতে বলে, যাকে সম্মুখে পেলে আমি তরবারি মেরে খন্ড-বিখন্ড করে দিতাম। এই কথার দু'দিন পর আরবাদ উট বিক্রি করতে বের হলে আকাশ থেকে বজ্রপাত হল এবং উটসহ আরবাদ জাহান্নামে পৌঁছে গেল। বায়হাকীর রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ত্রিশ দিন পর্যন্ত আমের ইবনে তোফায়লের প্রতি বদদোয়া করতে থাকেন। তার বদদোয়া ছিল এরূপ ঃ

হে আল্লাহ! আমাকে আমের ইবনে তোফায়ল থেকে নিরাপদ কর এবং তার প্রতি বিনাশকারী ব্যাধি নাযিল কর। শেষপর্যন্ত আমের প্লেগ রোগে মারা যায়।

আমর ইবনুল আসের ইসলাম গ্রহণ

ইবনে সা'দ, বায়হাকী ও আবূ নঈমের রেওয়ায়েতে হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) এভাবে আত্মকাহিনী বর্ণনা করেন—আমি ছিলাম ইসলামের প্রথম সারির দুশমন। সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত আমি ইসলাম থেকে দূরে সরে রয়েছি। বদর, উহুদ, খন্দক ইত্যাদি যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছি এবং বেঁচে রয়েছি। আমি মনে মনে ভাবতাম, আমাকে অপমানের দুঃসহ বোঝা

বইতেই হবে। মোহাম্মদ (সাঃ) নিশ্চিতরূপেই কোরায়শদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবেন। হোদায়বিয়ার সন্ধির সময়ও আমি কোরায়শদের পক্ষে উপস্থিত ছিলাম। সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় চলে গেলেন এবং মক্কার কোরায়শরা ফিরে এল। আমি মনে মনে বললাম ঃ আগামী বছর মোহাম্মদ (সাঃ) সঙ্গীগণসহ মক্কায় প্রবেশ করবেন। এরপর না মক্কায় অবস্থান করার জায়গা থাকবে, না তায়েফে। আমি তো ইসলাম থেকে দূরেই থাকতে চাই। তাই দেশত্যাগ ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমি তো বলি যে, সকল কোরায়শ মুসলমান হয়ে গেলেও আমি হব না।

মোটকথা, আমি মক্কায় এসে আপন সম্প্রদায়ের লোকজনকে সমবেত করলাম। আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিত। তারা প্রত্যেক ব্যাপারে আমার সাথে সলাপরামর্শ করত। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তোমাদের দৃষ্টিতে আমার মর্যাদা কিরূপ? তারা বলল ঃ তুমি একজন বুদ্ধিদীপ্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি। আমি তাদেরকে বললাম ঃ তোমরা জান মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ব্যাপারটি এখন গুরুতর আকার ধারণ করেছে। তাঁর বিজয়ী হওয়া প্রায় নিশ্চিত। আমি মনে করি, আমাদের নাজ্জাশীর কাছে চলে যাওয়া উত্তম। মোহাম্মদ (সাঃ) প্রবল হয়ে গেলে নাজ্জাশীর শাসনাধীনে থাকা মোহাম্মদের শাসনাধীনে জীবন যাপন করা অপেক্ষা শ্রেয় হবে। আর যদি কোরায়শরা বিজয়ী হয়, তবে আমরাই হব খ্যাতনামা ও যশস্বী। সকলেই বলল ঃ চমৎকার অভিমত। আমি বললাম ঃ তা হলে নাজ্জাশীর জন্য উপঢৌকন সংগ্রহ কর। আমাদের দেশ থেকে নাজ্জাশীর কাছে চামড়া রফতানী করা হত। নাজ্জাশীর কাছে এটা খুব সমাদৃত ছিল। সেমতে আমরা বিপুল পরিমাণে চামড়া সংগ্রহ করে নাজ্জাশীর দেশে পৌঁছে গেলাম। সে সময় সেখানে রসূলুল্লাহর (সাঃ) দূত আমর ইবনে উমাইয়া খমরীও পৌঁছে গেল। সে একটি পত্র নিয়ে গিয়েছিল, যাতে উম্মে হাবীবা বিনতে আবূ সুফিয়ানের সাথে রসূলুল্লাহর (সাঃ) বিয়ের বিষয়বস্তু ছিল। আমর ইবনে উমাইয়া নাজ্জাশীর সাথে সাক্ষাতের পর চলে গেল। আমি আমার সঙ্গীগণকে বললাম ঃ আমি নাজ্জাশীর কাছে আমর ইবনে উমাইয়াকে দাবী করব, যাতে তাকে আমার হাতে তুলে দেয়। যদি তাকে পেয়ে যাই, তবে কোরায়শদের খুশী করার জন্যে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব। অতঃপর আমি নাজ্জাশীর সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সেজদা করলাম। নাজ্জাশী আমাকে মারহাবা বলে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি উপঢৌকন এনেছ? আমি বললাম ঃ জাঁহাপনা, আপনার জন্যে অনেক চামড়া উপঢৌকন স্বরূপ এনেছি। আমি চামড়াগুলো তাঁর সামনে পেশ করলাম। তিনি খুব পছন্দ করলেন। কিছু চামড়া পাদ্রীদের মধ্যে বন্টন

করলেন এবং অবশিষ্টগুলো এক জায়গায় রেখে দিলেন। নাজ্জাশীকে হাসিখুশি দেখে আমি বললাম ঃ জাঁহাপনা, এই মাত্র এক ব্যক্তি আপনার কাছ থেকে বিদায় হয়েছে। সে আমাদের শত্রুর দূত, এই শত্রু আমাদেরকে বিব্রতকর অবস্থায় রেখেছে এবং আমাদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করেছে। আপনি এই দূতকে আমাদের হাতে সমর্পণ করুন। আমরা তাকে হত্যা করব। একথা শুনে নাজ্জাশী হঠাৎ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন এবং আমার মুখে সজোরে এক চড় বসালেন। আমার মনে হল যেন আমার নাক ভেঙ্গে গেছে। নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল এবং আমার কাপড় রঞ্জিত করতে লাগল। এই পরিস্থিতিতে আমার লজ্জার সীমা রইল না। অপমানে ও ক্ষোভে আমার মনে হচ্ছিল যে, ধরণী দ্বিধা হলে আমি তাতে ঢুকে পড়তাম! রক্ত বন্ধ হলে আমি নাজ্জাশীকে বললাম ঃ জাহাঁপনা! আমার কথাটি আপনার কাছে এত অসহনীয় হবে জানতে পারলে আমি কখনও একথা বলতাম না। নাজ্জাশী বললেন ঃ তুমি সেই ব্যক্তির দূতকে হত্যা করার জন্য আমার কাছে চাইছ, যাঁর কাছে সেই জিবরাঈল আগমন করেন, যিনি হযরত মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর কাছে আগমন করতেন। এসব কথা শুনে আমার মনের অবস্থা বদলে গেল। আমি ভাবতে লাগলাম, যে সত্যকে আরব-অনারব নির্বিশেষে অনেকে উপলব্ধি করেছে, আমি তার বিরোধিতা করছি! আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ জাঁহাপনা, আপনি এই বিষয়ের সাক্ষ্য দেন কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি নিশ্চিতরূপে সাক্ষ্য দেই। তুমি আমার কথা মেনে এই নবীর আনুগত্য কর। আল্লাহর কসম, তিনি সত্য নবী। তিনি প্রতিপক্ষের উপর অবশ্যই বিজয়ী হবেন, যেমন মূসা (আঃ) ফেরাউন ও তার বাহিনীর উপর বিজয়ী হয়েছিলেন। আমি বললাম ঃ আপনি এই নবীর পক্ষে আমার কাছ থেকে বয়আত নিবেন? তিনি হ্যাঁ বলে আপন হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং আমার কাছ থেকে বয়আত নিলেন।

বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এসে আপন গৃহে নির্জনবাসী হয়ে গেলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল ঃ আপনি ঘরের বাইরে যান না কেন? আপনার কি হয়েছে? আমর বললেন ঃ আবিসিনিয়ার লোকেরা বলে যে, তোমরা যাকে নিয়ে এমন অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করেছ, তিনি একজন নবী।

ইবনে আসাকির রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন বললেন ঃ আজ রাতে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তোমাদের কাছে আসবে। পরে আমর ইবনুল আসকে আসতে দেখা গেল। তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন।

দওস গোত্রের দূতদের আগমন

ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন যে, দওস গোত্রের মহিলা উম্মে শুরায়কের স্বামী আবুল আকর মুসলমান হয়ে হযরত আবূ হুরায়রার (রাঃ) সঙ্গে হিজরত করেন। উম্মে শুরায়ক বলেন ঃ এরপর আবুল আকরের আত্মীয়রা আমার কাছে এসে বলল ঃ সম্ভবতঃ তুমি মুসলমান হয়ে গেছ। আমি বললাম ঃ হ্যা, আমি মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছি। তারা বলল ঃ আমরা তোমাকে কঠোর শাস্তি দিব। অতঃপর তারা আমাকে একটি ধীরগতি, কষ্টদায়ক ও দুষ্টমতি উটে সওয়ার করিয়ে দিল। তারা আমাকে মধু দিয়ে রুটি খাওয়াত এবং এক ফোঁটা পানিও দিত না। দ্বিপ্রহরে যখন উত্তাপ খুব বেড়ে গেল, তখন তারা উট থেকে নেমে গেল এবং কম্বল দিয়ে তাঁবু খাড়া করে নিল। কিন্তু আমাকে প্রখর রৌদ্রের মধ্যেই ছেড়ে দিল। রৌদ্রতাপে আমার বোধশক্তি, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি বিকল হয়ে গেল। তিন দিন পর্যন্ত তারা আমাকে এমনিভাবে রাখল। তৃতীয় দিন আমাকে বলল ঃ তুমি যে ধর্ম গ্রহণ করেছ, সেটি ছেড়ে দাও। আমি তাদের কথা কিছুই বুঝলাম না। কারণ আমার ইন্দ্রিয় বিকল হয়ে গিয়েছিল। আমি আকাশের দিকে অঙ্গুলি তুলে তাওহীদের ইশারা করতে লাগলাম। আমি যুগপৎ এই আযাব সয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ বুকের উপর বালতির শীতলতা অনুভব করলাম। আমি বালতি ধরলাম এবং তা থেকে এক শ্বাসে পানি পান করলাম। এরপর বালতিটি আমার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হল। আমি দেখলাম সেটি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে ঝুলন্ত রয়েছে এবং আমার নাগালের বাইরে রয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয়বার আমার কাছে বালতি আনা হল। আমি এক শ্বাসে পানি পান করতেই বালতি তুলে নেওয়া হল। আমি বালতির দিকে দেখছিলাম। বালতিটি আবার আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে ঝুলে রইল। অতঃপর তৃতীয়বার বালতিটি আমার দিকে আনা হল। এবার আমি বালতি থেকে মন ভরে পানি পান করলাম এবং মাথায়, মুখমণ্ডলে এবং কাপড়েও পানি ঢেলে নিলাম। লোকেরা যখন তাদের তাঁবু থেকে বাইরে এল, তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ তোমার কাছে পানি কোত্থেকে এল? আমি বললাম ঃ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে। এ অবস্থা দেখে তারা বলে উঠল ঃ আমরা সাক্ষ্য দেই যে, তোমার রবই আমাদের রব। এখানে তুমি যা কিছু পেয়েছ, তোমার রবের কাছ থেকেই পেয়েছ। এরপর তারা সকলেই মুসলমান হয়ে গেল এবং রসূলুল্লাহর (সাঃ) দিকে হিজরত করল। আমার শ্রেষ্ঠত্ব এবং আমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ তারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করত।

বনী-সুলায়মের প্রতিনিধি দলের আগমন

ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন যে, কদর ইবনে আম্মার মদীনায় এসে মুসলমান হয়ে যায়। সে রসূলুল্লাহকে (সাঃ) কথা দেয় যে, তার কওমের এক

হাজার অশ্বারোহী নিয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আসবে। এরপর গোত্রের নয়শ লোককে নিয়ে মদীনায় আসে। হুযূর (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এক হাজর পূর্ণ হল না কেন? তাঁরা আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের ও বনী-কেনানার মধ্যে বর্তমানে যুদ্ধ চলছে। তাই একশ ব্যক্তি গোত্রের মধ্যে রয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ কাউকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দাও, যাতে তারাও চলে আসে। এ বছর কোন অপ্রিয় ঘটনা ঘটবে না। অতঃপর লোক পাঠিয়ে অবশিষ্ট একশ ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হল। তাঁরা হাদাত নামক স্থানে রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে দেখা করলেন। একবার দূর থেকে ঘোড়ার পদধ্বনি শুনে তারা আতকে উঠল এবং বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের শত্রুপক্ষ এসে গেছে। তিনি বললেন ঃ ভয় নেই। যারা আসছে, তারা সুলায়েম ইবনে মনসূর–শত্রুপক্ষ নয়।

যিয়াদ হেলালীর আগমন

ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন ঃ যিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মালেক নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে দূতরূপে আগমন করে মুসলমান হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর জন্যে দোয়া করলেন এবং তাঁর মাথায় পবিত্র হাত রেখে নাক পর্যন্ত বুলিয়ে নেন। বনী হেলাল বর্ণনা করত, আমরা সর্বদা যিয়াদের মুখমণ্ডলে বরকতের চিহ্ন দেখতে পেতাম। জনৈক কবি যিয়াদের প্রশংসায় বলেছিল ঃ

ঃ হে সেই ব্যক্তি! যার মাথায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) পবিত্র হাত বুলিয়েছেন এবং মসজিদে দোয়া করেছেন। আমি কেবল যিয়াদকেই বুঝাতে চাচ্ছি।

যিয়াদের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর নাকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র হাতের নূর চমকিতে থাকে।

আবূ সুবরার ঘটনা

ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ সুবরা ইয়াযীদ ইবনে মালেক রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে দূতরূপে আগমন করেন। তাঁর দুই পুত্র সুবরা ও আযীযও তাঁর সাথে ছিল। আবূ সুবরা আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার হাতের পশ্চাৎভাগে একটি ফোঁড়া আছে, যে কারণে উটের লাগাম ধরে রাখতে কষ্ট হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি ফলকহীন তীর আনিয়ে তদ্বারা ফোঁড়ার উপর মারলেন এবং তার উপর নিজের হাত বুলালেন। এতেই ফোঁড়া অদৃশ্য হয়ে গেল।

জরীরের আগমন

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে জরীর বাজালী বর্ণনা করেন, আমি মূল্যবান পোশাক পরে মসজিদে প্রবেশ করলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) খোতবা দিচ্ছিলেন। মসজিদের

লোকেরা আমাকে দেখতে শুরু করল। আমি আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কি আমার কথা উল্লেখ করেছেন? সে বলল ঃ হ্যাঁ, তোমার প্রশংসা করেছেন। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি খোতবার মধ্যে সামনে এল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এই দরজা দিয়ে তোমাদের কাছে এয়ামনের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আগমন করবে। তাঁর মুখমণ্ডলে রাজকীয় আলামত রয়েছে।

আবূ নয়ীমের রেওয়াতে জরীর বলেন ঃ আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকতে পারতাম না—পড়ে যেতাম। একথা রসূলুল্লাহকে (সাঃ) জানালে তিনি আপন পবিত্র হাত আমার বুকে মারলেন এবং আমার জন্যে এই বলে দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَّهْدِيًّا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তাকে স্থির রাখ এবং তাকে পথপ্রদর্শক ও সুপথপ্রাপ্ত বানাও। তাঁর এই দোয়ার প্রভাবে এরপর আমি কখনও ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাইনি।

বনী তাঈ-এর দূতদের আগমন

বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন যে, বণী তাঈ-এর প্রতিনিধি দল আগমন করল। তাদের মধ্যে যায়দ আল-খায়লও ছিলেন। তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর নাম রাখলেন যায়দ আল-খায়র। তিনি যখন দেশে ফিরে গেলেন, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ সে মদীনার জ্বর থেকে বাঁচতে পারবে না। সে মতে প্রতিনিধি দল যখন নজদ ভূমিতে প্রবেশ করল তখন যায়দ আল খায়র জ্বরে আক্রান্ত হয়ে সেখানেই ইন্তেকাল করলেন।

বুখারীর রেওয়ায়েতে আদী ইবনে হাতেম তাঈ বলেন ঃ আমি রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে বসা ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে উপবাসের কথা বলল। অন্য একব্যক্তি এসে রাহাজানির অভিযোগ করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হে আদী! তুমি জীবিত থাকলে দেখবে একজন উষ্ট্রারোহিনী মহিলা হীরা থেকে একাকিনী রওয়ানা হবে এবং মক্কায় এসে কা'বা গৃহের তাওয়াফ করবে। আল্লাহ ছাড়া তাঁর মনে কোন ভয় থাকবে না। আমি মনে মনে ভাবলাম তা হলে বনী তাঈ-এর সেই সব ডাকাত কোথায় যাবে, যারা সমগ্র জনপদে অশান্তির দাবানল সৃষ্টি করে রেখেছে! রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বললেন ঃ তুমি বেঁচে থাকলে পারস্য-রাজের ধনভাণ্ডার করতলগত করবে। আমি ব্যাখ্যা চেয়ে বললাম, ঃ কেসরা ইবনে হরমুযের ধনভাণ্ডার? তিনি বললেন ঃ হাঁ, কেসরা ইবনে হরমুযের ধনভান্ডার। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তুমি বেঁচে থাকলে আরও দেখবে যে, একব্যক্তি তার উভয় হাতে সোনা-রূপা নিয়ে বের হবে এবং কোন প্রার্থী খুঁজে

ফিরবে। আদী বলেন ঃ আমি উষ্ট্রারোহিনী মহিলাদেরকে দেখেছি, যারা কূফা থেকে নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে এসে কা'বার তাওয়াফ করত। পারস্য রাজের ধনভাণ্ডার যারা জয় করেছিল, তাদের মধ্যে আমি নিজেও ছিলাম। এখন তোমরা বেঁচে থাকলে তৃতীয় বিষয়টি তোমরা দেখে নিয়ো যা এই যে, সোনারূপা গ্রহনকারী লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। বায়হাকী বর্ণনা করেন, এই তৃতীয় বিষয়টি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের খেলাফত কালে বাস্তবরূপ লাভ করেছে। তিনি আড়াই বছর খলিফা ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে বহু সংখ্যক লোক ধনসম্পদ নিয়ে তাঁর কাছে আসত এবং বলত, আপনি দরিদ্রদের মধ্যে এ গুলো বন্টন করে দিন। কিন্তু অনেক খোঁজাখুজির পরও যাকাত-সদকা গ্রহণ করার মত ফকীর পাওয়া যেত না। অবশেষে ধন-সম্পদ ফিরে আসত এবং মালিক এসে নিয়ে যেত। কেননা, তাঁর শাসনামলে কেউ নিঃস্ব ছিল না।

তারেক ইবনে আবদুল্লাহর আগমন

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে তারেক ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন ঃ আমরা মদীনায় এসে নগর-প্রাচীরের নিকটেই সওয়ারী থেকে নেমে গেলাম এবং পোশাক পরিধান করতে লাগলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি এল। তাঁর দেহে দু'টি চাদর ছিল। সে আসসালামু আলাইকুম বলে জিজ্ঞাসা করল ঃ কোথায় যাবেন? আমরা বললাম ঃ মদীনা। সে বলল ঃ কি প্রয়োজনে যাবেন? আমরা বললাম ঃ মদীনার খেজুর নিব। আমাদের সঙ্গে এক মহিলাও ছিল এবং লাগাম পরিহিত লাল উটও ছিল। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করল ঃ এই উট বিক্রয় করবেন? আমরা বললাম ঃ এত ছা' খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করব। লোকটি মূল্য হ্রাস করতে চাইল না এবং উটের লাগাম ধরে রওয়ানা হয়ে গেল। সে যখন দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল, তখন আমরা পরস্পরে বলতে লাগলাম ঃ একজন অচেনা লোককে মূল্য আদায় না করেই উট দিয়ে দিলাম। এটা কেমন হল? আমাদের সঙ্গিনী মহিলা বলে উঠল ঃ তোমরা ভেবো না। লোকটির মুখমণ্ডল দেখে আমি বুঝতে পেরেছি যে, সে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারবে না। তাঁর মুখ মণ্ডল পূর্নিমার চাঁদের মতই ভাস্বর ছিল। আমি তোমাদের উটের মূল্যের নিশ্চয়তা দিচ্ছি। এই কথাবার্তা চলছিল, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ আমাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) পাঠিয়েছেন। তোমাদের উটের মূল্য বাবদ খেজুর নিয়ে এসেছি। এগুলো মেপে নাও।

হাযরামাউতের দূতদের আগমন

বুখারী ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে ওয়ায়েল ইবনে হুজর বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) নবুওত প্রাপ্তির সংবাদ অবগত হই। অতঃপর আমি তাঁর

খেদমতে উপস্থিত হলে তাঁর সাহাবীগণ বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাদের আগমনের সংবাদ তিন দিন পূর্বেই আমাদেরকে দিয়েছেন।

ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন ঃ হাযরামাউতের দূতগণ এসে মুসলমান হয়ে গেল। মুখরিম ইবনে মাদীকারিব আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! দোয়া করুন, যাতে আমার মুখের পক্ষাঘাত রোগ দূর হয়ে যায়। হুযূর (সাঃ) তাঁর জন্যে দোয়া করলেন।

ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন ঃ মুখরিম ইবনে মাদীকারিব একটি প্রতিনিধি দলের সাথে শরীক হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আসেন। ফিরে যাওয়ার পর তিনি মুখের পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এরপর আরও একটি প্রতিনিধি দল আগমন করল। তাঁরা বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের সরদার মুখের পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর জন্যে ঔষধ বলে দিন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ একটি সূচ গরম করে চোখের পাতার উপর বুলিয়ে দেবে। এতেই আরোগ্য লাভ করবে। তোমরা এখান থেকে যেয়ে কি বলেছিলে, যে কারণে এই ঘটনা ঘটল? মোটকথা, মুখরিমের এ চিকিৎসাই করা হল এবং তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন।

ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন যে, হাযরামাউত থেকে কুলায়ব ইবনে আসাদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আসেন এবং এই কবিতা পাঠ করেন ঃ হে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আমরা হাযরা মাউতের বনভূমি থেকে উটে সওয়ার হয়ে আপনার কাছে এসেছি দু মাসের বিপদসংকুল সফরের পর। আমরা পুণ্য প্রার্থী।

নিঃসন্দেহে আপনি সেই প্রতিক্ষিত নবী, যাঁর আলোচনা আমরা করতাম এবং যাঁর আগমনের সংবাদ তওরাত ও ইনজীল দিয়েছে।

আশআরী গোত্রের আগমন

ইবনে সা'দ ও বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ তোমাদের কাছে একটি দল আগমন করবে, যারা নম্রপ্রাণ। এরপর আশআরী গোত্র আগমন করল। তাদের মধ্যে আবূ মূসা আশআরীও ছিলেন।

মুয়াম্মার রেওয়ায়েত করেন ঃ একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।তিনি দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ! নৌকারোহীদেরকে প্রাণে রক্ষা কর। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন ঃ নৌকা পার হয়ে গেছে। এরপর বললেন ঃ তারা আসছে। তাদেরকে একজন সাধু ব্যক্তি নিয়ে আসছে। এই নৌকারোহীরা ছিল আশআরী গোত্র এবং তাদেরকে যে নিয়ে আসছিলেন, তিনি ছিলেন আমর ইবনে হুমুক খোযায়ী। হুযূর (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কোত্থেকে

এলে? আমর বললেন ঃ আমরা যুবায়দ থেকে এসেছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের জন্যে বরকতের দোয়া করলেন।

আবদুর রহমান ইবনে আকীলের আগমন

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে আবদুর রহমান ইবনে আকীল বর্ণনা করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে আগত প্রতিনিধি দলের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা সকলেই তাঁর কাছে পৌঁছে মসজিদের দরজার সামনে উট বসিয়ে দিলাম। তখন আমাদের দৃষ্টিতে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক অপছন্দনীয় ব্যক্তি। কিন্তু কথাবার্তা বলার পর তাঁর কাছ থেকে যখন উঠলাম তখন তাঁর চেয়ে প্রিয় কোন মানুষ ছিল না। আমাদের একজন বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর মত রাজত্ব প্রার্থনা করেন না কেন? রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ কথা শুনে মুচকি হাসলেন এবং বললেন ঃ নিশ্চিতরূপেই তোমাদের নবী আল্লাহর কাছে হযরত সোলায়মান (আঃ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক নবীকে একটি দোয়া বা বর দেন। কোন কোন পয়গাম্বর সেই দোয়া দুনিয়ার ব্যাপারে করেছেন। আল্লাহ তা কবুল করেছেন। কেউ কেউ আপন সম্প্রদায়ের জন্য বদদোয়া করেছেন, যার ফলশ্রুতিতে তাদের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আমাকেও এই দোয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন। কিন্তু আমি সেটি আখেরাতের জন্যে সংরক্ষিত রেখেছি। আমি হাশরের দিন আমার উম্মতের জন্যে শাফায়াত করব।

মুযায়না গোত্রের দূতদের আগমন

আহমদ, তিবরানী ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে নো'মান ইবনে মুকরিন বর্ণনা করেন ঃ আমি মুযায়না ও জাহবান এবং গোত্রের চারশ' লোকের সঙ্গে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এলাম। তিনি সকলকে কিছু কিছু বিধান দিলেন, অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ)-কে বললেন ঃ তাদের সকলকে পাথেয় দিয়ে দাও। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ আমার কাছে (এই পরিমাণ) পাথেয় নেই। হুযূর (সাঃ) পুনরায় বললেন ওমর, তাদেরকে পাথেয় দিয়ে দাও। অগত্যা হযরত ওমর (রাঃ) সমজিদ সংলগ্ন একটি কক্ষ খুললেন, যেখানে সামান্য পরিমানে খেজুর ছিল। কাফেলার সকলেই সেখান থেকে খেজুর নিল। সকলের শেষে আমি আমার অংশ নিলাম। কিন্তু খেজুরের স্তুপ পূর্ববৎই ছিল। মনে হচ্ছিল যেন একটি খেজুরও কমেনি।

আহমদ, তিবরানী ও আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে রোকা ইবনে যায়ীদ বর্ণনা করেন ঃ আমরা চারশ' উষ্ট্রারোহী রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমরা আহারের আবেদন করলে তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-কে বললেন ঃ ওমর,

তাদেরকে আহার করাও। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ আমার কাছে এই পরিমাণ আহার্য নেই। কেবল কয়েক ছা'খেজুর শিশুদের খাওয়ার জন্যে রাখা আছে। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেন ঃ ওমর, তুমি কথা শুন এবং মেনে নাও। ওমর বললেন আমি শুনলাম এবং মেনেও নিব। অতঃপর তিনি গৃহে গেলেন এবং সকলকে একটি কক্ষে ডাকলেন। তিনি বললেন ঃ খাওয়া শুরু কর। প্রত্যেকেই স্ব স্ব ইচ্ছা অনুযায়ী খেজুর নিতে শুরু করল। সকলের শেষে আমি খেজুর নিলাম। কিন্তু আমি অনুভব করলাম, যেন খেজুরের স্তূপ থেকে একটি খেজুরও কমেনি।

বনী-সহীমের দূতদের আগমন

রিশাতী রেওয়ায়েত করেন যে, বণী সহীমের দূতদের মধ্য থেকে আকসাম ইবনে সালামা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে মুসলমান হয়ে গেল। হুযুর (সাঃ) তাদেরকে দেশে ফিরে গিয়ে আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতে বললেন। তিনি তাদেরকে পানির একটি সোরাহী দিলেন এবং এতে মুখের থুতু কিংবা কুলীর পানি ঢেলে দিলেন। তিনি বললেন ঃ বণী সহীমকে এই পয়গাম পৌঁছাও যে, তাঁরা যেন এই পানি মসজিদে ছিটিয়ে দেয় এবং সর্বদা মাথা উঁচু রাখে। আল্লাহ তায়ালা ইসলামের মাধ্যমে তাদের মাথা উঁচু করে দিয়েছেন। রাবী বলেন ঃ বণী-সহীমের কোন ব্যক্তি মুসায়লামা কাযযাবের অনুসরণ করেনি এবং কেউ খারেজীও হয়নি।

বনী-শায়বানের দূতদের আগমন

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে কায়লা বিনতে মাখরামা বর্ণনা করেন, বণী-শায়বানের দূতদের সঙ্গে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এলাম। তিনি তখন উভয় হাত পদদ্বয়ের মধ্যে বৃত্তের মত করে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁকে এই অবস্থায় দেখে আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। তাঁর সাথে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এই অবলা নারী কাঁপছে। আমি তাঁর পিঠের দিকে ছিলাম। তিনি আমাকে দেখেন নি। তবুও বললেন ঃ হে অবলা নারী, বিচলিত হয়ো না। শান্ত থাক। একথা শুনতেই আমার মনে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল, তা খতম হয়ে গেল।

বনী-আসরার দূতদের আগমন

বর্ণিত আছে বনী-আসরার এক প্রতিমার মধ্য থেকে লোকেরা কিছু অদ্ভুত কথাবার্তা সম্বলিত আওয়াজ শুনতে পায়। অতঃপর সমল ইবনে আমর আযরী গোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে মুসলমান

হয়ে যায়। প্রতিমার মুখে যা যা শুনেছিল, তা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ সেই প্রতিমায় একটি জিন এসে আস্তানা গেড়েছে। সে মুসলমান হয়ে গেছে।

বনী-নাজরানের প্রতিনিধি দলের আগমন

আবূ নঈম ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নাজরানের খৃস্টান প্রতিনিধি দল আগমন করলে "মোবাহালা" তথা পারস্পরিক অভিসম্পাতের আয়াত অবতীর্ণ হল। তারা বলল ঃ আমাদেরকে তিন দিনের সময় দিন। তারা বনূ কুরায়যা ও বণূ-নুযায়েরের কাছে যেয়ে পরামর্শ করল। তারা মোবাহালায় না যেয়ে সন্ধিস্থাপনের পরামর্শ দিল। বলল, তিনি সেই নবী, যার উল্লেখ আমরা তওরাত ও ইনজীলে পাই। সে মতে নাজরান বাসীরা এই শর্তে সন্ধি করল যে, রাজস্ব বাবদ প্রতি বছর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দু'হাজার মূল্যবান বস্ত্রজোড়া দেবে।

আবূ নঈমের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ নাজরানবাসীদের উপর আযাব অবধারিত ছিল। যদি তারা মুবাহালা করত তবে ভূপৃষ্ঠ থেকে তাদের মূল উৎপাটিত হয়ে যেত।

জারাশের প্রতিনিধি দলের আগমন

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম রেওয়ায়েত করেন যে, বনী-আসাদের প্রতিনিধি দলে ছরদ ইবনে আবদুল্লাহ ও আগমন করেন এবং মুসলমান হয়ে যান। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে তাঁর কওমের মুসলমানদের আমীর নিযুক্ত করলেন এবং নির্দেশ দিলেন ঃ তোমার সঙ্গে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে নিকটবর্তী মুশরিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর। ছরদ জেহাদের জন্যে বের হলেন। তিনি দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত জারাশ অবরোধ করে রইলেন। এরপর সেখান থেকে ফেরত রওয়ানা হলেন। তিনি যখন কশর নামক পাহাড় অতিক্রম করছিলেন, তখন জারাশ বাসীরা মনে করল যে, ছরদ পরাজয় স্বীকার করে ফিরে যাচ্ছেন। সে মতে তারা তাঁর খোঁজে বের হল। কিন্তু যখন ছরদের সম্মুখবর্তী হল, তখন ভীষণ মোকাবিলা হল। জারাশবাসীরা দু'ব্যক্তিকে মদীনায় প্রেরণ করল। তারা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ শকর কোথায়? তারা বলল ঃ শকর নয়, আমাদের এখানে কশর নামক পাহাড় আছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ কশর নয়, শকর। এই পাহাড়ের নিকটে কোরবানীর উট যবেহ করা হয়। অতঃপর তারা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আপন কওমের নিরাপত্তার দোয়া চাইল তিনি দোয়া করলেন। তারা কওমের মধ্যে ফিরে গেল

এবং জানতে পারল যে, হুরদের আক্রমনে কওমের বহুলোক নিহত হয়েছে। অতঃপর জারাশের অবশিষ্ট লোকেরা মদীনায় উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়ে গেল।

ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন ঃ ফরওয়া ইবনে আমর জুযামী রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে আম্মানের গভর্ণর ছিলেন। তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন। এ খবর পেয়ে রোমসম্রাট তাঁকে দরবারে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন ঃ তুমি এই ধর্ম ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে কোন এলাকার বাদশাহ করে দেব। ফরওয়া বললেন ঃ মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ধর্ম ছাড়ব না। আপনি জানেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর আগমনের সংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু আপনি রাজত্বের মোহে পড়ে এটা প্রকাশ করেন না। অতঃপর রোম সম্রাট ফরওয়াকে বন্দী করলেন এবং কিছুদিন পর ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিলেন।

ফেযারার প্রতিনিধি দলের আগমন

ইবনে সা'দ ও রায়হাকী রেওয়ায়েত করেন ঃ নবম হিজরীতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর কাছে বণী-ফেযারার প্রতিনিধি দল আগমন করল। তারা ছিল উনিশ জন। তাদের একজন আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের জনবসতিগুলোতে অনাবৃষ্টির কারণে দারুণ দুর্ভিক্ষ চলছে। গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে গেছে। বাগানসমূহ শুকিয়ে গেছে। জনসাধারণ বুভুক্ষু হয়ে গেছে। আপনি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্যে দোয়া করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলেন। ফলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হল। ছয় দিন পর্যন্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে রইল এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার অভিযোগ করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মিম্বরে আরোহণ করে দোয়া করলেন। এ দোয়ার পর আকাশ সম্পূর্ণরূপে মেঘমুক্ত হয়ে গেল।

বনী-মুররার প্রতিনিধি দলের আগমন

ইবনে সা'দ ও আবূ নঈম রেওয়ায়েত করেন যে, তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নবম হিজরীতে বণী-মুররার প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আগমন করল। তিনি তাদেরকে ক্ষেতখামারের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল ঃ সর্বত্র দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়েছে। ফল-ফসল এবং গবাদি পশু নেই বললেই চলে।

হুযূর (সাঃ) দোয়া করলেন। তারা দেশে ফিরে দেখল যে, প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে। এরপর বিদায় হজ্বের সময় তাদের একব্যক্তি এসে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা দেশে ফিরে জানলাম যে, যেদিন আপনি দোয়া করেছিলেন, সেদিনই বৃষ্টি হয়েছিল। এরপর প্রতি পনের দিন অন্তর বৃষ্টি হচ্ছে। ক্ষেতখামারে

প্রচুর পানি। ঘাস এত বেড়ে গেছে যে, উট বসে বসেই খায় ছাগলরা গৃহের আশে পাশেই ঘাস খেয়ে পেটভরে এবং ধারে কাছেই থাকে। একথা শুনে নবী করীম (সাঃ) আল্লাহ্ তা'আলার হামদ ও শোকর করলেন।

দারীদের প্রতিনিধি দলের আগমন

ইবনে সাআদ রেওয়ায়েত করেন ঃ তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দারী গোত্রের দশ ব্যক্তির একটি প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আগমন করল। তাদের মধ্যে তামীম দারীও ছিলেন। তাদের সকলেই মুসলমান হয়ে গেল। তামীম আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রতিবেশী রোমকদের দু'টি গ্রাম আছে–একটি জরী ও অপরটি বায়াতে আইনূন। যদি আল্লাহ তা'আলা আপনাকে শামে বিজয় দান করেন, তবে এ দু'টি গ্রাম আমাকে প্রদান করবেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এ দু'টি গ্রামই তোমার। অতঃপর তিনি তামীমের নামে গ্রাম দু'টি লিখে দিলেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে শাম বিজীত হলে তিনি গ্রাম দু'টো তামীমকে (রাঃ) দিয়ে দেন।

ইমাম মুসলিম ফাতেমা বিনতে কায়স থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ তামীম দারী রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে আগমন করে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার নৌকায় সমুদ্র ভ্রমন করেন। পথ ভুলে যাওয়ার কারণে তিনি এক অচেনা দ্বীপে অবতরণ করেন, সেখানে তিনি এক দীর্ঘকেশী রমনীকে দেখলেন। সে আপন কেশ টেনে টেনে পথ চলছিল। তিনি রমনীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কে? সে বলল ঃ আমার নাম জাসসামা। তামীম বললেন ঃ এখানকার অবস্থা বর্ণনা কর। রমণী বলল ঃ আমি তোমাকে কোন খবর বলব না। তুমি দ্বীপে যেয়ে ঘুরাফেরা কর। নিজেই সবকিছু জানতে পারবে। সেমতে তামীম দ্বীপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি এক বন্দীকে দেখতে পেলেন। বন্দী তাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ তুমি কে? তামীম বললেন ঃ আমরা আরবের লোক। সে বলল ঃ তোমাদের মধ্যে একজন নবী আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর অবস্থা কি? তামীম বললেন ঃ আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি, তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি এবং তাঁর অনুসরণ করেছি। সে বলল ঃ তিনি ভালই করেছেন। আচ্ছা, আইনে যর সম্পর্কে বল। আমরা বললে সে শুনামাত্রই সজোরে লম্ফ দিল এবং প্রাচীরের উপরে চড়ে যাওয়ার উপক্রম করল। এরপর সে জিজ্ঞাসা করল ঃ বিসিয়ান খেজুর বাগানের কি হল? আমরা বললাম ঃ তার ফল পেকে গেছে। এটা শুনে সে পূর্বের ন্যায় সজোরে লম্ফ দিল, অতঃপর বলল ঃ আমাকে অনুমতি দিলে আমি তাইয়েবা ছাড়া সকল শহরে ঘুরাফেরা করব। ফাতেমা বলেন ঃ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ তুমি এসব ঘটনা মানুষের কাছে বর্ণনা করবে। এই মদীনা হচ্ছে তাইয়েবা আর সেই বন্দী হচ্ছে দাজ্জাল।

হারেছ ইবনে আবদে কেলালের আগমন

হারেছ ইবনে আবদে কেলাল হেমইয়ারী এয়ামনের একজন বাদশাহ ছিলেন। সে ব্যক্তি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আসার পূর্বে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছাহাবায়ে-কেরামকে বললেন ঃ তোমাদের কাছে একজন সম্ভ্রান্ত ও গৌরবদীপ্ত ব্যক্তি আসছে। এরপর হারেছ আসেন এবং মুসলমান হয়ে যান। হুযূর (সাঃ) তাঁর সাথে কোলাকুলি করলেন এবং স্বীয় চাদর তাঁর জন্যে বিছিয়ে দিলেন।

বনীল বুকার আগমন

ইবনে সা'দ, ইবনে শাহীন ও ছাবেত রেওয়ায়েত করেন ঃ নবম হিজরীতে বনিল বুকার তিন ব্যক্তি আগমন করে—মোয়াবিয়া ইবনে সা'দ, তদীয় পুত্র বিশর এবং নজী ইবনে আবদুল্লাহ। তাদের সঙ্গে আবদে আমর নামক এক ব্যক্তিও ছিল। মোয়াবিয়া আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আমার পুত্র বিশরের চোখে মুখে হাত বুলিয়ে দিন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিশরের চোখে মুখে হাত বুলিয়ে দিলেন। তাকে মেটে রঙের একটি ভেড়া দান করলেন এবং বরকতের দোয়া করলেন। জা'দ বলেন ঃ বণিল বুকা প্রায়ই দুর্ভিক্ষের শিকার হত; কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরা কোন দুর্ভিক্ষে পতিত হয়নি। মোহাম্মদ ইবনে বিশর ইবনে মোয়াবিয়া এক কবিতায় বলেন ঃ

ঃ আমার পিতা সেই ব্যক্তি, যাঁর মাথায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন পবিত্র হাত বুলিয়েছেন এবং তাঁর জন্যে কল্যাণ ও বরকতের দোয়া করেছেন। তিনি আমার পিতাকে উচ্চ বংশীয় ও অধিক দুগ্ধবতী ভেড়া দান করেছেন।

এ সকল ভেড়া সকাল বিকাল প্রচুর পরিমানে দুধ দিত। এ দান দাতার মতই বরকতময় ছিল। আমি আজীবন তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করতে থাকব।"

বুখারী ও বগভী রেওয়ায়েত করেন ঃ ছায়েদ ইবনে আলা ইবনে বিশর আপন পুত্রের সাথে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আসেন। তিনি তাঁর মাথায় পবিত্র হাত বুলিয়ে দেন এবং বরকতের দোয়া করেন। তাঁর মুখমণ্ডলে এ কারণে বিশেষ ঔজ্জ্বল্য ছিল। সে যে বস্তুর উপর হাত বুলাত, তা রোগ ও দোষ থেকে মুক্ত হয়ে যেত।

নজীবের আগমন

ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন ঃ নজীব গোত্রের দূতগণ নবম হিজরীতে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আগমন করে। তাদের মধ্যে একটি বালক ছিল! সে

রসূলুল্লাহকে (সাঃ) বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার অভাব পূরণ করুন। হুযুর (সাঃ) বললেন ঃ তোমার আবার কিসের অভাব? বালক বলল ঃ আপনি আমার জন্যে দোয়া করুন। আল্লাহ তায়ালা যেন আমার মাগফেরাত করেন, আমার প্রতি রহম করেন এবং আমার অন্তরে অভাবমুক্ততা সৃষ্টি করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ وَاجْعَلْ غِنَاهُ فِىْ قَلْبِهٖ

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তার মাগফেরাত কর, তার প্রতি রহম কর এবং তার অন্তরকে অভাবমুক্ত করে দাও।

প্রতিনিধি দল দেশে ফিরে গেল। দশম হিজরীতে হজ্বের মওসুমে মিনায় সেই প্রতিনিধি দলটি পুনরায় আগমন করল। হুযূর (সাঃ) তাদের কাছে সেই বালকের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলল ঃ আল্লাহ তা'আলা তাকে অশেষ সৌভাগ্য নছীব করেছেন। তাঁর মত অল্পেতুষ্ট মানুষ দ্বিতীয়টি নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমি আশা করি সে সর্ব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ হয়ে মৃত্যুবরন করবে।

সালমানের প্রতিনিধি দলের আগমন

আবূ নঈম রেওয়ায়েত করেন, সালমানের প্রতিনিধি দল দশম হিজরীর শওয়াল মাসে আগমন করে। নবী করীম (সাঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের শহর কেমন? তাঁরা বলল ঃ দুর্ভিক্ষ পীড়িত। আপনি আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করুন যাতে আমাদের শহর বর্ষণসিক্ত হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَسْقِهِمْ فِىْ بِلَادِهِمْ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাদের শহরকে সিক্ত কর।

তাঁরা আরয করল ঃ হে আল্লাহর নবী! আপনি দোয়ার জন্য হাত তুলুন। আপনি হাত তুললে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে। হুযূর (সাঃ) মুচকি হেসে এই পরিমাণে হাত তুললেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হয়ে গেল। প্রতিনিধি দল আপন শহরে ফিরে গেল। সেখানে তাঁরা দেখল যে, যেদিন এবং যে সময়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করেছিলেন, ঠিক তখনি বৃষ্টি হয়েছিল।

জিনদের দূতদের আগমন

আবূ নঈম বলেন ঃ জিনদের প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে তেমনি ইসলাম গ্রহণ করত, যেমন মানব-প্রতিনিধিদল এসে ইসলাম গ্রহণ করত।

আবূ নঈম রেওয়ায়েত করেন যে, ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ ছুফ্ফার অধিবাসীদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে রাতের খানা খাওয়ানোর জন্যে এক একজন সাহাবী সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বাকী রইলাম কেবল আমি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে উম্মে সালামাহ (রাঃ)-এর কক্ষে পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাকী গারকাদে পৌঁছলেন। আপন লাঠি দ্বারা একটি বৃত্ত এঁকে আমাকে তার মধ্যে বসিয়ে দিয়ে বললেন ঃ আমার ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি এর বাইরে পা রাখবে না। অতঃপর তিনি চলে গেলেন। আমি খেজুর বাগানের মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে দেখছিলাম। হঠাৎ কাল ধূলা উত্থিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। আমি ভাবলাম তাঁর কাছে চলে যাই। সম্ভবত ঃ এরা হাওয়াযেন গোত্রের যোদ্ধা। রসূলুল্লাহকে (সাঃ) হত্যা করার জন্যে প্রতারণা পূর্বক আগমন করেছে। আমি আরও ভাবলাম যে, লোকজন ডেকে আনি। কিন্তু রসূলুল্লাহর (সাঃ) এ নির্দেশও আমার মনে ছিল যে, এখান থেকে বের হবে না। আমি শুনলাম, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে লাঠি দিয়ে প্রহার করছেন এবং তাদেরকে বসতে বলছেন। তারা বসে গেল। ভোর হওয়ার কাছাকাছি সময়ে তারা সেখান থেকে প্রস্থান করল। হুযূর (সাঃ) আমার কাছে এসে বললেন ঃ এরা ছিল জিনদের প্রতিনিধি দল। তারা আমার কাছে পাথেয় দেওয়ার আবেদন করেছিল, এখন তারা যে হাড্ডি পাবে, তাতে পূর্ণমাত্রায় গোশত বিদ্যমান থাকবে এবং যে গোবর পাবে, তার মধ্যেই খাদ্য বিদ্যমান পাবে।

আবূ নঈম রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে ফজরের নামায মসজিদে পড়ালেন। বাইরে আসার সময় তিনি বললেন ঃ আজ রাতে কে আমার সাথে জিনদের প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানাবে? আমি তাঁর সাথে গেলাম। মদীনার পাহাড়সমূহ অতিক্রম করে আমরা এক প্রশস্ত ভূখণ্ডে উপস্থিত হলাম। আমাদের সামনে দীর্ঘদেহী লোকজন আগমন করল। তারা তাদের পায়ের মাঝখানে কাপড় ধুতির মত করে জড়িয়ে রেখেছিল। তাদেরকে দেখে ভয়ে আমার পদযুগল কাঁপতে লাগল। তাদের নিকটে পৌঁছলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে আমার জন্যে একটি বৃত্ত এঁকে আমাকে তাতে বসিয়ে দিলেন। এরপর আমার ভয়ভীতি দূর হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের কাছে গেলেন এবং কোরআন তেলাওয়াত করলেন। তারা সকাল পর্যন্ত সেখানে রইল। তিনি ফিরে এসে বললেন ঃ আমার সঙ্গে এস। আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। তিনি বললেন ঃ পিছন ফিরে দেখ তো তাদেরকে দেখা যায় কি না? আমি বললাম ঃ প্রচুর কাল ছায়া দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাটির দিকে মাথা নীচু করলেন এবং একটি হাড্ডি ও গোবর তুলে তাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর বললেন ঃ তারা আমার কাছে পাথেয় চেয়েছিল। আমি পাথেয় স্বরূপ হাড্ডি ও গোবর নির্দিষ্ট করে দিয়েছি।

আবূ নঈমের রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে গেলাম। তিনি বললেন ঃ আমার জন্যে পাথর নিয়ে এস। আমি এস্তেঞ্জা করব। হাড্ডি আর গোবর আনবে না। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ আমার কাছে সিরিয়ার নছীবাইনে বসবাসকারী জিনরা এসেছিল। তারা আমার কাছে পাথেয় চাইলে আমি দোয়া করেছি, তারা যে হাড্ডি ও গোবর পায়, তাতে যেন তাদের খাদ্য থাকে।

আবূ নঈমের রেওয়ায়েতে আবূ সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ মদীনায় জিনদের একটি মুসলমান দল আছে। যদি কেউ কিছু দেখে, তবে তিন দিন পর্যন্ত আযান দেবে। এরপরও দেখলে তাকে হত্যা করবে। কারণ, সে শয়তান।

আবূ নঈম ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে জিনদের দূত দ্বীপ থেকে আগমন করে। কিছুদিন অবস্থান করার পর ফেরার সময় পাথেয় তলব করে। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে তো এই মুহূর্তে তোমাদেরকে দেবার মত কিছু নেই। তবে তোমরা যে হাড্ডি পাবে, তাতে গোশত এসে যাবে এবং যে গোবর পাবে, তা খোরমা হয়ে যাবে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাড্ডি ও গোবব দিয়ে এস্তেঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন।

আহমদ, বাযযার, আবূ ইয়ালা ও বায়হাকী ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ব্যক্তি খয়বর থেকে মদীনার পথে রওয়ানা হলে দু'ব্যক্তি তার পিছু নিল। তৃতীয় এক ব্যক্তি বলল ঃ তোমরা উভয়েই ফিরে যাও। অতঃপর সে পথিকের সঙ্গে মিলিত হয়ে বলল ঃ এরা উভয়েই ছিল শয়তান। আমি ওদেরকে তোমার কাছ থেকে দূর করে দিয়েছি। রসূলুল্লাহকে (সাঃ) আমার সালাম বলে দেবে, আর বলবে ঃ আমি আমার কওমের যাকাত আদায় করছি। জমা দেয়ার যোগ্য হয়ে গেলেই পাঠিয়ে দেব। লোকটি যখন রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে পৌঁছল এবং ঘটনা বর্ণনা করল, তখন তিনি একাকী সফর করতে নিষেধ করে দিলেন।

আবুশ শায়খ ও আবূ নঈমের রেওয়ায়েতে বেলাল ইবনে হারেছ বলেন ঃ আমরা একবার নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে আরাজ নামক স্থানে অবতরণ করলাম। আমি তাঁর নিকটে পৌঁছে কর্কশ কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে পেলাম। মনে হচ্ছিল যেন অনেক মানুষ ঝগড়া-বিবাদ করছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হেসে হেসে বললেন ঃ আমার সামনে মুসলমান জিন ও কাফের জিনরা তাদের বিবাদ পেশ করেছে। তারা আমার কাছে থাকার জায়গা চেয়েছে। আমি মুসলমান জিনদের হবসে এবং মুশরিক জিনদেরকে গওরে থাকার জায়গা দিয়েছি। রাবী বর্ণনা করেন, গ্রাম ও পাহাড়ের নাম হবস এবং পাহাড় ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থানকে বলা হয় গওর। হবসে বিপদে পড়লে রক্ষা পাওয়া যায়, কিন্তু গওরে রক্ষা নেই।

খতীবের রেওয়ায়েতে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) এমন তিনটি মোজেযা দেখেছি যে, তাঁর প্রতি কোরআন অবতীর্ণ না হলেও আমি তাঁর প্রতি ঈমান আনতাম। আমরা এক মরুভূমিতে গেলাম। মরুভূমির সম্মুখে রাস্তা বন্ধ ছিল। হুযূর (সাঃ) সেখানে মলত্যাগ করলেন। সেখানে আলাদা আলাদা জায়গায় দু'টি খেজুর বৃক্ষ ছিল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ জাবের এই বৃক্ষ দু'টিকে এক জায়গায় চলে আসতে বল। আমি তাই করলাম। উভয় বৃক্ষ এক জায়গায় এসে এমনভাবে মিলিত হয়ে গেল, যেন তারা একই মূল শিকড় থেকে উদগত। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) উযূ করলেন। আমি মনে মনে বললাম ঃ তাঁর পবিত্র উদর থেকে যা কিছু নির্গত হয়েছে, আমি তা খেয়ে নিব। কিন্তু আমি দেখলাম, মাটি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি মলত্যাগ করেননি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, কিন্তু মাটির প্রতি আদেশ আছে নবীগণের উদর থেকে নির্গত বস্তু যেন সে গোপন করে ফেলে। এরপর উভয় বৃক্ষ পৃথক হয়ে স্বস্থানে চলে গেল। এরপর আমাদের চলার পথে একটি কাল সাপ দেখা গেল। সে তার ফণা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কানের কাছে রেখে কিছু কানাকানি করল। এরপর এমন অদৃশ্য হয়ে গেল যেন মৃত্তিকা তাকে গিলে ফেলেছে। আমি আরয করলাম, হুযূর, আপনি এই সাপ দেখে ভয় পাননি? তিনি বললেন ঃ এটি সাপ নয়, জিনদের দূত। জিনরা একটি সূরা ভুলে যাওয়ার পর ওকে আমার কাছে পাঠিয়েছে। আমি তার সামনে কোরআন শরীফ তুলে ধরেছি।

এরপর আমরা একটি গ্রামে পৌঁছলাম। একদল লোক চাঁদের মত সুন্দর একটি উন্মাদ বালিকাকে নিয়ে আমাদের সামনে এল। তারা বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এই বালিকার জন্যে দোয়া করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলেন এবং বালিকাটির উপর যে জিনের আছর ছিল সেটিকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোর সর্বনাশ হোক। আমি আল্লাহর রসূল মোহাম্মদ। তুই এই বালিকার কাছ থেকে চলে যা। একথা বলতেই বালিকা তার মুখের উপর নেকাব টেনে নিল। তার লজ্জাশরম ফিরে এল এবং সে সুস্থ হয়ে গেল।

জাহ্জাহের আগমন

ইবনে আবী শায়বা রেওয়ায়েত করেন যে, জাহজাহ্ রসূলুল্লাহর (সাঃ) অতিথি হলে তিনি তার জন্যে একটি ছাগলের দুধ দোহন করতে বললেন। জাহজাহ্ তা পান করে ফেলে। এরপর একটি একটি করে সে সাতটি ছাগলের দুধ নিঃশেষে পান করে ফেলে। পরদিন সকালে জাহজাহ মুসলমান হয়ে গেলে

Contents

তার জন্য একটি ছাগলের দুধ আনা হল। সে তা পান করে ফেলল। কিন্তু দ্বিতীয় ছাগলের দুধ পুরোপুরি পান করতে পারল না। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ মুমিন এক অন্ত্রে পান করে, আর কাফের সাত অন্ত্রে পান করে।

রাশেদ ইবনে আবদে রাব্বিহির আগমন

আবূ নঈমের রেওয়ায়েতে রাশেদ ইবনে আবদে রাব্বিহি বলেন ঃ রিহাতের নিকটে মুয়াল্লায় সুওয়া' নামক একটি প্রতিমা ছিল।

বনু যুফর নৈবেদ্য দিয়ে আমাকে তার কাছে প্রেরণ করল। আমি সকাল বেলায় সুওয়া'র পূর্বে আরও একটি প্রতিমার কাছে পৌঁছলাম। আমি হঠাৎ তার পেট থেকে এক আওয়াজদাতাকে বলতে শুনলাম ঃ

العجب كل العجب من خروج نبى من بنى عبد المطلب

يحرم الزنا والربا والذبح الاصنام

অর্থাৎ, আশ্চর্যের বিষয়, বনী আবদুল মুত্তালিব থেকে একজন নবী আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি ব্যভিচার, সুদ, মূর্তির নামে যবেহ হারাম করেন।

এরপর দ্বিতীয় প্রতিমার পেট থেকে এই আওয়াজ বের হল ঃ যিমার পরিত্যক্ত হয়েছে, যার এবাদত করা হত। আহমদ আত্মপ্রকাশ করেছেন। তিনি নামায পড়েন, যাকাত দেন এবং রোযা রাখেন।

এরপর তৃতীয় মূর্তির পেট থেকে এই আওয়াজ এল ঃ

যিনি মরিয়ম-তনয়ের পর নবুওয়ত ও হেদায়াতের অধিকারী হয়েছেন, তিনি একজন কোরায়শী এবং সুপথপ্রাপ্ত। তিনি অতীতের ও ভবিষ্যতের খবর দেন।

রাশেদ বলেন ঃ ফজরের সময় আমি দেখলাম, শৃগাল সুওয়া'র কাছে রাখা প্রসাদ খেয়ে যাচ্ছে। প্রসাদ খাওয়ার পর শৃগালরা তার উপর আরোহণ করে পেশাব করে দিল। এ দৃশ্য দেখে রাশেদ এই কবিতা বললেন ঃ শৃগালরা যার গায়ে পেশাব করে দেয়, সে কি কারো উপাস্য হতে পারে? সে তো আসলে খুবই ঘৃণিত বস্তু।

এটা হিজরতের পরের ঘটনা। রাশেদ স্বস্থান থেকে রওয়ানা হয়ে মদীনায় পৌঁছলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে মুসলমান হয়ে গেলেন। রাশেদ তাঁর কাছে একখন্ড ভূমি প্রার্থনা করলে তিনি রিহাতে তা দিয়ে দেন। তাকে পানির একটি কলসও দেন— যা পানিতে পূর্ণ ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাতে মুখের লালা মিশ্রিত করে রাশেদকে বললেন ঃ এই পানি মাটিতে ঢালবে এবং অবশিষ্ট পানি

মানুষ নিতে চাইলে বাধা দিবে না। রাশেদ তাই করলেন। সেই পানি থেকে উৎপন্ন একটি ঝরণা আজ পর্যন্ত প্রবাহিত হচ্ছে। রাশেদ এই মাটিতে খেজুরের বাগান করেছিলেন। সমগ্র রিহাত অঞ্চলের লোকেরা এই পানিই পান করত। সেখানকার অধিবাসীরা একে 'মাউর রাসূল' বলে এবং রোগ-ব্যাধিতে পান করে আরোগ্যও লাভ করে।

হাজ্জাজ ইবনে ইলাতের ইসলাম গ্রহণ

ইবনে আবিদ্দুনিয়া ও ইবনে আসাকির রেওয়ায়েত করেন যে, হাজ্জাজ ইবনে ইলাত আপন সম্প্রদায়ের কয়েক ব্যক্তির সাথে উটে সওয়ার হয়ে মক্কার পথে রওয়ানা হন। পথে রাত হয়ে যাওয়ায় তিনি আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং দাঁড়িয়ে এই কবিতা পাঠ করতে থাকেন–

আমি আমার এবং আমার সঙ্গীদের জন্যে দেশে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক জিন থেকে আশ্রয় চাই। অতঃপর হাজ্জাজ কাউকে পাঠ করতে শুনলেন ঃ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ, শহরে পৌছে হাজ্জাজ এ ঘটনা কোরায়শদের কাছে বর্ণনা করলে তারা বলল ঃ এই আয়াত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি এখন মদীনায় আছেন। এরপর হাজ্জাজ মুসলমান হয়ে গেলেন।

রাফে' ইবনে ওমায়রের ইসলাম গ্রহণ

খারায়েতীর রেওয়ায়েতে সায়ীদ ইবনে জুবায়র বর্ণনা করেন ঃ বনী তামীমের একব্যক্তি রাফে' ইবনে ওমায়র বলেছেন ঃ আমি এক রাতে বালুকাময় ভূমিতে সফর করছিলাম। নিদ্রা এলে পর আমি আঁতকে উঠে বললাম ঃ اَعُوْذُ بِعَظِيْمِ هٰذَا الْوَادِىْ مِنَ الْجِنِّ –আমি এই উপত্যকা-প্রধানের কাছে জিন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। হঠাৎ এক বৃদ্ধ জিন আমার সামনে এসে বলল ঃ তুমি যখন কোন ভয়ংকর মরুভূমিতে যাও, তখন একথা বলবে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ رَبِّ مُحَمَّدٍ مِنْ هٰذَا الْوَادِىْ –আমি মোহাম্মদের রব আল্লাহর কাছে এই

উপত্যকার জিন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। কেননা, জিনদের শাসন বাতিল হয়ে গেছে। আমি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই মোহাম্মদ কে? সে বলল ঃ ইনি নবী। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ কোথায় থাকেন? সে বলল ঃ ইয়াসরিবে। একথা শুনে আমি উটে সওয়ার হয়ে মদীনায় পৌঁছে গেলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে দেখে আমার ঘটনা নিজেই বর্ণনা করলেন এবং আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আমি মুসলমান হয়ে গেলাম।

হাকাম ইবনে কাইয়ানের ইসলাম গ্রহণ

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে মেকদাদ ইবনে আমর বলেন ঃ আমি হাকাম ইবনে কাইয়ানকে বন্দী করে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে বিরত রইল এবং ইসলাম গ্রহণ করতে বিলম্ব করল।

হযরত ওমর (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি কোন্ আশায় তাকে বারবার ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন? আল্লাহর কসম, সে শেষ পর্যন্ত মুসলমান হবে না। আপনি অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী করীম (সাঃ) হযরত ওমরের (রাঃ) প্রতি ভ্রূক্ষেপও করলেন না। শেষ পর্যন্ত হাকাম মুসলমান হয়ে গেল।

আবূ সুফরার আগমন

ইবনে মান্দা ও ইবনে আসাকির রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ সুফরা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে বয়আতের উদ্দেশ্যে আগমন করে। তার পরনে ছিল হলদে রঙের মূল্যবান বস্ত্রজোড়া। সে আঁচল টেনে টেনে অহংকার ভরে আসছিল। সে ছিল সুন্দর, দীর্ঘদেহী, গম্ভীর ও স্পষ্টভাষী। নবী করীম (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কে? সে বলল ঃ আমি কাতে (ছিন্নকারী) ইবনে সারেক (চোর) ইবনে যালেম (অত্যাচারী)। আমার পিতামহ ছিলেন জলন্দী। তিনি নৌকা ছিনতাই করতেন। আমি বাদশাহ এবং বাদশাহযাদা। এত যমকালো পরিচয় শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি কেবল আবূ সুফরা। সারেক, যালেম ইত্যাদি উপাধি পরিত্যাগ কর। সে বলল ঃ আমি সাক্ষ্য দেই, আপনি আল্লাহর সত্য রসূল। আমার আঠার সন্তান। সর্বশেষ সন্তানটি কন্যা, যার নাম আমি সুফরা রেখেছি।

ইকরামা ইবনে আবূ জাহলের আগমন

হাকেম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আবূ জাহল আমার কাছে এসেছে এবং বয়আত হয়েছে। অতঃপর খালেদ মুসলমান হলে কেউ বলল ঃ হুযূর, আল্লাহ তা'আলা আপনার স্বপ্ন খালেদের ইসলাম গ্রহণ দ্বারা সত্য করে দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ খালেদের ইসলাম গ্রহণ ভিন্ন ব্যাপার। এ স্বপ্ন অন্যের দ্বারা সফল হবে। অবশেষে আবূ জাহলের পুত্র মুসলমান হয়ে গেলে রসূলুল্লাহর (সাঃ) স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করল।

হাকেম উম্মে সালামাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমি আবূ জাহলের জন্যে জান্নাতে ফলন্ত খেজুর বৃক্ষ দেখেছি। অতঃপর ইকরামা মুসলমান হলে আমি বললাম ঃ এটিই হচ্ছে সেই ফলন্ত খেজুর গাছ।

ইবনে আসাকির হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ইকরামা ইবনে আবূ জাহল সখর আনসারীকে হত্যা করলে সংবাদ পেয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাসলেন। জনৈক আনসারী বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি হাসলেন, অথচ আপনার কওমের এক ব্যক্তি আমাদের কওমের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে! রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমার হাসির কারণ এটা নয়, বরং কারণ এই যে, ঘাতক এই ব্যক্তিকে হত্যা করে এখন নিজে তার পর্যায়ে চলে গেছে।

নাখা' গোত্রের দূতের আগমন

ইবনে শাহীন রেওয়ায়েত করেন যে, নাখার দূতগণ দশম হিজরীর মুহররম মাসে আগমন করেন। তাদের নেতা ছিলেন যারারা ইবনে আমর। যারারা আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি পথিমধ্যে একটি স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছি। আমি একটি মাদী গাধা দেখেছি, যাকে আমি আপন গৃহে রেখে এসেছি। সে একটি লালিমাযুক্ত কদাকার ছাগলছানা প্রসব করেছে। আমি অগ্নি দেখেছি, যা ভূগর্ভ থেকে বের হয়ে আমার ও আমার পুত্রের মধ্যে অন্তরায় হয়ে গেছে। আমি নো'মান ইবনে মুনযিরকে দেখেছি, যার কানে কানফুল, হাতে বাজুবন্দ এবং পরনে দু'টি সুগন্ধিযুক্ত বস্ত্রজোড়া রয়েছে। আমি একজন সাদা-কাল কেশবিশিষ্টা বৃদ্ধাকে মাটি থেকে বের হতে দেখেছি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি বাড়িতে একটি মন মোহিনী গর্ভবতী বাঁদী রেখে এসেছ। যারারাহ বললেন ঃ নিঃসন্দেহে তাই। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ সে

একটি শিশু প্রসব করেছে, যে তোমারই পুত্র। যারারা বললেন ঃ তা হলে সেই পুত্র সন্তান কদাকার কেন? তিনি এরশাদ করলেন ঃ তোমার কুষ্ঠ রোগ আছে এবং তুমি তা গোপন কর। যারারা বললেন ঃ নিঃসন্দেহে আমার কুষ্ঠ আছে। আল্লাহর কসম, আপনি ছাড়া কেউ তা জানে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এই কদর্যতা কুষ্ঠের কারণেই। যে অগ্নি তুমি দেখেছ, সেটি একটি ফেতনা বা গোলযোগ, যা আমার পরে সংঘটিত হবে। যারারা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সে ফেতনাটি কি? তিনি বললেন ঃ জনসাধারণ তাদের ইমামকে হত্যা করবে এবং এত কলহ করবে যে, মুমিনের রক্তপাত পানির মত স্বাদযুক্ত ও সহনীয় হয়ে যাবে। তুমি মরে গেলে ফেতনা হবে তোমার পুত্রের সামনে, আর জীবিত থাকলে তোমার সামনে হবে।

যারারা আরয করলেন ঃ আপনি দোয়া করুন, এই ফেতনার সময় আমি যেন জীবিত না থাকি। হুযূর (সাঃ) যারারার জন্যে দোয়া করলেন। রাবী বর্ণনা করেন, যারারার পুত্র আমর সর্বপ্রথম হযরত উছমান (রাঃ)-এর বয়আত ভঙ্গ করে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ নো'মান ও তার পরনে যে সকল বস্তু দেখেছ, তা এজন্যে যে, নোমান আরবের বাদশাহ। তার সৌন্দর্য, গরিমা ও সাজসজ্জা আরও বৃদ্ধি পাবে। আর যে বৃদ্ধাকে দেখেছ, সে হচ্ছে অবশিষ্ট দুনিয়া।

বনী তামীমের আগমন

ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন যে, বনী তামীমের প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আসে এবং আতারেদ ইবনে হাজেবকে বক্তৃতা দেয়ার জন্যে সম্মুখে বাড়িয়ে দেয়। আতারেদ ছিল একজন সুবক্তা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বক্তৃতার চমক লাগিয়ে দেয়া। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জওয়াবে বক্তৃতা দেয়ার জন্যে ছাবেত ইবনে কায়সকে আদেশ দিলেন। ছাবেত বক্তৃতায় পারদর্শী ছিলেন না এবং পূর্বে কখনও বক্তৃতা দেননি। তিনি বক্তৃতা চমৎকার দিলেন। বনী তামীমের কবি যবরকান দাঁড়িয়ে কবিতা পাঠ করলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জওয়াবে কবিতা পাঠ করার জন্যে হাসসানকে আদেশ দিলেন এবং বললেন ঃ নবীর প্রতিরক্ষায় হাসসান জিবরাঈলের সমর্থন পাবে। হাসসান অত্যন্ত সাবলীলভাবে কবিতা পাঠ করলেন। তাঁর কবিতা শুনে বনী তামীমের লোকেরা বলতে লাগল ঃ আল্লাহর কসম, এই ব্যক্তি আল্লাহর সমর্থনপ্রাপ্ত কবি। তাদের বক্তা আমাদের বক্তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ এবং তাদের কবি আমাদের কবি অপেক্ষা অধিক প্রাঞ্জলভাষী। তারা আমাদের চাইতে অধিক বুদ্ধিদীপ্ত।

কতিপয় বেদুঈনের আগমন

বাযযার ও আবূ নঈম বুরায়দা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহর (সাঃ) নিকট আগমন করে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি মুসলমান হয়ে গেছি। আপনি আমাকে কিছু দেখান, যাতে আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কি দেখতে চাও? সে বলল ঃ আপনি এই বৃক্ষকে নিজের কাছে আসতে বলুন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি যাও এবং তাকে ডাক। বেদুঈন বৃক্ষের কাছে যেয়ে বলল ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোকে ডাকছেন। অমনি বৃক্ষটি এক পাশে ঝুঁকে পড়ল। ফলে, একপাশের শিকড়গুলো ছিঁড়ে আলাদা হয়ে গেল। অতঃপর অপরদিকে ঝুঁকে পড়লে অপরদিকের শিকড়গুলোও ছিঁড়ে গেল। অতঃপর বৃক্ষটি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে গেল এবং "আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ" বলল। বেদুঈন এই মোজেযা দেখে অভিভূত হয়ে পড়ল এবং বলল ঃ যথেষ্ট হয়েছে। রসূল করীম (সাঃ) বৃক্ষকে বললেন ঃ ফিরে যা। বৃক্ষ ফিরে গেল এবং স্বস্থানে দৃঢ় হয়ে গেল। বেদুঈন আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে আপনার মাথা ও পা চুম্বন করার অনুমতি দিন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) অনুমতি দিলে সে তাঁর মাথা ও পা চুম্বন করল। বেদুঈন আবার বলল ঃ আপনাকে সেজদা করার অনুমতি দিন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ কোন মানুষকে সেজদা করা যায় না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, বনী আমের ইবনে সা'সাআর জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে বলল ঃ আমি কিরূপে জানব যে, আপনি আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন ঃ যদি আমি বৃক্ষের এই শাখাকে নিজের কাছে ডেকে আনি, তবে তুমি আমার রেসালত স্বীকার করে নিবে? সে বলল ঃ নিঃসন্দেহে। সেমতে তিনি বৃক্ষ শাখাকে ডাকলেন। শাখাটি বৃক্ষ থেকে আলাদা হয়ে দৌড়ে চলে এল। আবূ নঈমের রেওয়ায়েতে আরও আছে, শাখাটি রসূলুল্লাহকে (সাঃ) সেজদা করে সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি তাকে বললেন ঃ ফিরে যা। সে ফিরে গেল। বেদুঈন এই মোজেযা দেখে বলে উঠল ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমরা এক সফরে রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে ছিলাম। জনৈক বেদুঈনকে দেখে রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কোথায় যাচ্ছ? সে বলল ঃ বাড়ী যাচ্ছি। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ কোন ভাল কাজের ইচ্ছা আছে কি? বেদুঈন বলল ঃ কি ভাল কাজ? হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ এক। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। মোহাম্মদ

আল্লাহর রসূল ও বান্দা। বেদুঈন জিজ্ঞাসা করল ঃ আপনার এ কথার সাক্ষী কে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) জওয়াব দিলেন ঃ এই বৃক্ষ সাক্ষী। অতঃপর তিনি মরুভূমির প্রান্তে অবস্থিত বৃক্ষকে ডাক দিলেন। বৃক্ষটি মাটি চিরে চিরে তাঁর কাছে চলে এল। তিনি তার কাছ থেকে তিনবার সাক্ষ্য নিলেন। এরপর বৃক্ষটি স্বস্থানে চলে গেল। বেদুঈন বলল ঃ আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার কথা মানলে আমি তাদেরকে নিয়ে আপনার কাছে আসব। নতুবা আমি একাই আসব এবং আপনার কাছেই থাকব।

বিদায় হজ্জের সফর

উসামা ইবনে যায়দ রেওয়ায়েত করেন–আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে হজ্জের সফরে রওয়ানা হলাম। বাতনে রাওহায় পৌঁছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর দিকে একজন মহিলাকে আসতে দেখলেন। তিনি তাঁর উট থামিয়ে দিলেন। মহিলা নিকটে এসে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার এই পুত্র জন্ম থেকেই রোগাক্রান্ত। হুযূর (সাঃ) শিশুটিকে তার মায়ের কাছ থেকে নিয়ে আপন বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। অতঃপর কোলে বসালেন। অতঃপর তার মুখে থুথু দিয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহর দুশমন! বের হয়ে যা। আমি আল্লাহর রসূল। অতঃপর শিশুকে মহিলার কাছে দিতে দিতে বললেন ঃ এখন কোন আশংকা নেই।

রসূলে করীম (সাঃ) হজ্জ সমাপনান্তে ফেরার পথে যখন রাওহায় উপস্থিত হলেন, তখন সেই মহিলা একটি ছাগল ভাজা করে নিয়ে এল। হুযূর (সাঃ) আমাকে (উসামাকে) বললেন ঃ আমাকে ছাগলের বাহু দিয়ে দাও। আমি দিয়ে দিলাম। তিনি আবার বললেন ঃ আমাকে বাহু দিয়ে দাও। আমি দিয়ে দিলাম। তিনি তৃতীয়বার বললেন ঃ আমাকে বাহু দিয়ে দাও। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! ছাগলের তো বাহু দুটিই হয়। আমি তো দুটিই আপনাকে দিলাম। হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ আল্লাহর কসম, যদি তুমি চুপ থাকতে, তবে আমি যতবার বাহু চাইতাম, ততবারই দিতে পারতে। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ দেখ, কোন বৃক্ষ অথবা প্রস্তরখণ্ড আছে কি না? আমি বললাম ঃ আমি খর্জুর বৃক্ষ পরস্পর কাছাকাছি দেখছি। তিনি বললেন ঃ তুমি খর্জুর বৃক্ষের কাছে যেয়ে বল ঃ তোমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রয়োজনে পরস্পরে কাছে এসে পড়। এমনিভাবে প্রস্তরখণ্ডকেও বলে দাও। আমি তাই করলাম। বৃক্ষরা মাটি চিরে চিরে এসে একত্রিত হয়ে গেল এবং প্রস্তরখণ্ড গড়িয়ে গড়িয়ে বৃক্ষের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। হুযূর (সাঃ) প্রয়োজন সেরে আমাকে বললেন ঃ এগুলোকে স্বস্থানে চলে যেতে বল।

আহমদ, বায়হাকী ও আবূ নঈমের রেওয়ায়েতে ইয়ালা বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) তিনটি মোজেযা দেখেছি। একবার আমি তাঁর সাথে সফরে ছিলাম। আমরা এক উটের কাছ দিয়ে গেলাম। উটটি পানির মশক বহন করত। রসূলুল্লাহকে (সাঃ) দেখে সে তার ঘাড় মাটিতে রেখে দিল। তিনি উটের মালিককে ডাকলেন এবং বললেন ঃ এই উটটি কাজের আধিক্য ও খাদ্যের স্বল্পতার অভিযোগ করেছে। তুমি এর সাথে ভাল ব্যবহার কর। এরপর রওয়ানা হয়ে আমরা এক মনযিলে অবতরণ করলাম যেখানে তিনি বিশ্রাম নিলেন। একটি বৃক্ষ এসে রসূলুল্লাহকে (সাঃ) ছায়া দিল। তিনি জাগ্রত হলে বৃক্ষ স্বস্থানে চলে গেল। তিনি বললেন, এই বৃক্ষ আমাকে সালাম করার জন্যে আল্লাহর কাছে অনুমতি চাইলে সে অনুমতি পেয়ে যায়।

উম্মে জুনদুব বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহকে (সাঃ) জামরাতুল-আকাবার কাছে দেখলাম। তিনি কংকর নিক্ষেপ করলেন। লোকেরাও কংকর নিক্ষেপ করল। তিনি সেখান থেকে রওয়ানা হলে এক মহিলা তার শিশুকে নিয়ে এল। শিশুটির উপর ভূতের প্রভাব ছিল। মহিলা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে তার অবস্থা বর্ণনা করলে তিনি তাকে পানি আনতে বললেন। পানি নিয়ে এলে তিনি তাতে কুলি করলেন এবং দোয়া করে মহিলাকে বললেন ঃ শিশুকে এই পানি পান করাবে এবং গোসল করাবে। উম্মে জুনদুব বর্ণনা করেন, আমি মহিলার পিছনে পিছনে গেলাম এবং বললাম ঃ আমাকে সামান্য পানি দাও। সে আমার হাতে পানি দিল। আমি সেই পানি আমার গুরুতর অসুস্থ পুত্র আবদুল্লাহকে পান করালাম। সে সুস্থ হয়ে গেল। এভাবে রসূলুল্লাহর (সাঃ) বরকতে আমার পুত্রও জীবন পেল এবং সেই মহিলার শিশুও সুস্থ হয়ে গেল। আবূ নঈম বর্ণনা করেন, সেই শিশুটি বড় হয়ে খুব জ্ঞানীগুণী হয়েছিল।

মুয়াইকীব ইয়ামানী বর্ণনা করেন–আমি বিদায় হজ্জে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমি মক্কার এক গৃহে গেলাম, যেখানে রসূলুল্লাহ (সাঃ) উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কাছে ইয়ামামার এক ব্যক্তি তার নবজাত শিশুকে নিয়ে এল। হুযূর (সাঃ) শিশুকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমি কে? সে বলল ঃ আপনি আল্লাহর রসূল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি ঠিক বলেছ। অতঃপর তিনি তাকে দোয়া দিলেন এবং বললেন ঃ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ আল্লাহ তোমার মধ্যে বরকত দিন। এই শিশু যুবক হওয়া পর্যন্ত আর কথা বলেনি। আমরা তার নাম রাখলাম মোবারকুল ইয়ামামা।

হযরত উরওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ মুসলমানগণ! এ বছরের পর এস্থানে আমি তোমাদের সাথে

মিলিত হব কি না জানি না। আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি বিষয় ছেড়ে গেলাম। তোমরা এগুলো শক্তভাবে ধরে রাখলে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। এক, আল্লাহর কিতাব। দুই, আমার সুন্নত।

হযরত জাবের (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি দেখেছি, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোরবানী দিবসে উটের উপর থেকে কংকর নিক্ষেপ করছিলেন এবং বলছিলেন ঃ তোমরা আমার কাছ থেকে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম শিখে নাও। সম্ভবত এরপর আমি হজ্জ করতে পারব না।

হযরত ইবনে ওমর রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোরবানী দিবসে মুসলমানদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এটা কোন্ দিন? জওয়াবে কোরবানীর দিন বলা হলে তিনি এরশাদ করলেন ঃ আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলী পৌঁছিয়ে দিয়েছি? উত্তরে বলা হয় ঃ নিশ্চয়ই পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী। অতঃপর তিনি সকলকে 'আলবিদা' অর্থাৎ বিদায় বললেন। মুসলমানরা বলল ঃ এটা বিদায় হজ্জ।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে মসজিদে খায়ফে উপবিষ্ট ছিলাম। ইত্যবসরে একজন আনসারী ও একজন ছকফ আগমন করল। তারা উভয়েই আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা আপনার কাছে এসেছি। তিনি বললেন ঃ তোমরা চাইলে আমি বলে দেই তোমরা কি জানতে এসেছ! আর যদি চাও তোমরাই জিজ্ঞাসা করতে থাক, আমি জওয়াব দিতে থাকি। তারা বলল ঃ আপনিই বলুন, যাতে আমাদের ঈমান আরও বেড়ে যায়। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছকফীকে বললেন ঃ তুমি এসেছ রাত্রিকালীন নামায, রুকু, সেজদা এবং রোযা ও জানাবতের গোসল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে। অতঃপর আনসারীকে বললেন ঃ তুমি জানতে এসেছ যে, তুমি কা'বার উদ্দেশ্যেই আপন গৃহ থেকে বের হয়ে কিভাবে আরাফাতে অবস্থান করবে, কিভাবে মাথা মুণ্ডন করবে, কিভাবে তওয়াফ করবে এবং কিভাবে কংকর নিক্ষেপ করবে! একথা শুনে তারা উভয়েই আরয করল ঃ আল্লাহর কসম, আমরা আপনার কাছে এসব মাসআলাই জানতে এসেছিলাম।

তিবরানী, আবূ নঈম ও হাকেম রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে পাঁচটি উট আগমন করে এবং শুয়ে পড়ে, যাতে তিনি যে উট দ্বারা ইচ্ছা কোরবানী শুরু করেন।

আসেম ইবনে হুমায়দ কূফী রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) মুয়ায ইবনে জবল (রাঃ)-কে গভর্নর করে ইয়ামন প্রেরণ করেন। বিদায়ের সময় তিনি তাঁর সাথে বাহির পর্যন্ত আসেন, তাঁকে উপদেশ দেন এবং বলেন ঃ হে মুয়ায, সম্ভবত এ বছরের পর তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। যখন ফিরে

আস, তখন আমার মসজিদ ও আমার কবর দেখবে। একথা শুনে হযরত মুয়ায অশ্রুসজল হয়ে গেলেন।

কা'ব ইবনে মালেক বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) হজ্জ করলেন এবং মুয়াযকে ইয়ামন প্রেরণ করলেন। মুয়ায যখন ফিরে এলেন, তখন হুযূর (সাঃ) ইহজগতে ছিলেন না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন-রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদায় হজ্জে আমাদেরকে হজ্জ করালেন এবং আমাকে আকাবাতুল হুজূনে নিয়ে গেলেন। তখন তিনি চিন্তান্বিত ও অশ্রুসজল ছিলেন। কিন্তু ফেরার সময় তাঁর মুখে ছিল মুচকি হাসি। আমি এসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ আমি আমার জননীর কবরে গিয়েছিলাম। আমি বাসনা করলাম তিনি যেন জীবিত হয়ে যান এবং আমার প্রতি ঈমান আনেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জীবনদান করলেন এবং তিনি ঈমান এনেছেন, অতঃপর পূর্বাবস্থায় ফিরে গেছেন।

বুখারীর রেওয়ায়েতে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন ঃ একবার আমরা রসূলে করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। আসর নামাযের সময় এসে গেল। উযূর জন্যে আমাদের কাছে পর্যাপ্ত পানি ছিল না। কারও কারও কাছে সামান্য পানি ছিল। সেই সব পানি একটি পাত্রে একত্রিত করে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আনা হল। তিনি আপন হস্ত মোবারক পাত্রে রাখলেন। অতঃপর অঙ্গুলিসমূহ খুলে দিয়ে বললেন ঃ তোমরা উযূ কর। আল্লাহ তা'আলা বরকত দিবেন। আমি দেখলাম, তাঁর অঙ্গুলিসমূহ থেকে পানি প্রবাহিত হচ্ছিল। সকলেই উযূ করল এবং পানি পান করল। তখন আমাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার চার শ'।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে ছিলাম। আসর নামাযের ওয়াক্ত এসে গেল। আমাদের কাছে পানি ছিল না। সামান্য পরিমাণে পানি হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে পেশ করা হল। তিনি আপন হস্ত মোবারক পাত্রে রেখে দিলেন এবং সকলকে বললেন ঃ উযূ কর। আমি দেখলাম তাঁর পবিত্র অঙ্গুলি থেকে পানি প্রবহমান ছিল। সকলেই এই অলৌকিক পানি দিয়ে উযূ করল।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন-একবার নামাযের সময় হলে যাদের গৃহ নিকটে ছিল, তারা আপন আপন গৃহ থেকে উযূ করে এল। কিছু লোক বাকী রয়ে গেল। রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নাহযাব নামক একটি পাথরের পাত্র আনা হল, যার মধ্যে সামান্য পানি ছিল। পাত্রটি এত ছোট ছিল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাতে হাত খুলতে পারলেন না। কিন্তু সকলেই তাতে উযূ করে নিল। হযরত আনাসকে জিজ্ঞেস করা হল, তারা সংখ্যায় কতজন ছিল? তিনি বললেন ঃ আশি কিংবা তার চেয়ে বেশী।

যিয়াদ ইবনে হারেছ সায়দায়ী বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) সফরে ছিলেন। সোবহে সাদেকের সময় তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে চলে গেলেন। ফিরে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সায়দায়ী, পানি আছে? আমি বললাম ঃ সামান্য পানি আছে, যা আপনার জন্যে যথেষ্ট হবে না। তিনি বললেন ঃ এই পানি একটি পাত্রে রেখে আমার কাছে নিয়ে আস। আমি পানি আনলে তিনি পাত্রে হাত রাখলেন। তাঁর দু'অঙ্গুলি থেকে ঝরনা প্রবাহিত হল। তিনি বললেন ঃ সাহাবীগণের মধ্যে যার পানির প্রয়োজন আছে, তাকে ডেকে নাও। অতঃপর যার পানির প্রয়োজন ছিল, সে এসে নিয়ে নিল। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের এলাকায় একটি কূপ আছে, যাতে শীতকালে প্রচুর পানি থাকে। কিন্তু গ্রীষ্মকাল এলে আমাদেরকে পানির খোঁজে এদিক-ওদিক যেতে হয়। এখন আমরা মুসলমান হয়ে গেছি। তাই আমাদের জন্যে এই কূপের পানি বেড়ে যাওয়ার দোয়া করুন, যাতে আমরা সারা বছর এই কূপ থেকেই পানি পাই। এদিক-ওদিক যেতে না হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাতটি কংকর হাতে নিয়ে দোয়া পড়লেন, অতঃপর বললেন এই কংকরগুলো নিয়ে যাও। কূপে পৌঁছে একটি করে কংকর তাতে আল্লাহর নাম নিয়ে নিক্ষেপ কর। সায়দায়ী বর্ণনা করেন ঃ আমরা হুযূর (সাঃ)-এর কথা মত কাজ করলাম। এরপর এই কূপের তলদেশ কখনও দৃষ্টিগোচর হয়নি।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। এক জায়গায় পৌঁছার পর হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-এর কান্নার শব্দ শুনা গেল। হুযূর (সাঃ) হযরত ফাতেমাকে (রাঃ) কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ পিপাসার্ত হয়ে কান্নাকাটি করছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ডাক দিয়ে কারও কাছে পানি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু কারও কাছে এক ফোঁটা পানিও ছিল না। তিনি হযরত ফাতেমাকে বললেন ঃ একজনকে আমার কাছে দিয়ে দাও। হযরত ফাতেমা (রাঃ) পর্দার নীচ দিয়ে একজনকে দিয়ে দিলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ক্রন্দনরত দৌহিত্রকে আপন বুকের উপর রাখলেন, অতঃপর আপন জিহ্বা বের করে দিলেন। শিশু জিহ্বা চুষতে লাগল এবং চুপ হয়ে গেল। এরপর অন্যজনকে নিয়েও এমনিভাবে জিহ্বা চুষালেন। তিনিও জিহ্বা চুষে চুপ হয়ে গেলেন। এরপর দৌহিত্রদ্বয়ের কান্না আর শুনা যায়নি।

এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে সফরে ছিলাম। এক পর্যায়ে সফরসঙ্গীরা পিপাসার কথা বললে হুযূর (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) ও অপর একজনকে ডেকে বললেন ঃ তোমরা আমার জন্যে পানি খোঁজ করে আন। তারা উভয়েই গেলেন। তারা একজন মহিলাকে পেলেন,

যার কাছে মশকভর্তি পানি ছিল। তারা মহিলাকে বলে— কয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নিয়ে এলেন। তিনি পানির একটি পাত্র চাইলেন এবং তাতে মহিলার মশক থেকে পানি আনলেন। অতঃপর সেই পানিতে কুলি করলেন এবং পুনরায় পানি মশকে ঢেলে দিলেন। তিনি মশকের ছোট মুখ খুলে সাহাবীগণকে পানি পান করতে এবং পাত্র ভরে নিতে ডাক দিলেন। সকলেই এসে পানি পান করলেন এবং আপন আপন পাত্র ভরে নিলেন। মহিলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছিল। আল্লাহর কসম, মশক থেকে পানি নেয়া সত্ত্বেও আমাদের মনে হচ্ছিল যেন মশকে পূর্ববৎ পানি রয়ে গেছে এবং এতটুকুও কমতি হয়নি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এই মহিলার জন্যে খাবার একত্রিত কর। আমরা তার জন্যে খেজুর, আটা ও ছাতু সংগ্রহ করলাম। ফলে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য একত্রিত হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মহিলাকে বললেন ঃ তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে, আমরা তোমার পানি ব্যয় করিনি; বরং আল্লাহপাক আমাদেরকে এই পানি পান করিয়েছেন। মহিলা যখন তার পরিবারের লোকদের মধ্যে বিলম্বে পৌঁছল, তখন তারা এই বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করল। সে বলল ঃ আমাকে দু'ব্যক্তি এমন এক লোকের কাছে নিয়ে গেল, যাকে "সাবী" (বিধর্মী) বলা হয়। এরপর সে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল এবং দু'অঙ্গুলি দিয়ে আকাশের দিকে ইশারা করে বলল ঃ খোদার কসম, এই আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে যত জাদুকর আছে, এই লোকটি তাদের সেরা জাদুকর, কিংবা সে বাস্তবিকই আল্লাহর সত্য নবী। রাবী বর্ণনা করেন, এই মহিলার আশে-পাশে বসবাসকারী মুশরিকদের উপর মুসলমানরা আক্রমণ করত; কিন্তু যে দলে এই মহিলা থাকত, তাদেরকে কিছুই বলত না। একদিন এই মহিলা তার কওমকে বলল ঃ আমার মনে হয়, তারা ইচ্ছাপূর্বক তোমাদেরকে এড়িয়ে যায়। তাই তোমাদের উচিত ইসলামকে মেনে নেয়া। এরপর তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করল।

হুমাম ইবনে নুফায়ল সা'দী বর্ণনা করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম ঃ আমরা একটি কূপ খনন করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এর পানি লবণাক্ত। হুযুর (সাঃ) আমাকে একটি পানিভর্তি লোটা দিয়ে বললেন ঃ এই পানি কূপে ঢেলে দাও। আমি ঢেলে দিলাম। ফলে, কূপের পানি মিঠা হয়ে গেল। বর্তমানে ইয়ামনে এই কূপের পানি সর্বাধিক মিঠা।

খাদ্যের আধিক্য সম্পর্কিত মোজেযা

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একবার আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলাম। তিনি তখন সাহাবীগণের মধ্যে বসে আলাপ-আলোচনা করছিলেন।

তাঁর পেটে কাপড় বাঁধা ছিল। আমি সাহাবীগণের কাছে প্রশ্ন রাখলাম ঃ হুযূর (সাঃ)-এর পেটে কাপড় বাঁধা কেন? তারা বললেন ঃ ক্ষুধার তীব্রতার কারণে। আমি আমার পিতা আবূ তালহার কাছে যেয়ে একথা বললে তিনি আমার জননীর কাছে গেলেন এবং খাবার কিছু আছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। মা বললেন ঃ হ্যাঁ, রুটির টুকরা এবং খেজুর আছে। যদি তিনি আমাদের এখানে একা আসেন, তবে তাঁর পেট ভরে যাবে। আর যদি কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসেন, তবে খাদ্য কম হয়ে যাবে। অতঃপর পিতা আমাকে বললেন ঃ আনাস, তুমি যেয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে দাঁড়িয়ে থাক। যখন সকল সাহাবী চলে যান এবং হুযূর (সাঃ) আপন গৃহের পর্দার কাছে পৌছেন, তখন বলবে যে, আমার পিতামাতা আপনাকে যেতে বলেছেন। অতঃপর আমি পিতার কথামত কাজ করলাম। যখন আমি বললাম যে, আমার পিতামাতা আপনাকে যেতে বলেছেন, তখন হুযূর (সাঃ) সকল সাহাবীকে ফেরত ডেকে নিলেন এবং আমার হাত শক্ত করে ধরে রাখলেন। গৃহের সন্নিকটে পৌছার পর তিনি আমার হাত ছেড়ে দিলেন। আমি যখন গৃহে প্রবেশ করলাম, তখন সাহাবীগণের আধিক্যের কারণে আমি নিজেও চিন্তান্বিত ছিলাম। আমি পিতাকে বললাম ঃ আব্বাজান, আমি আপনার নির্দেশ অনুযায়ীই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কথাটি বলেছিলাম। কিন্তু তিনি সকল সাহাবীকে ডেকে নিয়ে এখানে এসেছেন। একথা শুনে আবূ তালহা বাইরে এলেন এবং হুযূর (সাঃ)-কে বললেন ঃ আমি আনাসকে একা আসার জন্যে আপনার কাছে খবর পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু এখন যে পরিমাণ লোক আপনার সঙ্গে আছে, সেই পরিমাণ খাবার আমার কাছে নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি ঘরে যাও। যে খাবার তোমার কাছে আছে, তাতেই আল্লাহ বরকত দিবেন। আবূ তালহা ঘরে যেয়ে বললেন ঃ তোমাদের কাছে যা কিছু আছে, তাই একত্রিত করে নিয়ে এস। সেমতে আমরা সব খাবার জমা করে হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে নিয়ে গেলাম। তিনি তাতে বরকতের দোয়া করে বললেন ঃ প্রথমে আট ব্যক্তি চলে আস। সে মতে আটজন সাহাবী চলে এলেন। হুযূর (সাঃ) পবিত্র হাত খাবারের উপর রেখে দিলেন এবং বললেন ঃ বিসমিল্লাহ বলে শুরু কর। সাহাবীগণ তাঁর অঙ্গুলিসমূহের মাঝখান থেকে খাওয়া শরু করলেন এবং খেয়ে সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয়ে গেলেন। এরপর হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আরও আটজন এস। এমনি ভাবে আট আটজন করে মোট আশিজন এসে সম্পূর্ণ পেট ভরে আহার করলেন। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে সহ আমার পিতামাতাকে ডেকে আনলেন এবং বললেন ঃ খাও। আমরাও পেটভরে খেলাম। অতঃপর তিনি খাবারের উপর থেকে আপন হাত তুলে নিয়ে বললেন ঃ উম্মে সুলায়ম, তোমার পেশকৃত খাবার এখানে কোথায়

আছে? উম্মে সুলায়ম আরয করলেন ঃ আমাদের পিতামাতা আপনার জন্যে উৎসর্গ, আমি যদি এই সবগুলো মানুষকে খেতে না দেখতাম, তবে এটাই বলতাম যে, আমার খাবার মোটেই কমেনি।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ)-কে বিয়ে করলেন, তখন আমার মা আমাকে বললেন ঃ আনাস, রসূলুল্লাহ (সাঃ) গতরাতে বিয়ে করেছেন। আমার মনে হয় তাঁর গৃহে খাবার নেই। তুমি ঘরে যে ঘি ও খেজুর আছে, সেগুলো নিয়ে এস। এই খেজুরগুলোর স্বাদ পর্যন্ত বদলে গিয়েছিল। মোটকথা, আমার মা রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে "হালীম" রান্না করলেন। তিনি আমাকে এই হালীম হুযূর (সাঃ) ও তাঁর পত্নীর কাছে নিয়ে যেতে বললেন। সেমতে পাথরের একটি খাঞ্চায় আমি সেই হালীম নিয়ে গেলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এটা গৃহের এক কোণে রেখে দাও এবং যেয়ে আবু বকর, ওমর, ওছমান, আলী ও অন্যান্য সাহাবীকে ডেকে আন। মসজিদে যারা আছে এবং পথিমধ্যে যাদেরকে পাও, তাদের সবাইকে ডেকে আন। স্বল্প খাবার এবং মেহমানদের প্রাচুর্যের কথা ভেবে আমি বিস্মিত হলাম। যা হোক, আমি ডেকে আনলাম। এত মেহমান হয়ে গেল যে, কক্ষ ও গৃহ জমজমাট হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আনাস, সেই হালীম নিয়ে আস। আমি খাঞ্চা নিয়ে এলাম। হুযূর (সাঃ) তাতে তিনটি অঙ্গুলি রাখলেন। হালীম বেড়ে স্ফীত হতে লাগল এবং মেহমানগণ তা থেকে খেয়ে যাচ্ছিলেন। যখন সকলেরই খাওয়া সমাপ্ত হল, তখন খাঞ্চায় সেই পরিমাণ রয়ে গেল, যা পূর্বে ছিল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এই হালীম যয়নবের সামনে রেখে দাও। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ এই হালীম ভক্ষণকারী মেহমানগণের সংখ্যা ছিল বাহাত্তর।

ওয়াছেলা ইবনে আসকা' বর্ণনা করেন ঃ আমি সুফফাবাসীদের একজন ছিলাম। সঙ্গীরা আমাকে বলল ঃ তুমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে যেয়ে আমাদের ক্ষুধার কথা বল। সেমতে আমি গেলাম। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আয়েশা, তোমার কাছে খাবার আছে? তিনি বললেন ঃ আমার কাছে কিছু নেই; কেবল কয়েক খণ্ড রুটি আছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ সেটিই নিয়ে এস। অতঃপর তিনি একটি খাঞ্চায় সেগুলো নিলেন এবং পবিত্র হাতে "ছরীদ" তৈরী করলেন। ছরীদ বাড়তে বাড়তে খাঞ্চা ভরে গেল। অতঃপর আমাকে বললেন ঃ তুমি যাও এবং দশজন সঙ্গীকে ডেকে আন। তারা এলে হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ কিনারা থেকে খাও, উপর থেকে খেয়ো না। কেননা, বরকত উপর থেকে আসে। সকলেই তৃপ্তি সহকারে খেয়ে চলে গেল। ছরীদ যতটুকু ছিল, ততটুকুই রয়ে গেল। অতঃপর তিনি নিজের হাত লাগিয়ে পাত্রে ছরীদ ঠিকঠাক করলেন। খাবার পুনরায় বেড়ে

গেল এবং খাঞ্চা সম্পূর্ণ ভরে গেল। তিনি বললেন ঃ আরও দশজনকে ডেকে আন। মোটকথা, আরও দশজন এল এবং তারাও পেট ভরে খেয়ে নিল। অতঃপর হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আরও লোক আছে? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, আরও দশজন বাকী আছে। তিনি বললেন ঃ তাদেরকে নিয়ে এস। অতঃপর তারাও এল এবং খেয়ে তৃপ্ত হয়ে গেল। খাঞ্চায় যে পরিমাণ ছিল, সেই পরিমাণই বাকী রয়ে গেল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এটা আয়েশার কাছে নিয়ে যাও।

হযরত সফিয়্যা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একদিন নবী করীম (সাঃ) আমার কাছে এসে বললেন ঃ আমার ক্ষুধা লেগেছে। তোমার কাছে কিছু খাবার আছে কি? আমি বললাম ঃ কেবল দু'মুঠ আটা আছে। তিনি বললেন ঃ একে ভাজা করে নাও। আমি আটা পাতিলে ঢেলে রান্না করলাম। তেলের পাত্রে সামান্য ঘি ছিল। হুযূর (সাঃ) সেটি পাতিলে উপুড় করে দিলেন এবং আপন হাত তার উপরে রেখে দিলেন। অতঃপর বললেন ঃ বিসমিল্লাহ্, তোমার বোনদেরকে ডাক দাও। কারণ, আমি জানি—আমি যেমন ভুখা, তারাও তেমনি ভুখা হবে। আমি তাদেরকে ডাক দিলাম এবং সকলে মিলে তৃপ্ত হয়ে আহার করলাম। এরপর হযরত আবূ বকর, ওমর ও আরও কয়েকজন এলেন এবং তাঁরাও তৃপ্ত হয়ে খেলেন। এরপরও খাবার বেঁচে গেল।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে জনৈক বেদুঈন মেহমান আসল। তার খাওয়ার জন্যে কেবল রুটির একটা শুকনা টুকরা ছিল। হুযূর (সাঃ) সেটাই নিয়ে চূর্ণ করে আপন পবিত্র হাতে রাখলেন এবং মেহমানকে ডেকে বললেন ঃ খাও। বেদুঈন তৃপ্ত হয়ে গেল। এরপরও খাবার রয়ে গেল। বেদুঈন বলল ঃ আপনি নিশ্চিতই মহান ব্যক্তি।

আবূ আইউব আনসারী বর্ণনা করেন ঃ একবার আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও হযরত আবূ বকরের জন্যে খাদ্য প্রস্তুত করলাম। এই খাদ্য তাদের দু'জনের জন্যেই যথেষ্ট হত। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ যাও, সম্ভ্রান্ত আনসারগণের মধ্য থেকে ত্রিশজনকে ডেকে আন। আমার কাছে কিছু নেই, অথচ ত্রিশজনকে ডেকে আনতে হবে—এ বিষয়টি আমাকে ভাবিয়ে তুলল। তাই আমি আদেশ পালনে গড়িমসি করলাম। কিন্তু তিনি আবার বললেন ঃ যাও, ত্রিশ ব্যক্তিকে ডেকে আন। মোটকথা, তারা এল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তাদেরকে খাওয়াও। অতঃপর সকলেই তৃপ্ত হয়ে খেল এবং সাক্ষ্য দিল, আপনি আল্লাহর রসূল। বিদায় হওয়ার পূর্বে তারা তাঁর হাতে বয়আত হল। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এখন ষাটজনকে ডেকে আন। তারাও এল। এমনিভাবে একশ' আশি জন লোক এই খাদ্য ভক্ষণ করল।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, আমরা একশ' ত্রিশ ব্যক্তি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে ছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কারও কাছে খাবার আছে কি? জানা গেল একজনের কাছে এক ছা' গম আছে। সেই গমই পিষে নেয়া হল। এক ব্যক্তি একটি ছাগল এনেছিল। হুযূর (সাঃ) তার কাছ থেকে ছাগলটি ক্রয় করে যবেহ করলেন। ছাগলের গোশ্ত রান্না করা হল এবং কলিজা আলাদা ভাজা করা হল। এরপর হুযূর (সাঃ) প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তিকে কলিজার একটি টুকরা দিলেন এবং অনুপস্থিত ব্যক্তিদের জন্যে এক টুকরা করে আলাদা রেখে দিলেন। ছাগলের গোশত দিয়ে দু'টি পিয়ালা ভর্তি হল। এরপর সকলেই তৃপ্ত হয়ে গোশত খেল এবং উভয় পিয়ালায় গোশ্ত বেঁচে রইল। সেগুলো উটের পিঠে রেখে দেয়া হল।

ইমাম বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) আল্লাহর কসম খেয়ে বলেন ঃ আমার ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। আমি ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বাঁধতাম। একদিন আমি ক্ষুধাকাতর অবস্থায় রাস্তায় বসেছিলাম। আমার কাছ দিয়ে হযরত আবূ বকর (রাঃ) গমন করলেন। আমি তাঁকে কোরআন পাকের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। উদ্দেশ্য ছিল তিনি আমার অবস্থা বুঝে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি আমাকে সঙ্গে নিলেন না। এরপর হযরত ওমর (রাঃ) গমন করলেন। আমি একই উদ্দেশ্যে তাঁকেও আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। কিন্তু তিনিও আমাকে সঙ্গে নিলেন না। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) সে পথে আগমন করলেন। তিনি আমাকে দেখে মুচকি হাসলেন এবং আমার মনের কথা আঁচ করে নিলেন। তিনি বললেন ঃ আমার সঙ্গে চল। আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। তিনি যখন গৃহে প্রবেশ করলেন, তখন আমিও গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন। আমি সেখানে দেখলাম এক পিয়ালা দুধ রাখা আছে। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ দুধ কোথা থেকে এল? গৃহের লোকেরা বলল ঃ অমুক ব্যক্তি আপনার জন্যে হাদিয়া প্রেরণ করেছে। তিনি বললেন ঃ আবূ হুরায়রা! আমি আরয করলাম ঃ লাব্বায়কা ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ তুমি সুফফাবাসীদের কাছে যাও এবং তাদেরকে ডেকে আন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ সুফফাবাসীরা ইসলামের মেহমান ছিলেন। তাদের কোন বাসস্থান ও ধন-সম্পদ ছিল না। রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে কোন সদকা এলে তিনি সুফফাবাসীদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন এবং নিজে কিছুই গ্রহণ করতেন না। আর যখন তাঁর কাছে কোন হাদিয়া আসত, তখন নিজেও গ্রহণ করতেন এবং সুফফাবাসীদেরকেও তাতে শরীক করতেন। মোটকথা, তাদেরকে ডেকে আনার আদেশ শুনে আমি মনে মনে

কিছুটা ক্ষুণ্ন হলাম। আমি মনে মনে ভাবলাম, এত লোকের মধ্যে এই যৎসামান্য দুধে কি হবে? আমার আশা ছিল যে, ক্ষুৎ-পিপাসা নিবৃত্ত করার পরিমাণে দুধ আমি পেয়ে গেলে ভাল হত। এখন তো সুফফাবাসীরা এলে হুযূর আমাকেই দুধ বন্টন করতে বলবেন। এমতাবস্থায় এই দুধ থেকে আমি কি আর পাব। মোটকথা, আদেশ পালন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আমি সুফফাবাসীদেরকে ডেকে আনলাম। তারা এসে বসে গেলেন। হুযূর (সাঃ)বললেন ঃ আবূ হুরায়রা! আমি বললাম ঃ লাব্বায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ দুধ নাও এবং তাদেরকে দাও। আমি দুধের পিয়ালা হাতে নিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির হাতে তুলে দিতাম। সে তৃপ্ত হয়ে পান করে ফিরিয়ে দিলে অন্যের হাতে দিতাম। সে-ও পেট ভরে পান করত। অবশেষে আমি পিয়ালা নিয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলাম। তিনি আমার কাছ থেকে পিয়ালা নিয়ে আপন হাতে রাখলেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। অতঃপর বললেন ঃ আবূ হুরায়রা! আমি বললাম ঃ লাব্বায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ আমি আর তুমি বাকী রয়ে গেছি। আমি আরয করলাম ঃ হুযূর, ঠিক বলেছেন। তিনি বললেন ঃ বসে যাও এবং দুধ পান করে নাও। আমি পান করলাম। তিনি বললেন ঃ আরও পান কর। তিনি পরপর আমাকে বললেন ঃ আরও পান কর। আমিও পান করতে লাগলাম। অবশেষে বললাম ঃ আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, এখন পেটে আর জায়গা নেই। একথা বলে আমি পিয়ালা তাঁর হাতে দিয়ে দিলাম। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তাঁর নাম উচ্চারণ করে অবশিষ্ট দুধ পান করে খতম করে দিলেন।

হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ এক রাতে আমরা কিছু না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে জাগ্রত হয়ে আমি কিছু খাবার সংগ্রহে ব্যাপৃত হলাম। সেমতে এক দেরহাম দিয়ে আটা ও গোশত ক্রয় করে ফাতেমার কাছে নিয়ে এলাম। ফাতেমা সেগুলো রান্না সমাপ্ত করে আমাকে বলল ঃ আপনি যদি আব্বাজানকেও ডেকে আনতেন! আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলাম। তিনি তখন শায়িত ছিলেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষুধা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছিলেন। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের ঘরে খাবার তৈরী হয়েছে আপনি চলুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন আগমন করলেন, তখন উনুনে পাতিল টগবগ করছিল। তিনি বললেন ঃ আয়েশার জন্যে বের করে নাও। ফাতেমা একটি রেকাবীতে তাঁর জন্যে কিছু খাবার বের করে নিলেন। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ হাফসার জন্যে বের করে নাও। ফাতেমা তাও করলেন। এভাবে এক এক করে তিনি হুযূর (সাঃ)-এর নয় পত্নীর জন্যে খাবার বের করলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ এখন তুমি তোমার পিতা ও স্বামীর জন্যে বের কর এবং

নিজের জন্যে বের করে খাও। ফাতেমা (রাঃ) বলেন ঃ সকলের খাবার বের করে আমি যখন পাতিল তুললাম, তখন তা উপর পর্যন্ত ভর্তি ছিল। আমরা খুব তৃপ্ত হয়ে আহার করলাম।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ এক রাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বাইরে এসে আমাকে বললেন ঃ সুফফাবাসীদেরকে ডেকে আন। আমি ডেকে আনলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি খাঞ্চা রাখলেন, যার মধ্যে সম্ভবত এক মুদের কাছাকাছি যবের খাদ্য ছিল। তিনি নিজের পবিত্র হাত খাদ্যের উপর রেখে বললেন ঃ নাও বিসমিল্লাহ। আমরা সত্তর-আশি জন ছিলাম। সকলেই পেট ভরে আহার করলাম। খাওয়ার পরেও খাদ্য পূর্ববৎ ছিল। কেবল তার উপর অঙ্গুলির চিহ্ন ছিল।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন ঃ আমার জননী খাবার রান্না করে আমাকে বললেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে যেয়ে তাঁকে ডেকে আন। আমি যেয়ে চুপি চুপি তাঁকে বললে তিনি সকল সাহাবীকে বললেন ঃ চল। সাহাবীগণের সংখ্যা পঞ্চাশের কাছাকাছি ছিল। তিনি বললেন ঃ দশ জন করে এসে খেয়ে যাবে। সকলেই তৃপ্ত হয়ে খাবার খেলেন। কিন্তু খাদ্য পূর্বে যা ছিল, তাই বেঁচে রইল।

হযরত সোহায়ব (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে খাবার রান্না করিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি সাহাবীগণের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আমার দিকে তাকালে আমি ইশারার মাধ্যমে তাঁকে চলতে বললাম। তিনি বললেন ঃ এরাও তো আছে। আমি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে রইলাম। এরপর যখন তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তখন আমি আবার ইশারা করলাম। তিনি বললেন ঃ এরাও তো আছে। আমি আবার ইশারা করলাম। তিনি বললেন ঃ এরাও তো আছে। আমি বললাম ঃ ঠিক আছে তারাও চলুন। আমি কেবল আপনার জন্যে সামান্য রান্না করিয়েছিলাম। মোটকথা, সকলেই এলেন এবং খেয়ে তৃপ্ত হয়ে গেলেন। খাবার বেঁচেও গেল।

হযরত জাবের (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) কয়েকদিন পর্যন্ত উপবাস থেকে অবশেষে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর গৃহে যেয়ে বললেন ঃ ফাতেমা, তোমার কাছে খাওয়ার কিছু আছে? তিনি বললেন ঃ কিছুই নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তাঁর কাছ থেকে চলে গেলেন, তখন এক প্রতিবেশিনী দু'টি চাপাতি রুটি ও এক টুকরা গোশত প্রেরণ করল। হযরত ফাতেমা (রাঃ) এগুলো একটি পিয়ালায় রেখে দিলেন এবং ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলেন। এরপর রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে কাউকে পাঠিয়ে দিলেন। হুযূর (সাঃ) তাঁর কাছে এলেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ) পিয়ালা এনে তাঁর কাছে রেখে ঢাকনা খুলতেই দেখা গেল পিয়ালা রুটি ও গোশতে পরিপূর্ণ। তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। ভাবলেন, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ফাতেমা, এ খাদ্য তোমার কাছে কোথেকে এল? তিনি বললেন ঃ

هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বে-হিসাব রিযিক দান করেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ প্রিয় বৎস, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সাইয়েদাতুন্নেসার অনুরূপ করে সৃষ্টি করেছেন। তাঁকেও যখন কেউ জিজ্ঞাসা করত, এটা কোথেকে এল? তখন তিনি এ জওয়াবই দিতেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে ডাকলেন এবং পবিত্রা পত্নীগণ, আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন (রাঃ) সকলে মিলে তৃপ্ত হয়ে আহার করলেন। পিয়ালা পূর্বাবস্থায় খাদ্যে পরিপূর্ণ রয়ে গেল। ফলে, প্রতিবেশীদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হল।

আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইবনে সাকান রেওয়ায়েত করেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আমাদের মসজিদে মাগরিবের নামায পড়তে দেখে গৃহে গেলাম এবং কিছু রুটি ও ব্যঞ্জন নিয়ে এলাম। আমি আরয করলাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্যে উৎসর্গ, আপনি রাতের খানা এখানেই গ্রহণ করুন। তিনি সাহাবীগণকে বললেন ঃ বিস্‌মিল্লাহ বলে খাও। অতঃপর তিনি, সাহাবীগণ এবং পরিবারের লোকগণ সেই খাবার খেলেন। আল্লাহর কসম, খাবার এতটুকুও কমতি হয়নি। তখন চলিশজন উপস্থিত ছিলেন। এরপর হুযূর (সাঃ) মশক থেকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করলেন এবং প্রস্থান করলেন। আমি মশকটি সংরক্ষিত করে রাখলাম। অতঃপর এই মশক থেকে আমরা রোগীদেরকে পানি পান করাতে লাগলাম।

মাসউদ ইবনে খালেদ বর্ণনা করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে একটি ছাগল প্রেরণ করলাম এবং আপন কাজে চলে গেলাম। তিনি এই ছাগলের গোশতের একটি অংশ আমাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন। গোশত দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ উম্মে খেনাস, এই গোশ্‌ত কোথেকে এল? সে বলল ঃ তুমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে যে ছাগল পাঠিয়েছিলে, তিনি তার গোশ্‌ত পাঠিয়েছেন। আমি বললাম ঃ তুমি বাচ্চাদেরকে গোশ্‌ত খেতে দাওনি? সে বলল ঃ তাদেরকে দেয়ার পর এটুকু অবশিষ্ট আছে। অথচ আমার পরিবারের লোকদের জন্যে দু'তিন ছাগল যবেহ করলেও যথেষ্ট হত না।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একরাতে নবী করীম (সাঃ) আমাকে ডেকে বললেন ঃ গৃহে যেয়ে বল, যে খাবার উপস্থিত আছে, তা যেন দিয়ে দেয়। আমি গেলে গৃহের লোকজন আমাকে এক রেকাবী "আসীদা" (ক্ষীর জাতীয় খাদ্য) ও কিছু খেজুর দিল। আমি সেগুলো নিয়ে এলে হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ মসজিদে যারা আছে, তাদেরকে ডেকে আন। আমি মনে মনে বললাম ঃ খাবার তো খুব কম। মসজিদের লোকজন এলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আসীদার উপর অঙ্গুলি স্থাপন করলেন এবং কিনারে চাপ দিলেন। অতঃপর লোকজনকে বললেন ঃ বিসমিল্লাহ্ বলে খাওয়া শুরু কর। সকলেই তৃপ্ত হয়ে খেল। অতঃপর আমিও খেলাম। যখন রেকাবী উঠালাম, তখন তাতে আসীদা তেমনি ছিল, যেমন আমি রেখেছিলাম। তবে উপরিভাগে অঙ্গুলির চিহ্ন ছিল।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ একদিন আমি মসজিদে গেলাম। আমার পেটে দারুণ ক্ষুধা ছিল। মসজিদে একদল লোককে দেখলাম। তারাও বলতে লাগল ঃ তীব্র ক্ষুধা আমাদেরকে বাড়ী থেকে বের করে এনেছে। অতঃপর আমরা সকলেই রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলাম। ক্ষুধার কথা তাকে বললে তিনি একটি খাঞ্চা আনালেন— যার মধ্যে খোরমা ছিল। তিনি প্রত্যেককে দু'টি করে খোরমা দিতে দিতে বললেন ঃ এগুলো দিয়ে তোমাদের আজকার দিন চলে যাবে।

আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একদিন হযরত আবূ বকর তিনজন মেহমান নিয়ে বাড়ীতে এলেন। অতঃপর নিজে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে চলে গেলেন এবং রাতের খানা সেখানেই খেলেন। বেশ বিলম্বে ফিরে এলে তাঁর পত্নী বললেন ঃ আপনি বাড়ীতে মেহমানদেরকে রেখে চলে গেলেন কেন? হযরত আবূ বকর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি মেহমানদেরকে খাবার দাওনি? তিনি বললেন ঃ মেহমানরা খেতে অস্বীকার করেছে এবং বলেছে, আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত খাবে না। আবূবকর (রাঃ) বললেন ঃ আমি তো খানা খাব না। মোটকথা, মেহমানরা খাওয়া শুরু করল। তারা যে লোকমাই মুখে দিত, তাই বেড়ে যেত। অবশেষে খাওয়া সমাপ্ত হলে দেখা গেল যে, খাবার পূর্বের চাইতেও বেশী রয়ে গেছে। পত্নী বললেন ঃ এই খাবার পূর্বাপেক্ষা তিনগুণ বেড়ে গেছে। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রাঃ) সেই খাবার নিজেও খেলেন এবং রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ ইসলাম গ্রহণের পর আমার উপর তিনটি মুসীবত নাযিল হয়েছে। এক, রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাত, দুই, হযরত ওছমান (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ড এবং তিন, আমার খাদ্য থলেটি বিনষ্ট হয়ে যাওয়া। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল ঃ খাদ্য-থলের ঘটনা আবার কি? তিনি বললেন ঃ আমরা

নবী করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। হুযূর (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে কিছু খাবার আছে কি? আমি আরয করলাম ঃ খাদ্য থলের মধ্যে কিন্তু খেজুর আছে। তিনি বললেন ঃ নিয়ে এস। আমি খেজুরগুলো বের করে তাঁর কাছে আনলে তিনি সেগুলো স্পর্শ করলেন এবং দোয়া করলেন। অতঃপর বললেন ঃ দশজন করে ডাক। সেমতে দশজন করে সফরসঙ্গী আসতে লাগল এবং তৃপ্ত হয়ে খেয়ে যেতে লাগল। এভাবে সমগ্র লশকরের আহার সমাপ্ত হল। কিন্তু থলের মধ্যে খাবার এরপরও অবশিষ্ট ছিল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আবূ হুরায়রা, তোমার যখনই মনে চায় থলের ভেতর থেকে খেজুর বের করে নিয়ো। কিন্তু থলেটি কখনও উপুড় করবে না। আমি নবী করীম (সাঃ), হযরত আবূ বকর ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর শাসনামল পর্যন্ত এই থলে থেকে খেজুর বের করে খেয়েছি। কিন্তু হযরত ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদতের সময় আমার গৃহের আসবাবপত্র লুট হয়ে যায়। এতেই আমার খাদ্য-থলেটিও বেহাত হয়ে যায়। আমি এই থলে থেকে দু'শ ওয়াসাকেরও বেশী খোরমা খেয়েছিলাম।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাত হয়ে গেলে গৃহে যৎসামান্য যব ছাড়া কিছুই ছিল না। আমি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সেই যব খেতে থাকি। কিন্তু যখন যব ওজন করলাম, তখন তা খতম হয়ে গেল।

হযরত জাবের (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে গম প্রার্থনা করলে তিনি তাকে অর্ধ ওয়াসাক গম দিলেন। লোকটির গৃহে যত মেহমান আসত, সে এই গম থেকে তাদেরকে খাওয়াত। এক দিন সে যখন গম পরিমাপ করল, তখন গম খতম হয়ে গেল। সে এসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একথা বললে তিনি এরশাদ করলেন ঃ যদি তুমি পরিমাপ না করতে, তবে যতদিন ইচ্ছা খেতে পারতে।

আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রেওয়ায়েত করেন, আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে বসা ছিলাম। এক বালক তাঁর কাছে এসে বলল ঃ আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ, আমি একজন এতীম। আমার একটি বোন আছে। আমার মা নিঃস্ব। আপনি আমাদেরকে খাবার দিন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে খাওয়াবেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ বাড়ী চলে যাও এবং যা পাও নিয়ে আমার কাছে এস। সে একুশটি খেজুর নিয়ে এল এবং হুযূর (সাঃ)-এর পবিত্র হাতে রেখে দিল। তিনি আপন হাতে নিজের মুখের দিকে ইশারা করলেন। আমরা দেখলাম তিনি বরকতের দোয়া করছেন। অতঃপর বললেন ঃ হে বালক, সাতটি খেজুর তোমার, সাতটি তোমার মায়ের এবং সাতটি তোমার বোনের। একটি খেজুর রাতে খাবে এবং একটি সকালে।

বুখারী রেওয়ায়েত করেন ঃ জাবের (রাঃ)-এর পিতা ছয় কন্যা ও অনেক ঋণ রেখে শহীদ হয়ে গেলে জাবের রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমার পিতা শাহাদত বরণ করেছেন এবং অনেক ঋণ রেখে গেছেন। আমি চাই যে, ঋণদাতারা আপনাকে দেখুক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি যেয়ে খেজুরগুলোকে এক জায়গায় স্তূপীকৃত কর। আমি তা করে হুযূর (সাঃ)-কে ডেকে আনলাম। তিনি স্তূপের চতুর্দিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন এবং স্তূপের উপর বসে আমাকে বললেন ঃ তুমি মহাজনদেরকে ডেকে আন। অতঃপর তিনি স্বহস্তে খেজুর মেপে দিতে লাগলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলার কৃপায় আমার পিতার ঋণ শোধ হয়ে গেল। আমি এতেই সন্তুষ্ট হতাম যদি আমার পিতার ঋণ শোধ হয়ে যেত এবং আমি একটি খেজুরও বোনদের হাতে না দিতে পারতাম। কিন্তু আল্লাহর কসম, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে স্তূপের উপর উপবিষ্ট ছিলেন, তা তেমনি ছিল, যেন একটি খেজুরও কমেনি।

বুখারী ও মুসলিম ওয়াহাব ইবনে কায়সান থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ জাবেরের পিতা শহীদ হয়ে গেলে তাঁর কাছে জনৈক ইহুদীর ত্রিশ ওয়াসাক খেজুর পাওনা ছিল। জাবের সময় চাইলে ইহুদী সময় দিতে অস্বীকার করল। জাবের রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আরয করলেন ঃ আপনি ইহুদীকে সময় দিতে বলে দিন। হুযূর (সাঃ) ইহুদীকে বললেন ঃ গাছে যে খেজুর আছে, ঋণের বিনিময়ে সেগুলো কবুল করে নাও। কিন্তু ইহুদী রাযী হল না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বাগানে গেলেন এবং ঘুরে-ফিরে খেজুর পর্যবেক্ষণ করলেন। অতঃপর বললেন ঃ জাবের, গাছ থেকে খেজুর নামিয়ে নাও এবং ইহুদীর পাওনা শোধ করে দাও। জাবের (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) চলে যাওয়ার পর আমি খেজুর নামিয়ে ইহুদীর ত্রিশ ওয়াসাক শোধ করে দিলাম। এরপরও সতের ওয়াসাক বেঁচে রইল। জাবের এঘটনাটি হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বলেন ঃ যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) খেজুর বাগানে পায়চারি করছিলেন, তখনই আমি বুঝে নিয়েছিলাম যে, আল্লাহ তা'আলা এই খেজুরে অবশ্যই বরকত দেবেন।

বায়হাকী বলেন ঃ এই হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসের বিপরীত নয়। প্রথম হাদীসটি সেই সমস্ত মহাজন সম্পর্কে, যারা একই সময়ে ঋণের শোধ নিতে এসেছিল এবং দ্বিতীয় হাদীস সেই ইহুদী সম্পর্কে, যে পরে এসেছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেই সব খেজুর নামানোর আদেশ দিয়েছিলেন, যেগুলো বৃক্ষে অবশিষ্ট ছিল।

আবূ রাজা বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) গৃহ থেকে বের হয়ে জনৈক আনসারীর বাগানে গেলেন। আনসারী বাগানে সেচকার্যে রত ছিল। হুযূর (সাঃ)

বললেন ঃ যদি আমি তোমার বাগান সিক্ত করে দেই, তবে আমাকে কি দেবে? আনসারী বলল ঃ আমি চেষ্টা ও শ্রম সহকারে নিজেই সিক্ত করে নেব। আপনাকে দিয়ে সিক্ত করা সমীচীন হবে না। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ না, তুমি আমাকে একশ' খেজুর দাও। আমি বাগান সিক্ত করে দেব। আনসারী এতে সম্মত হল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজ হাতে বালতি নিয়ে নিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত বাগান পানিতে ভাসিয়ে দিলেন। তিনি এক শ' খেজুর গ্রহণ করলেন এবং সাহাবীগণকে নিয়ে পরম তৃপ্তি সহকারে আহার করলেন। অতঃপর আনসারীকে তার দেয়া একশ' খেজুর ফিরিয়ে দিলেন।

ঘি-এর মশক ও পানির মশকের ঘটনাবলী

উম্মে শরীক বর্ণনা করেন ঃ আমার কাছে ঘি-এর একটি মশক ছিল। এই মশক থেকে আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে ঘি হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করতাম। একদিন ছেলেরা ঘি চাইলে আমি মশক থেকে ঘি প্রবাহিত হতে দেখলাম। আমি মশকটি উপুড় করে তাদেরকে দিয়ে দিলাম। আরও একবার এমনিভাবে উপুড় করে অবশিষ্ট ঘি দিয়ে দিলাম। ফলে ঘি খতম হয়ে গেল। অতঃপর রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে যেয়ে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ যদি তুমি উপুড় করে না ঢালতে, তবে ঘি ফুরিয়ে যেত না।

আনসারী মহিলা উম্মে মালেক বর্ণনা করেন ঃ আমি ঘি-এর একটি মশক নিয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলাম। তিনি বেলালকে ঘি রাখতে বললেন। বেলাল মশকটি নিংড়িয়ে ঘি রাখলেন, অতঃপর মশকটি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। আমি ঘরে ফিরে মশকটি ঘিয়ে পরিপূর্ণ দেখলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এ সংবাদ দিলে তিনি বললেন ঃ এটা সেই বরকত, যার ছওয়াব আল্লাহ্ তোমাকে দ্রুত দান করেছেন।

বাহযিয়া গোত্রের মহিলা উম্মে আওস বলেন ঃ আমি ঘি রান্না করে একটি মশকে ভরে নিলাম এবং রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করলাম। তিনি হাদিয়া কবুল করলেন এবং মশকে সামান্য ঘি রেখে তাতে ফুঁ মেরে বরকতের দোয়া করলেন। অতঃপর তিনি মশকটি ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে সাহাবায়ে কেরামকে আদেশ করলেন। তারা যখন মশকটি ফিরিয়ে দিলেন, তখন সেটি ঘিয়ে ভর্তি ছিল। আমি ভাবলাম ঃ সম্ভবত তিনি আমার ঘি কবুল করেননি। তাই আমি কান্নার সুরে কথা বলতে বলতে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি খাবেন এই আশায় আমি ঘি তৈরী করেছিলাম। আমার কথা শুনেই তিনি বুঝে নিলেন যে, তাঁর দোয়া কবুল হয়েছে এবং মশক ঘিয়ে ভরে গেছে। তিনি বললেন ঃ উম্মে আওসকে বলে দাও, সে যেন

তার ঘি খায় এবং বরকতের দোয়া করে। অতঃপর উম্মে আওস এই ঘি রসূলুল্লাহর (সাঃ) অবশিষ্ট জীবন, হযরত আবূ বকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফত কাল পর্যন্ত খেতে থাকেন।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ তার জননী উম্মে সুলায়ম আপন ছাগলের ঘি একটি মশকে জমা করেন এবং রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি মশকটি খালি করে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। মশকটি একটি খুঁটিতে ঝুলিয়ে রাখা হল। উম্মে সুলায়ম এসে দেখেন যে, মশক ঘি-ভর্তি এবং তা থেকে ঘি টপকে পড়ছে। তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এসে এ সংবাদ দিলেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি আল্লাহর নবীকে খাইয়েছ, আল্লাহ তোমাকে খাইয়েছেন, এতে বিস্মিত হওয়ার কি আছে? তুমি এই ঘি নিজেও খাও, অপরকেও খাওয়াও। উম্মে সুলায়ম বলেন ঃ আমি গৃহে এসে একটি পিয়ালায় করে কিছু ঘি বন্টন করলাম এবং কিছু মশকে রেখে দিলাম, যা দ্বারা একমাস পর্যন্ত ব্যঞ্জন রান্না করে খেলাম।

হামযা আসলামী বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের গৃহে পালাক্রমে আহার করতেন। এক রাতে আমার পালা এলে আমি খাবার রান্না করলাম এবং তা নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। ঘটনাক্রমে ঘিয়ের মশক আমার হাত থেকে ফস্‌কে গেল এবং তাতে যে ঘি ছিল, তা পড়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ মশকের কাছে যাও। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার শরম লাগে। সব ঘি আমার হাত থেকে পড়ে গেল। এরপর আমি ঘি পড়ে যাওয়ার আওয়াজ শুনলাম। ভাবলাম, অবশিষ্ট ঘি হয়তো পড়ে যাচ্ছে। আমি মশক টান দিতেই দেখলাম তা কিনারা পর্যন্ত ঘিয়ে ভর্তি। আমি মশকের মুখ বেঁধে নিলাম। অতঃপর হুযূর (সাঃ)-এর কাছে যেয়ে ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি মশকটি না ধরতে, তবে মুখ পর্যন্ত ভরে যেত।

সালেম ইবনে আবুল আবদ রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) দু'ব্যক্তিকে কোন কাজে প্রেরণ করতে চাইলে তারা বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের কাছে পাথেয় নেই। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে একটি মশক নিয়ে এস। তারা মশক নিয়ে এলে তিনি সেটি ভরে নিলেন এবং মুখ বেঁধে বললেন ঃ তোমরা চলে যাও। তোমরা এমন জায়গায় যাবে, যেখানে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে রিযিক দেবেন। সেমতে তারা উভয়েই রওয়ানা হল। গন্তব্য স্থলে পৌঁছার পর তারা মশকের মুখ খুলল। তাতে দুধ ও মাখন ছিল। উভয়েই তৃপ্তি সহকারে মাখন খেল এবং দুধ পান করল।

আবূ নঈম বলেন ঃ এসব মোজেযা প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল রসূলুল্লাহর (সাঃ)

ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মানুষকে জ্ঞাত করা এবং এই উপলব্ধি দেয়া যে, যে ঘটনা স্বভাবগত ভাবে ঘটে না, রসূলুল্লাহর (সাঃ) ফযীলত ও বিশেষত্বের কারণে তাও ঘটে যায়।

আকাশ ও জান্নাত থেকে আগত খাদ্যের কথা

সালামাহ ইবনে নুফায়ল কূফী রেওয়ায়েত করেন ঃ আমরা এক দিন রসূলুল্লাহর (সাঃ) দরবারে উপবিষ্ট ছিলাম। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার কাছে আকাশ থেকেও খাবার এসেছে কি? এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী জান্নাত থেকেও খাবার এসেছে কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ অবশ্যই এসেছে। প্রশ্নকারী বলল ঃ কিসে এসেছে? তিনি বললেন ঃ একটি মিসখানায়। অর্থাৎ পানি গরম করার পাত্রে এসেছে। আবার প্রশ্ন হল, তাতে আপনার খাবার কিছু অবশিষ্ট ছিল কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, অবশিষ্ট ছিল। লোকটি জিজ্ঞাসা করল ঃ সেই অবশিষ্ট খাবার কোথায় গেল? উত্তর হল ঃ আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে। আমাকে ওহী পাঠানো হয় যে, আমি মৃত্যু বরণ করব–তোমাদের মধ্যে অবস্থান করব না। তোমরাও আমার পর বেশী দিন দুনিয়াতে থাকবে না। আমার সম্মুখে আছে কিয়ামত। দু'টি ভয়ংকর মৃত্যুর ঘটনা ঘটবে। এরপর এমন সাল আসবে, যাতে ভূকম্পন অর্থাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হবে।

আবূ সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি মদীনায় পৌঁছে দু'ব্যক্তিকে বলাবলি করতে শুনলাম—আজ রাতে রসূলুল্লাহর (সাঃ) আতিথেয়তা হয়েছে। অতঃপর আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার আতিথেয়তা হয়েছে? তিনি বললেন ঃ নিঃসন্দেহে। আমি বললাম ঃ সেটি কি বস্তু ছিল? তিনি বললেন ঃ পানি গরম করার পাত্রে রাখা এক প্রকার খাদ্য। আমি প্রশ্ন করলাম ঃ সেই খাদ্যের অবশিষ্টাংশ কি হল? তিনি বললেন ঃ তুলে নেয়া হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে বললেন ঃ আপনার রব আপনাকে সালাম করেছেন এবং আঙ্গুরের গুচ্ছসহ আমাকে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন, যাতে আপনি তা ভক্ষণ করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আঙ্গুর গুচ্ছটি নিয়ে নিলেন। এই রেওয়ায়েতের একজন রাবী হাফস ইবনে ওমর দামেশকী সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন ঃ নির্ভরযোগ্য নয়।

উট ও উষ্ট্রীর ঘটনা

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রেওয়ায়েত করেন ঃ বনী সালামাহর এক ব্যক্তির পানি সেচের উট ক্ষিপ্ত হয়ে তার উপর হামলা করে। পানি সেচে বিঘ্ন ঘটায়

খর্জুর-বাগান শুকিয়ে যেতে থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একথা জানানো হলে তিনি একদিন বাগানের গেইট পর্যন্ত এলেন। জনৈক সাহাবী তাঁকে বললেন ঃ হুযূর বাগানে প্রবেশ করবেন না। আমরা এই খেপা উটকে ভয় করি। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা নির্ভয়ে বাগানে প্রবেশ কর। উটটি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখা মাত্রই মাথা নিচু করে তাঁর কাছে চলে এল এবং সামনে দাঁড়িয়ে গেল। অতঃপর তাঁকে সেজদা করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা তোমাদের উটের কাছে চলে এস এবং তাকে লাগাম পরিয়ে দাও।

আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রেওয়ায়েত করেন, আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ অমুক গোত্রের পানিবাহী উট অবাধ্য হয়ে পালিয়ে গেছে। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে আমরাও উঠলাম। আমরা বললাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি এই উটের কাছে যাবেন না। কিন্তু তিনি উটের কাছে চলে গেলেন। উট তাঁকে দেখে সেজদা করল। তিনি তার মাথায় আপন পবিত্র হাত রেখে বললেন ঃ লাগাম আন। লাগাম আনা হলে তিনি তা উটের মাথায় রেখে বললেন ঃ উটের মালিককে ডাক। মালিক এলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে বললেন ঃ একে উত্তমরূপে ঘাস-পানি দিবে এবং কঠোর আচরণ করবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, কিছু লোক নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এসে আরয করল ঃ আমাদের উট বাগান দখল করে নিয়েছে এবং সেখান থেকে কোনরূপেই বের হয় না। হুযূর (সাঃ) সেখানে চলে গেলেন এবং উটকে আওয়ায দিলেন। উট মাথা নত করে চলে এল। তিনি তাকে লাগাম লাগিয়ে মালিকের হাতে দিয়ে দিলেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) আরয করলেন ঃ এই উট জানে যে, আপনি আল্লাহর নবী। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ কাফের জিন ও কাফের মানব ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন বস্তু নেই, যে জানে না যে, আমি আল্লাহর নবী।

হযরত হাসান থেকে বর্ণিত আছে ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় একটি উট দৌড়ে এসে তাঁর কোলে মাথা রেখে দিল এবং বিড়বিড় করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এই উট বলে যে, তার মালিক তাকে পিতার জন্যে ভোজ দেয়ার উদ্দেশ্যে যবেহ করতে চায়। অতঃপর তিনি উটের মালিকের কাছে যেয়ে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল ঃ হ্যাঁ, আমি একে যবেহ করতে চেয়েছিলাম। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ যবেহ করো না। সেমতে মালিক যবেহ্ করল না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন একদল লোকের সঙ্গে আগমন করছিলেন, তখন একটি উট এসে তাঁকে সেজদা করে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) একটি বাগানে প্রবেশ করলে এক উট এসে তাঁকে সেজদা করল।

ছা'লাবা ইবনে মালেক রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ব্যক্তি বনী সালামাহ্র কাছ থেকে একটি পানিবাহী উট ক্রয় করে আপন গোয়াল ঘরে বেঁধে রাখল। সেখানে উটটি খুজলী রোগে আক্রান্ত হল। যে-কেউ তার কাছে যেত, তাকেই পিষ্ট করার জন্যে তেড়ে আসত। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এ অবস্থা জ্ঞাত করা হলে তিনি সেখানে গেলেন এবং বললেন ঃ এর বাঁধন খুলে দাও। সাহাবীগণ বললেন ঃ বাঁধন খুলে দিলে আপনার কোন ক্ষতি না করে বসে। তিনি বললেন ঃ না, খুলে দাও। উট তাঁকে দেখে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। লোকেরা এ দৃশ্য দেখে বলল ঃ সোবহানাল্লাহ! তারা আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! উট আপনাকে সেজদা করতে পারলে আমরা পারব না কেন? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ মানুষের জন্যে অন্য মানুষকে সেজদা করা সম্ভবপর হলে আমি নারীকে বলতাম তার স্বামীকে সেজদা করার জন্যে।

ইয়ালা ইবনে মুররা রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) একদিন বাইরে চলে গেলেন। একটি উট চীৎকার করছিল। সে তাঁকে দেখে সেজদা করল। সাহাবায়ে কেরাম বলতে লাগলেন, আমরাও আপনাকে সেজদা করার অধিকার রাখি। হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ আমি যদি কাউকে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সেজদা করার আদেশ দিতাম, তবে নারীকে আদেশ দিতাম তার স্বামীকে সেজদা করার জন্যে। এই উট কি বলছিল জান? সে বলছিল— আমি আমার মালিকদের চল্লিশ বছর সেবা করেছি। এখন আমি যখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, তখন তারা আমার ঘাসপানি কমিয়ে দিয়েছে এবং কাজ বেশী নিতে শুরু করেছে। এখন বিয়ে উপলক্ষে আমাকে যবেহ করতে চায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) উটের মালিকদের কাছে লোক পাঠালেন এবং তাদেরকে এই ঘটনা বললেন। তারা বলল ঃ উটের অভিযোগ সঠিক। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এখন তোমরা উটটি আমার কাছে ছেড়ে দাও।

বুরায়দা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ জনৈক আনসারী রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের একটি উট গৃহের লোকদের উপর হামলা করে। কেউ তার কাছে যাওয়ার সাহস করে না এবং কেউ তাকে নাকরশিও লাগাতে পারে না। একথা শুনে হুযূর (সাঃ) আনসারীর সাথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমরাও তাঁর সাথে চললাম। তিনি উটের গৃহে গেলেন। দরজা খোলার পর উট তাঁকে দেখে সেজদা করল এবং ঘাড় মাটিতে রেখে দিল। হুযূর (সাঃ) তার মাথা ধরলেন এবং তাতে পবিত্র হাত বুলালেন। এরপর লাগাম আনিয়ে পরিয়ে দিলেন এবং উট মালিকের হাতে সমর্পণ করলেন। হযরত আবূ

বকর ও ওমর (রাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহর নবী। এই উট চিনতে পেরেছে যে, আপনি আল্লাহর নবী। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ কাফের জিন ও কাফের মানুষ ছাড়া প্রত্যেক বস্তু চিনে যে, আমি আল্লাহর নবী।

হযরত জাবের (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে এক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করি। আমার সওয়ারীর উট ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে সে চলতে পারছিল না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার নিকটে এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার উটের কি হল? আমি বললাম ঃ অসুস্থ। হুযূর (সাঃ) তাকে শাসালেন এবং দোয়া করলেন। তাঁর দোয়ার বরকতে আমার উট সকলের অগ্রে চলে গেল। হুযূর (সাঃ) আবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার উট কেমন? আমি জওয়াব দিলাম ঃ আপনার দোয়ার বরকতে ঠিক আছে।

হাকাম ইবনে আইউব বর্ণনা করেন ঃ এক সফরে আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে ছিলাম। আমার উটনী থেমে গেল। সম্মুখে অগ্রসর হল না। হুযূর (সাঃ) উটনীটিকে শাসালে সে সকলের অগ্রে চলতে লাগল।

আবদুল মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি হারেছ ইবনে সওয়াদের পুত্রদেরকে বললাম ঃ তোমাদের পিতা সেই ব্যক্তি না, যে রসূলুল্লাহর (সাঃ) হাতে বয়আত হতে অস্বীকার করেছিল? হারেছের পুত্ররা বলল ঃ ব্যাপার এটা নয়; বরং রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের পিতাকে একটি কমবয়েসী শক্তিশালী উট দিয়ে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এই উটের মধ্যে বরকত দিবেন। সেমতে এখন আমাদের সকল উট সেই উটেরই বংশোদ্ভূত।

আবূ কুরসাফা রেওয়ায়েত করেন ঃ আমার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ছিল এরূপঃ আমি পিতৃহীন অবস্থায় আমার মা ও খালার কাছে থাকতাম এবং তাদের ছাগল চরাতাম। আমার খালা প্রায়ই আমাকে বলতেন, সেই ব্যক্তির (রসূলুল্লাহ (সাঃ))-এর কাছে কখনও যাবে না। সে তোকে অপহরণ করবে কিংবা পথভ্রষ্ট করে দেবে। আমি ছাগল নিয়ে বের হতাম এবং মাঠে ছেড়ে দিয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে চলে যেতাম। তাঁর কথাবার্তা শুনতাম। অতঃপর সন্ধ্যায় আমি যখন ছাগলগুলো গৃহে নিয়ে যেতাম, তখন তাদের পেট পিঠের সাথে লেগে থাকত। স্তনও শুষ্ক থাকত। খালা বলতেন ঃ তোর ছাগলের এই দুর্দশা কেন? আমি দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনও রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলাম এবং মুসলমান হয়ে গেলাম। আমি তাঁর কাছে আমার খালা ও ছাগলদের কথা বললাম। তিনি বললেন ঃ ছাগলগুলো আমার কাছে নিয়ে এস। আমি নিয়ে এলে তিনি তাদের স্তনে ও পিঠে হাত বুলালেন এবং বরকতের দোয়া করলেন। ছাগলগুলো চর্বিযুক্ত হয়ে গেল এবং দুধ বেড়ে গেল। ছাগলগুলো গৃহে নিয়ে গেলে খালা বললেন ঃ হ্যাঁ, এভাবে

ছাগল চরাবে। আমি সমস্ত ঘটনা খুলে বললে আমার খালা ও মা মুসলমান হয়ে গেলেন।

মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি এবং আমার বন্ধু সম্পূর্ণ অভুক্ত ও নিঃস্ব অবস্থায় রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে উপস্থিত হই। তিনি আমাদেরকে আপন গৃহে রেখে দিলেন। তাঁর কাছে তিনটি ভেড়া ছিল। তিনি এগুলোর দুধ নিজের এবং আমাদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। দুধ দোহন করে আমরা তাঁর অংশ তাঁর কাছে পৌঁছিয়ে দিতাম। তিনি এসে এমন ভাবে সালাম করতেন যে, যারা জাগ্রত থাকত, তারা শুনত; কিন্তু নিদ্রিতদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটত না। একদিন শয়তান আমাকে বলল ঃ তুমি এই এক চুমুক দুধ পান করে নিলে কোন ক্ষতি হবে না। কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তো আনসারদের কাছ থেকে আসবেন। তারা তাঁকে অনেক উপহার সামগ্রী দেন। শয়তান আমাকে এ প্ররোচনাই দিতে থাকে। অবশেষে আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে রাখা দুধ পান করে নিলাম। পরে এজন্যে আমার খুব অনুতাপ হল। আমি মনে মনে বললাম ঃ সর্বনাশ হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন আসবেন, তখন তাঁর জন্যে দুধ নেই। কোথাও তিনি আমাকে বদদোয়া না দেন। তাঁর বদদোয়া আমাকে ধ্বংস করে দেবে। মোটকথা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এলেন, নামায পড়লেন, এরপর যখন দুধের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তখন সেখানে কিছুই ছিল না। তিনি উভয় হাত উত্তোলন করলেন। আমার ভয় হল কোথাও আমাকে বদদোয়া না দেন। কিন্তু তিনি এই দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ, যে আমাকে খাওয়ায়, তুমি তাকে খাওয়াও এবং যে আমাকে পান করায়, তুমি তাকে পান করাও। আমি ছোরা নিয়ে ছাগপালের মধ্যে গেলাম এবং কোন্ ছাগলটি অধিক মোটাতাজা, তা দেখতে লাগলাম। উদ্দেশ্য, যেটি অধিক মোটাতাজা, সেটি রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে যবেহ্ করব। কিন্তু আমি দেখলাম, সকল ছাগলের স্তন দুধে পরিপূর্ণ। আমি দুধ দোহনের পাত্র নিয়ে তাতে দুধ দোহন করতে শুরু করলাম। অবশেষে অধিক দুধের কারণে পাত্রের উপরিভাগে ফেনা উঠে গেল।

একটি হরিণীর ঘটনা

উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একবার রসূলে করীম (সাঃ) মরু এলাকায় চলে যান। সেখানে তিনি শুনতে পেলেন কে যেন বলছে ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি পেছন ফিরে তাকালেন। কিন্তু কেউ নেই। পুনরায় তাকিয়ে একটি হরিণীকে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেলেন। সে বলছিল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এদিকে আসুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার কাছে চলে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ

কি প্রয়োজন? হরিণী বলল ঃ পাহাড়ের পাদদেশে আমার দু'টি শিশু আছে। আপনি আমাকে বন্ধনমুক্ত করে দিন, আমি শিশুদ্বয়কে দুধ পান করিয়ে আসি। হুযূর (সাঃ) শুধালেন ঃ তুই দুধ পান করিয়ে ফিরে আসবি? সে বলল ঃ হ্যাঁ। যদি ফিরে না আসি, তবে আল্লাহ যেন আমাকে দশ মাসের গর্ভবতী উটনীর অনুরূপ শাস্তি দেন। হুযূর (সাঃ) হরিণীকে ছেড়ে দিলেন। সে যেয়ে উভয় বাচ্চাকে দুধ পান করানোর পর ফিরে এল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বেঁধে দিলেন। জনৈক বেদুঈন কিছু দূরে নিদ্রিত ছিল। সে জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞাসা করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। প্রয়োজন এই যে, তুমি এই হরিণীকে মুক্ত করে দাও। বেদুঈন তৎক্ষণাৎ হরিণীকে ছেড়ে দিল। হরিণী দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছিল আর বলছিল ঃ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্নাকা রসূলুল্লাহ।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক হরিণীর কাছ দিয়ে গেলেন। হরিণীটি তাঁবুতে বাঁধা ছিল। সে বলল ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ, আপনি আমার বাঁধন খুলে দিন, আমি বাচ্চাদেরকে দুধ পান করিয়ে আসি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুই এক দল লোকের বাঁধা শিকার। তাই ফিরে আসার ওয়াদা করতে হবে। হরিণী কসম খেয়ে ওয়াদা করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে ছেড়ে দিলেন। সে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এল। তখন তার স্তন খালি ছিল। তিনি তাকে বেঁধে দিলেন। এরপর দলের লোকজন এলে রসূলাল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এই হরিণীটি আমাকে দিয়ে দাও। তারা দিয়ে দিলে তিনি বাঁধন খুলে হরিণীকে মুক্ত করে দিলেন।

যায়দ ইবনে আরকাম রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি নবী করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে মদীনার গলিপথে যাচ্ছিলাম। জনৈক বেদুঈনের তাঁবুতে পৌঁছে আমরা একটি হরিণীকে বাঁধা দেখলাম। হরিণী বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এই বেদুঈন আমাকে শিকার করেছে। জঙ্গলে আমার দুটো বাচ্চা ক্ষুধায় কষ্ট করছে। আর স্তনে দুধ জমে যাওয়ার কারণে আমিও নিদারুণ যাতনা অনুভব করছি। বেদুঈন আমাকে যবেহ করে ফেললে আমি এই যাতনা থেকে রেহাই পেতাম কিংবা আমাকে ছেড়ে দিলে আমি বাচ্চাদের কাছে চলে যেতাম। কিন্তু সে কিছুই করছে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হরিণীকে জিজ্ঞাস করলেন ঃ যদি আমি তোকে ছেড়ে দেই, তবে তুই ফিরে আসবি? সে বলল ঃ হ্যাঁ, আমি ফিরে আসব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হরিণীকে ছেড়ে দিলেন। সে কিছুক্ষণের মধ্যে জিহ্বা চাটতে চাটতে ফিরে এল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বেঁধে দিলেন। ইতিমধ্যে বেদুঈন এসে গেল। তার সাথে ছিল পানির একটি মশক। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি হরিণীটি বিক্রি করবে?

সে বলল ঃ হরিণীটি আপনারই। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে মুক্ত করে দিলেন।

যায়দ ইবনে আরকাম বলেন ঃ হরিণীটি কালেমায়ে তাইয়েবা উচ্চারণ করতে করতে জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার জনৈক রাখাল যখন তার ছাগল চরাচ্ছিল, তখন কোথা থেকে এক বাঘ বের হয়ে এল। রাখাল তার ছাগল ও বাঘের মাঝখানে অন্তরায় হয়ে গেল। বাঘ তার লেজের উপর বসে গেল এবং রাখালকে বলল ঃ তুই আল্লাহকে ভয় করিস না? তুই আমার এবং রিযিকের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায়েছিস? রাখাল সবিস্ময়ে বলল ঃ বাঘও মানুষের সাথে কথা বলে! বাঘ বলল ঃ এর চাইতেও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হেরেমদ্বয়ের মধ্যস্থলে মানুষকে অতীত যুগের খবরাখবর শুনাচ্ছেন। রাখাল এ কথা শুনে ছাগলগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে এল। অতঃপর মদীনায় পৌঁছে রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে উপস্থিত হল এবং বাঘের কথাবার্তা শুনাল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ সে ঠিকই বলেছে। মনে রেখ, হিংস্র প্রাণীদের মানুষের সাথে কথা বলা কিয়ামতের অন্যতম আলামত। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ-কিয়ামত কায়েম হবে না যে পর্যন্ত হিংস্র প্রাণী মানুষের সাথে কথা না বলে। এমনকি, মানুষের সাথে তার জুতার ফিতা কথা বলবে। মানুষ গৃহ থেকে যাওয়ার পর তার গৃহের লোকজন যে নতুন কাজ করবে, তার ঊরু তাকে সেই খবর দিবে।

আহিয়ান ইবনে আওস রেওয়ায়েত করেন, একবার আমি যখন আমার ছাগলদের মধ্যে ছিলাম, তখন একটি বাঘ এসে তাদের উপর হামলা করল। আমি সাহস করে ছাগলগুলোকে রক্ষা করতে সক্ষম হলাম। অতঃপর বাঘ তার লেজের উপর বসে আমাকে বলতে লাগল ঃ তুমি যেদিন ছাগলদের তরফ থেকে গাফেল হয়ে যাবে, সেদিন কে এদেরকে রক্ষা করবে?

আল্লাহ যে রিযিক আমার নসীব করেছেন, তুমি আমার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিচ্ছ? একথা শুনে আমি বললাম ঃ এমন আশ্চর্যের বিষয় আমি আর কখনও দেখিনি। বাঘ বলল ঃ তুমি এতেই আশ্চর্য হচ্ছ, অথচ আল্লাহর রসূল খর্জুর বাগানের মাঝে মানুষকে অতীত কালের কথা শুনাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে যা হবে, তাও বলে দিচ্ছেন। তিনি মানুষকে আল্লাহর এবাদতের দাওয়াত দিচ্ছেন। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং ঘটনা বর্ণনা করলাম। এরপর মুসলমান হয়ে গেলাম।

মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় এক বাঘ এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গেল এবং কথা বলতে শুরু করল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমাদের কাছে বাঘদের এই দূত এসেছে। তোমরা ইচ্ছা করলে তার জন্যে কিছু ভাতা নির্দিষ্ট করে দাও। সে এর বেশী নেবে না। আর চাইলে এমনিতেই ছেড়ে দাও। সে যা পারে নিয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তোমাদের ভয় থেকে যাবে। সে যা কিছু নেবে, সেটা তার রিযিক হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা তার জন্যে কিছু নির্দিষ্ট করে দিতে সম্মত নই। অতঃপর হুযূর (সাঃ) তিন অঙ্গুলি দিয়ে বাঘের দিকে ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন যে, তুই তাদের ছাগল ছোঁ মেরে নিয়ে যাবি। এতে বাঘটি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে মাথা নেড়ে নেড়ে দৌড়ে চলে গেল।

বন্য প্রাণীর ঘটনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) পরিবারে একটি বন্যপ্রাণী ছিল। যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বাইরে চলে যেতেন, সে খেলা করতে করতে চলে যেত। তিনি যখন গৃহে ফিরতেন, তখন প্রাণীটি ফিরে এসে গৃহে বসে থাকত। হুযূর (সাঃ) যতক্ষণ গৃহে থাকতেন, সে-ও গৃহে থাকত এবং কোন কাণ্ড করত না।

ঘোড়ার কাহিনী

জুয়ায়ল (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে এক জেহাদে শরীক হলাম। আমার সওয়ারী ছিল একটি ঘোড়ী। সে খুব দুর্বল ছিল। ফলে, আমি লশকরের পেছনে চলছিলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার কাছে এসে বললেন ঃ হে অশ্বারোহী, দ্রুত চল। আমি বললাম ঃ আমার ঘোড়ীটি দুর্বল ও কৃশ। তিনি চাবুক তুলে ঘোড়ীকে মারলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ্, তাকে এর মধ্যে বরকত দাও। এরপর আমি ঘোড়ীর লাগামও টানতে পারছিলাম না। সে দ্রুতবেগে চলে সমগ্র লশকরের অগ্রে চলে গেল। এরপর এই ঘোড়ী যে বাচ্চা প্রসব করল, আমি সেটি বার হাজার দেরহামে বিক্রয় করলাম।

গাধার কাহিনী

ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবী তালহা রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) সা'দের সাথে দেখা করলেন এবং তার কাছেই দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম নিলেন। রোদের তাপ কিছুটা ঠাণ্ডা হলে জনৈক বেদুঈন একটি সংকীর্ণ পা ও ধীরগতিসম্পন্ন গাধা নিয়ে হাযির হল। অতঃপর গাধার পিঠে একটি নরম গদি বিছানো হল। হুযূর (সাঃ) তাতে সওয়ার হয়ে আপন গৃহে পৌঁছার পর গাধাটি

বেদুঈনকে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর গাধাটি এমন সুঠাম ও দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়ে গেল যে, কোন জন্তু দ্রুতগতিতে তার মোকাবিলা করতে পারত না।

মালেক আল খাতমী বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কুবার নিকটে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ফেরার পথে আমরা তাঁর আরোহণের জন্যে একটি সংকীর্ণ-পা ও ধীরগতিসম্পন্ন গাধা আনলাম। তিনি তাতে সওয়ার হলেন এবং পরে ফেরত দিলেন। ফিরে আসার পর সেই গাধা এমন বলিষ্ঠ ও দ্রুতগতিসম্পন্ন ছিল যে, কোন গাধাই তার মোকাবিলা করতে পারত না।

ইবনে মনযূর রেওয়ায়েত করেন ঃ খয়বর বিজয়ের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি কালো গাধা পান। সে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোর নাম কি? সে বলল ঃ ইয়াযীদ ইবনে শিহাব। আমার দাদার বংশ থেকে আল্লাহ তা'আলা ষাটটি গাধা সৃষ্টি করেছেন। তাদের সকলের পিঠে পয়গম্বরগণ সওয়ার হয়েছেন। আমার বিশ্বাস ছিল আপনি আমার পিঠে সওয়ার হবেন। কেননা, এখন আমার দাদার প্রজন্মে আমি ছাড়া কেউ বেঁচে নেই। আর পয়গম্বরগণের মধ্যে আপনি ছাড়া কেউ অবশিষ্ট নেই। আমার মালিক ছিল এক ইহুদী। সে সওয়ার হলে আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিতাম। এজন্যে সে আমার পেটে ও পিঠে খুব প্রহার করত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এখন থেকে তুই ইয়াফূর। তিনি কাউকে ডেকে আনার জন্যে ইয়াফূরকে প্রেরণ করলে সে তার গৃহে যেয়ে দরজায় মাথা দিয়ে খট্‌খট্ শব্দ করত। গৃহকর্তা বেরিয়ে এলে সে ইশারায় বুঝিয়ে দিত যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে ডাকছেন। হুযূর (সাঃ)-এর ওফাতের পর ইয়াফূর আবুল হায়ছাম ইবনে নাহিয়ানের কূপের ধারে এল এবং শোকবিহবল হয়ে কূপে পড়ে গেল।

ইবনে সাবা' বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি যে জন্তুর পিঠে সওয়ার হতেন, সে সর্বদা জওয়ান থাকত এবং তাঁর বরকতে কখনও বৃদ্ধ হত না।

গোসাপের ঘটনা

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) বন্ধুবর্গের মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় বনী মুলায়মের জনৈক বেদুঈন একটি গোসাপ শিকার করে সেখানে উপস্থিত হল। সে বলল ঃ লাত-উযযার কসম, আমি আপনার প্রতি ঈমান আনব না, যে পর্যন্ত এই গোসাপ ঈমান না আনে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে গোসাপ, আমি কে? গোসাপটি সকলের বোধগম্য পরিষ্কার আরবী ভাষায় বলল ঃ লাব্বায়কা ও সা'দায়কা ইয়া রসূলা রাব্বিল আলামীন। হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুই কার এবাদত করিস? সে বলল ঃ

اَلَّذِیْ فِی السَّمَاءِ عَرْشُهٗ وَفِی الْاَرْضِ سُلْطَانُهٗ وَفِی الْبَحْرِ سَبِیْلُهٗ وَفِی الْجَنَّةِ رَحْمَتُهٗ وَفِی النَّارِ عَذَابُهٗ -

অর্থাৎ, আমি তাঁর এবাদত করি, যাঁর আরশ আকাশে, রাজত্ব পৃথিবীতে, পথ সমুদ্রে, রহমত জান্নাতে এবং শাস্তি জাহান্নামে।

অতঃপর হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কে? সে বলল ঃ আপনি রব্বুল আলামীনের রসূল, সর্বশেষ নবী। যে আপনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, সে সফলকাম এবং যে মিথ্যারোপ করে, সে ব্যর্থ। অতঃপর বেদুঈন মুসলমান হয়ে গেল।

সিংহের ঘটনা

রসূলুল্লাহর (সাঃ) মুক্ত ক্রীতদাস হযরত সফীনা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি একবার সমুদ্রে নৌকায় আরোহণ করলাম। নৌকাটি ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেলে আমি তার একটি তক্তায় সওয়ার হয়ে গেলাম। তক্তায় ভাসতে ভাসতে আমি এক জায়গায় পৌছে গেলাম। সেখানে সিংহ বাস করত। একটি সিংহ আমার কাছে এলে আমি ভয়ে ভয়ে বললাম ঃ আমি আল্লাহর রসূলের গোলাম সফীনা। সিংহ লেজ হেলাতে লাগল এবং আমার নিকটে এসে দাঁড়িয়ে গেল। অতঃপর সে আমার সঙ্গে চলে আমাকে রাস্তায় এনে দাঁড় করিয়ে দিল। এরপর সে আমাকে বিদায় করার জন্যে বিশেষ ভঙ্গিতে আওয়ায করল।

পাখির ঘটনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার ইচ্ছা করলে দূরে চলে যেতেন। একদিন তিনি এই উদ্দেশ্যে গেলে আমি তাঁর পেছনে গেলাম। তিনি একটি বৃক্ষের নীচে বসে গেলেন এবং পায়ের মোজা খুলে ফেললেন। পরবর্তী সময়ে এক মোজা পরিধান করতেই একটি পাখি এল এবং অপর মোজাটি নিয়ে উড়ে গেল। বৃক্ষে বসে পাখিটি মোজা নাড়াচাড়া করতেই একটি কাল সাপ বের হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এটি একটি কারামত, যা দ্বারা আল্লাহ আমাকে সম্মানিত করেছেন।

আবূ আম্মার রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার আপন মোজাজোড়া চাইলেন। অতঃপর একটি মোজা পরিধান করতেই একটি কাক এসে অপর মোজাটি নিয়ে গেল এবং একটু দূরে নিক্ষেপ করল। অমনি মোজার

ভিতর থেকে একটি সাপ বের হল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে তার উচিত মোজা ঝেড়ে পরিধান করা।

ভূতের ঘটনা

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ জিনদের মধ্য থেকে এক ভূত নামাযরত অবস্থায় আমার মুখে থুথু নিক্ষেপ করল। উদ্দেশ্য, নামায থেকে আমার মনকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে শক্তি দিলেন এবং আমি তাকে ধরে ফেললাম। আমার ইচ্ছা ছিল মসজিদের কোন স্তম্ভের সাথে তাকে বেঁধে রাখি, যাতে তোমরা সকালে উঠে তাকে দেখে নাও। কিন্তু পরক্ষণেই হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর এই দোয়া আমার মনে পড়ে গেল—

رَبِّ اغْفِرْلِیْ وَهَبْ لِیْ مُلْكًا لَّا يَنْبَغِیْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِیْ

অর্থাৎ, পরওয়ারদেগার, আমাকে ক্ষমা কর এবং এমন রাজত্ব দান কর, যা আমার পরে কারও নসীব হবে না।

এরপর আমি তাকে ধিক্কার দিয়ে তাড়িয়ে দিলাম।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ আমার জায়নামাযে শয়তান আমার সামনে এল। আমি তার গলা টিপে ধরলাম। অবশেষে তার জিহ্বার শীতলতা আমার হাতে অনুভব করলাম। যদি সোলায়মান (আঃ) দোয়া না করতেন, তবে মসজিদের এক স্তম্ভের সাথে তাকে বেঁধে রাখতাম এবং তোমরা সকালে তাকে দেখতে পেতে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ এক শয়তান আমার কাছ দিয়ে গমন করলে আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং গলা টিপে দিলাম। এমনকি, তার জিহ্বা বেরিয়ে পড়লো এবং তার জিহ্বার শীতলতা আমি আমার হাতে অনুভব করলাম। সে বলল ঃ আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। যদি সোলায়মান (আঃ) দোয়া না করতেন, তবে মসজিদের এক স্তম্ভের সাথে সে ঝুলে থাকত এবং সকালে মদীনার শিশুরা তাকে দেখতে পেত।

ওতবা ইবনে মাসউদ রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায পড়ছিলেন। নামাযের মধ্যে তিনি সামনের দিকে হাত বাড়ালেন। কেউ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ শয়তান এসেছিল। আমি তাকে ধমকিয়ে দিয়েছি। যদি তাকে ধরতাম, তবে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে দিতাম এবং মদীনার শিশুরা তাকে নিয়ে ক্রীড়াকৌতুক করত।

মৃতদের জীবিত হওয়া এবং কথা বলা

বিদায় হজ্জের বর্ণনায় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন জননীকে জীবিত করেছিলেন। খয়বর যুদ্ধের সময় বিষ মিশ্রিত ছাগলের কথা বলাও বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ জনৈক যুবক আনসারীর বৃদ্ধা জননী ছিল অন্ধ। আনসারী অসুস্থ হলে আমরা তাকে দেখতে গেলাম। আমরা সেখানে থাকা কালেই আনসারীর ইন্তেকাল হয়ে গেল। আমরা তার চোখ বন্ধ করে মুখমণ্ডলে কাপড় রেখে দিলাম। আমরা তার মাকে বললাম ঃ আল্লাহর কাছে তার জন্যে দোয়া কর। মা বলল ঃ বাস্তবিক সে মারা গেছে? আমরা বললাম ঃ হ্যাঁ। সে আকাশের দিকে হাত প্রসারিত করে দোয়া করল ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اِنِّىْ هَاجَرْتُ اِلَيْكَ وَاِلٰى نَبِيِّكَ رَجَاءَ اَنْ
تُغِيْثَنِىْ عِنْدَ كُلِّ شِدَّةٍ فَلَا تَحْمِلْ عَلٰى هٰذِهِ الْمُصِيْبَةِ الْيَوْمَ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, যদি তুমি জান যে, আমি বিপদাপদে সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় তোমার দিকে এবং তোমার নবীর দিকে হিজরত করেছি, তবে আজ আমার উপর এই মুসীবত চাপিয়ে দিয়ো না।

হযরত আনাস বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহর কসম, আমাদের সেখান থেকে প্রস্থান করার পূর্বেই আনসারী তার মুখমণ্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে দিল। এরপর আমাদের সাথে একত্রে বসে আহার করল।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি এই উম্মতে তিনটি বিষয় দেখেছি। এগুলো বনী ইসরাঈলের মধ্যে থাকলে তারা পরস্পরে বিভক্ত হয়ে যেত না। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ বিষয়গুলো কি? তিনি বললেন ঃ আমরা সুফফায় রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে বসা ছিলাম। এক মুহাজির মহিলা তাঁর কাছে আগমন করল। তার সাথে তার প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রও ছিল। পুত্রটি মদীনার মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং কিছুদিন রোগভোগের পর মারা যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার চোখ বন্ধ করে দেন এবং কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করতে বলেন। হুযূর (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ তার মাকে খবর দাও। আমি খবর দিলে মা এলেন এবং পুত্রের পায়ের কাছে বসে তার পা ধরে এই দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْلَمْتُ لَكَ طَوْعًا وَخَلَعْتُ الْاَوْثَانَ زُهْدًا وَهَاجَرْتُ

إِلَيْكَ رَغْبَةً اَللّٰهُمَّ لَا تُشْمِتْ بِيْ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ وَلَاتُحَمِّلْنِيْ مِنْ هٰذِهِ الْمُصِيْبَةِ مَالَاطَاقَةَ لِيْ بِحَمْلِهَا -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমি মনের খুশীতে ইসলাম গ্রহণ করেছি। মূর্তিদের সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করেছি এবং সাগ্রহে তোমার দিকে হিজরত করেছি। হে আল্লাহ, মূর্তিপূজারীদেরকে আমার অবস্থা দেখে হাসতে দিয়ো না এবং এই বিপদের যতটুকু বহন করার ক্ষমতা আমার নেই, তা আমার উপর চাপিয়ে দিয়ো না।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ মহিলার দোয়া পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তার পুত্র পা নাড়া দিল এবং মুখমণ্ডলের উপর থেকে কাপড় সরিয়ে দিল। এরপর সে রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাত পর্যন্ত জীবিত রইল। তার মা তার আগেই মারা যায়।

খলীফা হযরত ওমর (রা) একটি বাহিনী গঠন করেন এবং হযরত আলা আল হাযরামীকে তার নেতা নিযুক্ত করেন। আমিও এই বাহিনীতে শামিল ছিলাম। আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছে দেখি দুশমন পূর্বেই পানির সব ব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ফলে, ভীষণ ধূলাবালি ও পিপাসার কারণে আমরা ও আমাদের জীবজন্তু তীব্র সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়লাম। সূর্য সামান্য ঢলে পড়ার পর আলা আল হাযরামী দু'রাকআত নামায পড়ালেন। অতঃপর দু'হাত প্রসারিত করলেন। আকাশে তখন মেঘের চিহ্ন মাত্র ছিল না। কিন্তু তার হাত নামানোর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা বায়ু প্রেরণ করলেন। কোথা থেকে মেঘমালা এসে এমন বর্ষণ করল যে, সকল পুকুর ও নিম্নভূমি পানিতে একাকার হয়ে গেল। আমরা পানি পান করলাম এবং পাত্র ভরে নিলাম। ইতিমধ্যে দুশমন উপসাগর পাড়ি দিয়ে একটি দ্বীপে চলে গিয়েছিল। আলা উপসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে 'ইয়া আলী,ইয়া আযীম, ইয়া করীম' বললেন। অতঃপর আমাদেরকে বললেন ঃ বিসমিল্লাহ বলে পার হয়ে যাও। আমরা এমন ভাবে উপসাগর পাড়ি দিলাম যে, আমাদের চতুষ্পদ প্রাণীদের ক্ষুর পর্যন্ত সিক্ত হল না। এর কিছুদিন পর আলা আল হাযরামীর ইন্তেকাল হয়ে গেলে আমরা তাকে দাফন করে দিলাম। এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল ঃ ইনি কে? আমরা বললাম ঃ ইনি আলা আল হাযরামী। লোকটি বলল ঃ এই মাটি মৃতদেরকে বাইরে নিক্ষেপ করে দেয়। তোমরা তাকে এক অথবা দু'মাইল দূরে স্থানান্তর করে দিলে মাটি কবুল করে নেবে। একথা শুনে আমরা পরস্পরে বললাম ঃ মাটি আমাদের সেনাপতির মরদেহ বাইরে নিক্ষেপ করলে হিংস্র প্রাণীরা খেয়ে ফেলবে। অতএব, তাকে স্থানান্তর করা উচিত। সেমতে

আমরা সর্বসম্মতিক্রমে স্থানান্তরের উদ্যোগ নিলাম। কিন্তু কবরে পৌঁছে দেখলাম তার মরদেহ কবরে নেই এবং কবর নূরোজ্জ্বল হয়ে আছে। এই অবস্থা দেখে আমরা আবার কবরে মাটি ফেলে ফিরে এলাম।

কা'ব ইবনে মালেক রেওয়ায়েত করেন ঃ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে তাঁর মুখমণ্ডল পরিবর্তিত দেখতে পেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আপন স্ত্রীর কাছে যেয়ে বললেন ঃ আমার মনে হয় রসূলুল্লাহ (সাঃ) ক্ষুধার্ত আছেন। ফলে, মুখমণ্ডল বদলে গেছে। স্ত্রী বললেন ঃ আমাদের কাছে তো কিছুই নেই কিন্তু এই ছাগলটি আছে এবং অবশিষ্ট কিছু গম আছে। ছাগলটি যবেহ করা হল এবং গম পিষে রুটি তৈরী করা হল। গোশ্‌ত রান্না করে একটি বড় পিয়ালায় রুটির সাথে মিলিয়ে "ছরীদ" তৈরী করা হল। জাবের বলেন ঃ আমি এই ছরীদ নিয়ে হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ জাবের, তোমার কওমের লোকজনকে আমার কাছে ডেকে আন। আমি ডেকে আনলাম। তাদের কিছু কিছু লোক আহার করতে যেত। তারা খেয়ে ফিরে এলে অন্যরা যেত। অবশেষে সকলেরই আহার সমাপ্ত হল। কিন্তু পিয়ালায় সেই পরিমাণই ছরীদ বাকী রইল, যা পূর্বে ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মেহমানদেরকে বলেছিলেন—খাবার খাও; কিন্তু হাড্ডি ভেঙ্গো না। অতঃপর তিনি হাড্ডিগুলো একত্রিত করলেন এবং সেগুলোর উপর পবিত্র হাত রেখে কিছু পাঠ করলেন, যা আমি শুনতে পাইনি। অকস্মাৎ ছাগল কান ঝাড়তে ঝাড়তে দাঁড়িয়ে গেল। হুযূর (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ তুমি তোমার ছাগল নিয়ে যাও। আমি ছাগল নিয়ে বাড়ী পৌঁছলে স্ত্রী জিজ্ঞেস করল ঃ এটি কোন্ ছাগল? আমি বললাম ঃ এটি সেই ছাগল, যা আমি যবেহ করেছিলাম। হুযূর (সাঃ) আল্লাহর কাছে দোয়া করায় ছাগলটি আমাদের জন্যে জীবিত হয়ে গেছে। আমার স্ত্রী বলল ঃ আমি আবার সাক্ষ্য দেই যে, তিনি আল্লাহর রসূল।

ওবায়দ ইবনে মরযূক রেওয়ায়েত করেন যে, মদীনায় এক মহিলা ছিল, সে মসজিদে ঝাড় দিত। সে মারা গেল; কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) জানতে পারলেন না। একদিন তিনি মহিলার কবরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এটা কার কবর? সাহাবায়ে কেরাম বললেন ঃ এটি উম্মে মেহজানের কবর। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেই মহিলার কবর, যে মসজিদে ঝাড় দিত? উত্তর হল জী হ্যাঁ।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণকে সারিবদ্ধ করলেন এবং তার উপর নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কোন্ আমলটি উত্তম পেয়েছ? সাহাবীগণ বললেন ঃ এই মহিলা কি শুনে? তিনি বললেন ঃ তোমরা তার চাইতে বেশী শ্রবণ কর না।

সুয়ূতী (রঃ) বলেন ঃ উহুদ যুদ্ধের অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত হামযা (রাঃ) ও অন্যান্য শহীদগণ সালামের জওয়াব দিয়েছিলেন, যা লোকেরাও শুনেছিল এবং আবদুল্লাহ আমর ইবনে হারামের কবর থেকে কোরআন পাকের তেলাওয়াত লোকেরা শুনেছে।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার তিনি বাকী কবরস্তানে গমন করে বললেন ঃ "আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূর" (কবরবাসীগণ, তোমাদের প্রতি সালাম)। আরও বললেন ঃ আমাদের এখানকার খবর এই যে, তোমাদের স্ত্রীরা দ্বিতীয় বিবাহ করে নিয়েছে। তোমাদের শহরগুলোতে অন্যরা বসবাস করতে শুরু করেছে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ বন্টন করে দেয়া হয়েছে। গায়েব থেকে জওয়াব এল ঃ হে ওমর, আমাদের এখানকার খবর এই যে, আমরা যে সব কর্ম পূর্বে প্রেরণ করেছিলাম, সেগুলো পেয়ে গেছি। আমরা যা ব্যয় করেছিলাম, তার উপকার পেয়ে গেছি, আর যা যা ব্যয় না করে ছেড়ে এসেছি, সেগুলোর ব্যাপারে আমরা ক্ষতি ভোগ করছি।

সুয়ূতী বলেন ঃ সাহাবী, তাবেঈ ও পরবর্তী বুযুর্গগণ মৃতদের কথা শুনেছেন—এ সম্পর্কে আমি অনেকগুলো রেওয়ায়েত সন্নিবেশিত করেছি।

বায়হাকী বলেন ঃ মৃত্যুর পর কথা বলা সম্পর্কে সহীহ্ সনদ সহকারে একাধিক রেওয়ায়েত বিদ্যমান আছে। সেমতে আবদুল্লাহ ইবনে ওবায়দুল্লাহ রেওয়ায়েত করেন যে, মুসায়লামার হাতে নিহত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কেউ কথা বলে এবং মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ, আবূ বকর ও ওছমান সম্পর্কে আল আমীন ও আর রাহীম বলে। সে হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে কি বলেছে, তা আমি জানি না।

হযরত হামযা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ব্যক্তি তার ছাগলের দুধ দোহন করে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এক পিয়ালা দুধ নিয়ে আসত। কিছুদিন সে দুধ নিয়ে এল না। তার পিতা এসে বলল যে, তার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি চাও যে, আমি তোমার পুত্রের জীবিত হওয়ার জন্যে দোয়া করি? না তুমি সবর করবে এবং কিয়ামতের দিন তোমার পুত্র তোমাকে হাত ধরে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করাবে? লোকটি বলল ঃ হে আল্লাহর নবী, আমার জন্যে কে এরূপ করবে? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমার পুত্র তোমার জন্যে এবং প্রত্যেক মুমিনের জন্যে তার পুত্র এটাই করবে।

মূক ও অন্ধদেরকে সুস্থ করা

শিমার ইবনে আতিয়্যা রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে জনৈকা মহিলা তার যুবক পুত্রকে নিয়ে আগমন করল এবং বলল ঃ আমার এই

পুত্র জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত কোন কথা বলেনি। হুযূর (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কে? যুবকটির মুখ খুলে গেল এবং সে বলল ঃ আপনি আল্লাহর রসূল।

হাবীব ইবনে ফুদায়ক বর্ণনা করেন ঃ তার নেত্রদ্বয় সম্পূর্ণ শুভ্র ছিল এবং কিছুই দৃষ্টিগোচর হত না। তার পিতা তাকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নিয়ে এলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হল কেন? সে বলল ঃ আমার পা সাপের ডিমের উপর পড়ে গিয়েছিল। এতেই আমার দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কিছু পড়ে তার উভয় চোখে ফুঁ দিলেন, আশি বছর বয়সেও তিনি সুঁইয়ে সূতা লাগাতে পারতেন। অথচ তার নেত্রদ্বয় পূর্ববৎ শুভ্র ছিল।

অসুস্থ ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কিত মোজেযা

মোহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এক ব্যক্তিকে আনা হল, যার পায়ে ঘা ছিল। কোন চিকিৎসাই কার্যকর হচ্ছিল না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর অঙ্গুলি তাঁর থুথুর উপর রাখলেন, অতঃপর অঙ্গুলির অগ্রভাগ মাটির উপর রেখে ঘায়ের উপর রেখে দিলেন এবং বললেন ঃ

باسمك اللهم ربق بَعْضِنَا بِتُرْبَةِ اَرْضِنَا يَشْفِىْ سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا -

অর্থাৎ, মোহাম্মদ ইবনে হাতেব রেওয়ায়েত করেন, আমার হাতে উত্তপ্ত হাঁড়ি পড়ে যাওয়ায় হাত জ্বলে যায়। আমার জননী আমাকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি পোড়া জায়গায় থুথু দিতে থাকেন এবং বলতে থাকেন ঃ

اَذْهِبِ الْبَاْسِ رَبِّ النَّاسِ —এই আমলের বরকতে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাই।

শারজীল জু'ফী রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম ঃ আমার হাতে গিরা পড়ে গেছে, সে কারণে তলোয়ারের কবজা এবং ঘোড়ার লাগাম ধরতে অসুবিধা হয়। হুযূর (সাঃ) আমার হাতে ফুঁ দিলেন এবং পবিত্র হাত গিরার উপর রেখে তালু দ্বারা মালিশ করলেন। তিনি যখন তাঁর হাত তুললেন, তখন সেখানে গিরার চিহ্ন মাত্র ছিল না।

আবূ সুবরা রেওয়ায়েত করেন ঃ তিনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আরয করলেন ঃ আমার হাতে গিরা থাকার কারণে উটের লাগাম ধরতে কষ্ট হয়। হুযূর (সাঃ) একটি তীর আনালেন এবং সেটি দিয়ে গিরার উপর মৃদু আঘাত করতে লাগলেন এবং তার উপর হাত বুলালেন। অবশেষে গিরা বিলীন হয়ে গেল।

আবইয়ায ইবনে হাম্মাল বর্ণনা করেন যে, তার মুখমণ্ডলে দাদ হওয়ার কারণে মুখমণ্ডল সাদা হয়ে গিয়েছিল। এক রেওয়ায়েতে আছে—দাদে তার নাক খেয়ে ফেলেছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলেন এবং মুখমণ্ডলে হাত বুলিয়ে দিলেন। এরপর রাত হওয়ার পূর্বেই দাদের চিহ্ন মাত্র ছিল না।

হাবীব ইবনে ইয়াসাক রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে এক যুদ্ধে শরীক হলাম। আমার কাঁধে তরবারির এমন আঘাত লাগে যে, আমার হাত ঝুলতে থাকে। আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি যখমের উপর তাঁর থুথু লাগালেন। ফলে, যখম শুকিয়ে গেল এবং আমি ভাল হয়ে গেলাম। অতঃপর যে আমাকে তরবারি মেরেছিল, তাকে আমিই হত্যা করলাম।

বায়হাকী আসমা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ তার মাথা ও মুখমণ্ডল ফুলে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন পবিত্র হাত রেখে তিনবার এই দোয়া করলেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَذْهِبْ عَنْهَا سُوْءَهٗ وَفُحْشَهٗ بِدَعْوَةِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الْمَكِيْنِ عِنْدَكَ

অর্থাৎ, এই দোয়ার বরকতে তার ফুলা খতম হয়ে যায়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, এক মহিলা তার পুত্রকে নিয়ে এল এবং আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার এই পুত্র সকাল-বিকাল আহারের সময় পাগল হয়ে যায়। তার মুখে রুচি নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর পবিত্র হাত তাঁর বুকে রাখলেন এবং দোয়া করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বমি করল। বমির সাথে হিংস্র জানোয়ারের কাল বাচ্চার মত কি একটা বের হয়ে গেল। অতঃপর সে সুস্থ হয়ে গেল।

বায়হাকী মোহাম্মদ ইবনে সীরীন থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ এক মহিলা তার পুত্রকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে এসে বলল ঃ আমার এই পুত্র আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে, কেমন রোগা। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যাতে সে মরে যায়। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি দোয়া করছি, যাতে সে সুস্থ ও

বড় হয়ে একজন সাধু ব্যক্তি হয়ে যায় এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করতে করতে শাহাদত বরণ করে। এরপর জান্নাতে চলে যায়। সেমতে তিনি দোয়া করলেন। সে সুস্থ ও বড় হয়ে একজন সৎলোকে পরিণত হল এবং আল্লাহর রাহে জেহাদ করে শহীদ হয়ে গেল।

রেফাআ ইবনে রাফে' বর্ণনা করেন, চর্বি গিলে ফেলার কারণে আমি এক বছর রোগে ভুগে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নিজের অবস্থা বর্ণনা করলাম। তিনি তাঁর পবিত্র হাত আমার পেটে বুলালেন। আমার বমি হল এবং সেই চর্বি হলুদ রঙের হয়ে পেট থেকে বের হল। এরপর কখনও আমার পেটের অসুখ হয়নি।

বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে জাবের (রাঃ) বলেন ঃ রুগ্নাবস্থায় আমাকে দেখার জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও হযরত আবূ বকর (রাঃ) আগমন করেন। আমি তখন বনী সালামায় ছিলাম এবং এত বেশী রুগ্ন ছিলাম যে, কাউকে চিনতে পর্যন্ত পারতাম না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) পানি আনিয়ে উযূ করলেন এবং কিছু পানি আমার উপর ছিটিয়ে দিলেন। আমি সুস্থ বোধ করলাম এবং বললাম ঃ আমি আমার ধনসম্পদ কি করব? তখন – يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْٓ اَوْلَادِ كُمْ الخ আয়াতখানি নাযিল হল।

মোয়াবিয়া ইবনুল হাকাম বর্ণনা করেন, পরিখা খননকালে আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে ছিলাম। আমার ভাই আলী ইবনুল হাকাম পরিখার উপর দিয়ে তার ঘোড়া চালাতে চাইলে তা সম্ভব হল না এবং প্রাচীরে লেগে তার পায়ের গোছা চূর্ণ হয়ে গেল। আমরা তাকে ঘোড়ার পিঠে রেখে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নিয়ে এলাম। তিনি তার গোছায় হাত বুলালেন। অতঃপর ঘোড়া থেকে নামার আগেই সে সুস্থ হয়ে গেল।

ক্ষুধা ও পিপাসা নিবারণ করা

এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে বসা ছিলাম। হযরত ফাতেমা (রাঃ) এসে পিতার কাছে দাঁড়িয়ে গেলেন। ক্ষুধার তীব্রতায় তাঁর মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর পবিত্র হাত তাঁর বুকে হার পরিধানের জায়গায় রাখলেন। অতঃপর অঙ্গুলি খুলে বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ مُشْبِعَ الْجَاعَةِ وَرَافِعَ الْوَضِيْعَةِ اِرْفَعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ

এমরান বলেন ঃ হযরত ফাতেমার মুখমণ্ডলের বিবর্ণতা তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে

গেল। পরে আমি তাঁর সাথে দেখা করলে তিনি বললেন ঃ এমরান, এখন আমি ক্ষুধাতুর নই। বায়হাকী বলেন ঃ এমরান পর্দার আদেশ নাযিল হওয়ার পূর্বে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে দেখে থাকবেন।

আবূ উমামা বাহেলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে আমার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করলেন। আমি যখন সেখানে পৌঁছলাম, তখন খুবই ক্ষুধার্ত ছিলাম। সম্প্রদায়ের লোকেরা রক্ত পান করছিল। তারা আমাকে বলল ঃ এস, পান কর। আমি বললাম ঃ আমি তোমাদের কাছে এজন্যেই এসেছি, যাতে তোমাদেরকে রক্ত পান করতে নিষেধ করি। তারা আমার কথা শুনে হাসতে লাগল এবং আমাকে মিথ্যাবাদী ঠাওরাল। আমি দারুণ ক্ষুধা ও পিপাসা নিয়ে সেখান থেকে ফিরে এলাম এবং তদবস্থায়ই ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে কেউ এসে আমাকে দুধের একটি পিয়ালা দিল। আমি দুধ পান করলাম। ফলে, আমি খুব তৃপ্ত হয়ে গেলাম। আমি যাদের কাছ থেকে ফিরে এসেছিলাম, তাদের একজন অন্যজনকে বলল ঃ আমাদের কওমেরই এক ব্যক্তি আমাদের কাছে এসেছিল। আমরা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে ভাল করিনি। তাকে কিছু পানাহার করানো উচিত। অতঃপর তারা আমার কাছে খাবার নিয়ে এল। আমি বললাম ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে পানাহার করিয়েছেন। এরপর আমি তাদেরকে পেট খুলে দেখালাম। এই পরিস্থিতি দেখে তারা মুসলমান হয়ে গেল।

বায়হাকী ছাবেত, আবূ এমরান জওফী ও হেশাম ইবনে হাসসান থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ উম্মে আয়মন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। তার কাছে পাথেয় ছিল না। রাওহা পৌঁছার পর তীব্র পিপাসা অনুভব করেন। উম্মে আয়মন বর্ণনা করেন, আমি শোঁ শোঁ বায়ু চলার শব্দ শুনলাম। মাথা তুলে চেয়ে দেখি সাদা রশিতে একটি বালতি বাঁধা আছে এবং আকাশ থেকে ঝুলছে। আমি বালতিটি নিয়ে নিলাম এবং পানি পান করলাম। এরপর থেকে আমি ভীষণ গরমের দিন রোযা রাখি এবং রৌদ্রে ঘুরাফেরা করি; কিন্তু মোটেই পিপাসা অনুভব করি না।

হযরত বেলাল (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি এক ঠাণ্ডা সকালে আযান দিলাম। নবী করীম (সাঃ) গৃহ থেকে বের হয়ে এলেন। মসজিদে অন্য কোন মুসল্লী উপস্থিত ছিল না। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ বেলাল, লোকজন কোথায়? আমি আরয করলাম ঃ অত্যধিক শীতের কারণে আসেনি। তিনি দোয়া করলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنْهُمُ الْبَرْدَ —হে আল্লাহ, তাদের শৈত্য দূর কর। বেলাল (রাঃ) বলেন ঃ এরপর আমি সকাল বেলায় মানুষকে পাখা করতে দেখেছি।

হযরত সাফীনা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ কেউ তাকে তার নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার নাম "সাফীনা" (জাহাজ) রেখেছেন। এরূপ নাম রাখার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে কোথা গেলেন। সাহাবীগণের কাছে তাদের আসবাবপত্রের বোঝা ভারী মনে হল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি চাদর বিছিয়ে দিলেন। অতঃপর সকলেই নিজ নিজ আসবাবপত্র চাদরে রেখে দিল এবং আমার পিঠে তুলে দিল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুলে নাও। তুমি সাফীনা। এরপর থেকে আমি এক থেকে সাত উটের বোঝা পর্যন্ত বহন করি। আমার কাছে ভারী মনে হয় না।

মানুষের বিস্মরণ ও বাজে কথার অভ্যাস দূর করা

বুখারী ও মুসলিম আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন—একবার নবী করীম (সাঃ) আমাদেরকে বললেন ঃ তোমাদের কে তার কাপড় বিছাবে, যাতে আমি তাতে আমার কথাবার্তা ঢেলে দেই? সেমতে আমি আমার কাপড় বিছিয়ে দিলাম। তিনি আমাদের সাথে অনেক কথা বললেন। এরপর আমি আমার কাপড় গুটিয়ে নিলাম। আল্লাহর কসম, এরপর আমি যত কথা শুনেছি, ভুলিনি।

বুখারীর রেওয়ায়েতে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি আপনার কাছ থেকে অনেক হাদীস শুনি এবং ভুলে যাই। তিনি বললেন ঃ চাদর বিছাও। আমি চাদর বিছালাম। তিনি চাদরের দিকে হাতে ইশারা করলেন এবং বললেন ঃ গুটিয়ে নাও। আমি চাদর গুটিয়ে নিলাম। এরপর আমি কখনও তাঁর কোন কথা বিস্মৃত হইনি।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে ইয়ামনে প্রেরণ করতে চাইলে আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি যুবক। আপনি আমাকে বিচারক পদে অধিষ্ঠিত করতে চাইছেন। অথচ বিচারকার্য সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। হুযূর (সাঃ) আপন পবিত্র হাত আমার বুকে মেরে এই দোয়া করলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَلْبَهٗ وَثَبِّتْ لِسَانَهٗ

হে আল্লাহ, তার অন্তরকে পথ দেখাও এবং জিহ্বাকে সংহত রাখ। সেই সত্তার কসম, যিনি বীজ অংকুরিত করেন, আমি দু'ব্যক্তির মধ্যে যে রায় দিয়েছি, তাতে কোন সন্দেহ করিনি।

আবূ উমামা রেওয়ায়েত করেন ঃ এক মহিলা পুরুষদের সাথে অশ্লীল ও বাজে কথাবার্তা বলত। সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এল। তিনি তখন ছরীদ খাচ্ছিলেন। মহিলা তাঁর কাছে ছরীদ চাইলে তিনি দিয়ে দিলেন। সে বলল ঃ আপনার পবিত্র মুখ থেকে দিন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাও দিলেন। সে খেয়ে ফেলল। এরপরই তার মধ্যে লজ্জাশীলতা এত প্রবল হল যে, সে আমৃত্যু কারও সাথে অশ্লীল বাক্যালাপ করেনি।

তীর নিক্ষেপের ক্ষমতা

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে সালামা ইবনে আকওয়া বলেন ঃ বনী আসলামের কিছু লোক পরস্পরে তীর নিক্ষেপের অনুশীলন করছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের কাছে যেয়ে বললেন ঃ তীরন্দাজ একটি উত্তম খেলা। তোমরা তীরন্দাজ কর। সালামার সাথে আমি থাকব। একথা শুনে সকলেই হাত গুটিয়ে নিল এবং বলল ঃ আপনি সালামার সাথে থাকলে আমরা তার সাথে কুলিয়ে উঠতে পারব না। সে আমাদেরকে হারিয়ে দেবে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা তীরন্দাজ কর তো, আমি তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকব। অতঃপর সকলেই সমগ্র দিন তীরন্দাজী করল; কিন্তু জয়-পরাজয় নির্ধারিত হল না।

কংকর ও খাবারের তাসবীহ্ পাঠ

হযরত আবূ যর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) একাকী বসে ছিলেন। আমি এসে তাঁর কাছে বসে গেলাম। এরপর আবূ বকর (রাঃ) এসে সালাম করলেন এবং বসে গেলেন। এরপর হযরত ওমর (রাঃ), এরপর হযরত ওছমান (রাঃ) আগমন করলেন। হুযূর (সাঃ)-এর সামনে সাতটি কংকর ছিল। তিনি সেগুলো তুলে হাতের তালুতে রাখলেন। অমনি কংকরগুলো তাসবীহ্ পাঠ করতে লাগল এবং মৌমাছির গুনগুন্ রবের মত আওয়াজ উত্থিত হল। তিনি সেগুলো মাটিতে রেখে দিলে আওয়াজ আসা বন্ধ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি দু'টি কংকর হযরত ওছমান (রাঃ)-এর হাতে রাখলেন। আবার তাসবীহ্ পাঠের আওয়াজ শুনা গেল। তিনিও রেখে দিলে আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এটি নবুওয়তের খেলাফত।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর হাতে কংকর তুলে নিলে তারা তাসবীহ্ পাঠ করতে থাকে। আমি নিজ কানে সেই তাসবীহ্ শুনেছি। অতঃপর তিনি কংকরগুলো যথাক্রমে হযরত আবূবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর হাতে দিলেন। প্রত্যেকের হাতেই কংকরগুলো তাসবীহ্

পাঠ করল এবং আমরা শুনলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কংকরগুলো আমাদের সকলের হাতে দিলেন। কিন্তু তাসবীহ্ পাঠের আওয়াজ শুনা গেল না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ হাযরামূতের রাজন্যবর্গ রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আগমন করেন। তাদের মধ্যে আশআছ ইবনে কায়সও ছিলেন। তিনি বললেন ঃ আমরা মনে মনে একটি বিষয় চিন্তা করেছি। আপনি বলুন, সেটি কি? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এটা তো অতীন্দ্রিয়বাদীর কাজ। আর অতীন্দ্রিয়বাদী জাহান্নামে যাবে। আশআছ বললেন ঃ তা হলে আমরা কিরূপে বিশ্বাস করব যে, আপনি আল্লাহর রসূল? হুযূর (সাঃ) তাঁর হাতের তালুতে কয়েকটি কংকর নিয়ে বললেন ঃ এই কংকরগুলো সাক্ষ্য দিবে যে, আমি আল্লাহ্র রসূল। অতঃপর কংকরগুলো তাঁর হাতে তাসবীহ্ পাঠ করল এবং তারা বললেন ঃ আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহ্র রসূল।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এই খাবার তাসবীহ্ পাঠ করে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনি এর তাসবীহ্ বুঝেন? তিনি বললেন ঃ নিঃসন্দেহে। এখন এই খাবারের পাত্রটি ঐ ব্যক্তির নিকট রাখ। পাত্র রাখা হলে লোকটি বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! নিঃসন্দেহে এই খাবার তাসবীহ্ পড়ে। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকটে রাখা হলে সে-ও তাই বলল। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পাত্রটি ফিরিয়ে দিলেন। কেউ বলল ঃ পাত্রটি সকলের সামনে এসে গেলে ভাল হত। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ যদি পাত্রটি কারও কাছে যেয়ে চুপ হয়ে যেত, তবে মানুষ তাকে গোনাহের কলংক দিত। অথচ এটা সমীচীন নয়।

খায়ছামা রেওয়ায়েত করেন ঃ আবুদারদা কোন বস্তু রান্না করছিলেন। হঠাৎ হাঁড়ি তার হাত থেকে পড়ে গিয়ে তাসবীহ্ পাঠ করতে লাগল।

কায়স রেওয়ায়েত করেন ঃ আবু দারদা ও কিছু লোক একটি খাঞ্চায় আহার করছিলেন। হঠাৎ খাবার ও খাঞ্চা উভয়টি তাসবীহ্ পাঠ করতে থাকে।

বৃক্ষ-কাণ্ডের ফরিয়াদ

বুখারীর রেওয়ায়েতে জাবের (রাঃ) বলেন ঃ নবী করীম (সাঃ) একটি খেজুর কাণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে খোতবা দিতেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম তাঁর জন্যে মিম্বর তৈরী করলেন। জুমুআর দিন তিনি খোতবা দেয়ার জন্যে মিম্বরে চলে গেলেন। তখন খেজুর কাণ্ডটি শিশুর ন্যায় কান্না জুড়ে দিল। তিনি মিম্বর থেকে নীচে নেমে কাণ্ডটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সে শিশুর ন্যায় অভিমান করতে লাগল। রাবী বলেন ঃ কাণ্ডটির কান্নার কারণ এই যে, তার কাছে যে যিকর হত, সে তা শুনত।

দারেমীর রেওয়ায়েতে আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দার পিতা বলেন ঃ নবী করীম (সাঃ) একটি বৃক্ষ–কাণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে খোতবা দিতেন। অতঃপর তাঁর জন্যে মিম্বর তৈরী করা হলে তিনি যখন মিম্বরের দিকে যেতে লাগলেন, তখন বৃক্ষ-কাণ্ডটি উষ্ট্রীর ন্যায় অভিমান ও ফরিয়াদ করল। তিনি আপন পবিত্র হাত তার উপর রেখে বললেন ঃ তুই চাইলে আমি তোকে পূর্বের জায়গায় স্থাপন করব এবং তুই আগের মত তরতাজা হয়ে যাবি। আর যদি চাস, আমি তোকে জান্নাতে রোপণ করে দেব, জান্নাতের নহর তোকে সিক্ত করবে এবং আল্লাহর ওলীগণ তোর ফল খাবে। উত্তরে কাণ্ডটি দু'বার বলল ঃ ভাল, আমি এটিই কবুল করলাম। কেউ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ কাণ্ডটি কি বলল? তিনি বললেন ঃ সে জান্নাতে রোপণ করাকে পছন্দ করেছে।

হযরত উবাই ইবনে কাবও একইরূপ রেওয়ায়েত করেছেন। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি বৃক্ষ–কাণ্ডের কাছে খোতবা দিতেন। তাঁর জন্যে মিম্বর তৈরী করা হলে তিনি যখন তার উপর দাঁড়ালেন, তখন বৃক্ষ–কাণ্ডটি এমনভাবে ফরিয়াদ করল, যেমন উষ্ট্রী তার বাচ্চার জন্যে করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মিম্বর থেকে নেমে তার কাছে এলেন এবং বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তখন সে চুপ হয়ে গেল।

বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একটি বৃক্ষ-কান্ডের কাছে খোতবা দিতেন। যখন তাঁর জন্যে মিম্বর তৈরী করা হল, তখন তিনি মিম্বরে চলে গেলেন। এ কারণে বৃক্ষ–কাণ্ডটি ফরিয়াদ করে। হুযূর (সাঃ) তার কাছে এলেন এবং তার উপর হাত বুলালেন। এতে সে চুপ হয়ে যায়।

হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আনাস, সহল ইবনে সা'দ সায়েদী ও হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) থেকেও এমনি ধরনের রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে।

আমর ইবনে সওয়াদ বলেন ঃ ইমাম শাফেঈ (রঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা কোন নবীকে এমন মোজেযা দেননি, যেমন নবী করীম (সাঃ) কে দিয়েছেন। আমর বলেন ঃ আমি ইমাম শাফেঈকে বললাম ঃ হযরত ঈসা (আঃ)-কে জীবিত করার মর্তবা দান করা হয়েছিল। ইমাম শাফেঈ বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা হুযূর (সাঃ)-কে বৃক্ষ-কাণ্ডের ফরিয়াদ করার মর্তবা দিয়েছেন, যা মৃতকে জীবিত করার চাইতে উচ্চস্তরের মোজেযা।

দোয়ায় দরজার চৌকাঠ ও গৃহ প্রাচীরের আমীন বলা

আবূ উসায়দ সায়েদী রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন ঃ আগামী কাল সকালে তুমি এবং তোমার ছেলে গৃহে উপস্থিত থাকবে যে পর্যন্ত আমি তোমাদের কাছে না আসি। আমার প্রয়োজন আছে। সেমতে তিনি পরের দিন সকালে তাদের কাছে এলেন এবং তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা কাছাকাছি হয়ে যাও। যখন তারা উভয়েই কাছাকাছি হয়ে গেলেন, তখন হুযূর (সাঃ) তাদের উপর নিজের চাদর ফেলে দিলেন এবং এই দোয়া করলেন ঃ يَارَبِّ هٰذَا عَمِّىْ وَصَرَابِىْ هٰؤُلَاءِ اَهْلِ بَيْتِىْ فَاسْتُرْهُمْ مِنَ النَّارِ كَسِتْرِىْ اِيَّاهُمْ بِمَلَاَتِىْ هٰذِهٖ

অর্থাৎ, পরওয়ারদেগার, এরা আমার চাচা ও চাচাত ভাই। এরা আমার পরিবারবর্গ। অতএব এদেরকে জাহান্নাম থেকে আবৃত কর, যেমন আমি আমার চাদর দ্বারা তাদেরকে আবৃত করেছি।

হুযূর (সাঃ)-এর এই দোয়ায় দরজার চৌকাঠ ও গৃহের প্রাচীর 'আমীন' 'আমীন' বলল।

পাহাড়ের গতিশীল হওয়া

বুখারী ও মুসলিম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) উহুদ কিংবা হেরার উপর আরোহণ করেন। তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবূ বকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)। পাহাড় তাঁদেরকে নিয়ে আন্দোলিত হল। হুযূর (সাঃ) পাহাড়ে পা দিয়ে আঘাত করে বললেন ঃ থেমে যা, তোর উপর নবী, সিদ্দীক ও দু'জন শহীদ আছেন।

মুসলিম আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন এবং এর সাথে সংযোজন করেছেন যে, হযরত আলী, তালহা ও যুবায়র ছিলেন। তিনি পাহাড়কে বললেন ঃ স্থির হয়ে যা। তোর উপর নবী অথবা সিদ্দীক অথবা শহীদ আছেন।

মিম্বরের গতীশীল হওয়া

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি—প্রতাপশালী আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে হাতে নিয়ে বলবেন,

اَنَا الْجَبَّارُ وَاَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ -

অর্থাৎ, আমি প্রতাপশালী, প্রতাপশালীরা কোথায়? অহংকারীরা কোথায়?

একথা বলার সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) ডানে-বামে ঝুঁকে পড়ছিলেন। আমি দেখলাম মিম্বরের নিম্নভাগ নড়াচড়া করছে। মনে হল মিম্বর তাঁকে ফেলে না দেয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) রসূলুল্লাহকে (সাঃ) নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন ঃ

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهٖ -

অর্থাৎ, তারা (কাফেররা) আল্লাহর যথার্থ মূল্যায়ন করেনি। কিয়ামতের দিন আমি সমগ্র পৃথিবীকে মুঠির মধ্যে পুরে নেব এবং আকাশমণ্ডলী ভাঁজ করা থাকবে তাঁর দক্ষিণ হস্তে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এখানে আল্লাহ তাঁর প্রতাপ ও অসাধারণ প্রতিপত্তি ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন ঃ আমি প্রতাপান্বিত, আমি আমি। একথা বলার সাথে সাথে তাঁর মিম্বর এমন নড়ে উঠল যে, আমরা মনে মনে বললাম যে, তিনি অবশ্যই মিম্বর থেকে পড়ে যাবেন।

মৃতকে মাটির কবুল না করা

বায়হাকী ও আবূ নঈম কবীসা ইবনে দুয়িব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জনৈক সাহাবী একদল মুশরিকের সাথে খণ্ডযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে মুশরিকরা পালিয়ে গেল। জনৈক মুসলমান এক পলাতক মুশরিককে পেয়ে তাকে হত্যা করার জন্যে তরবারি উত্তোলন করল। মুশরিক তৎক্ষণাৎ'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে উঠল। কিন্তু মুসলমান ব্যক্তিটি এরপরেও তাকে হত্যা করল। এরপর সে এসে এঘটনা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অবগত করলে তিনি দারুণ অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং বললেন ঃ তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছিলে? কিছুদিন পর ঘাতক মুসলমান মারা গেল। দাফন করার পর সে পুনরায় মাটির উপরে এসে গেল। তার পরিবারের লোকজন এসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একথা জানালে তিনি বললেন ঃ একে আবার দাফন করে দাও। তারা তাই করল। কিন্তু এবারও মাটির উপরে

এসে গেল। তিনবার তাই হল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ মাটি তাকে কবুল করতে অস্বীকার করেছে। তাকে কোন গর্তে ফেলে দাও।

হযরত হাসান (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা খবর পেয়েছি। এরপর তিনি উপরোক্ত রেওয়ায়েতের অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা বুঝে নাও মাটি তার চেয়ে অধিক দুষ্ট ব্যক্তিকে কবুল করে নেয়; কিন্তু তোমাদের উপদেশের নিমিত্ত তার সাথে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তোমাদের কেউ যেন এরূপ কালেমা উচ্চারণকারীকে হত্যা করতে তড়িঘড়ি না করে। এখন তোমরা এই ব্যক্তিকে অমুক উপত্যকায় নিয়ে যাও এবং দাফন করে দাও। এখন মাটি তাকে কবুল করবে। সেমতে তাই করা হল।

এক মিথ্যুককে হত্যার আদেশ

সাঈদ ইবনে জুবায়র রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ব্যক্তি আনসারগণের বস্তীতে এসে বলল ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন, যাতে তোমরা অমুক মহিলাকে আমার বিবাহে অর্পণ কর। অথচ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ করেননি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই সংবাদ অবগত হয়ে হযরত আলী ও যুবায়র (রাঃ)-কে প্রেরণ করলেন এবং বললেন ঃ তোমরা সেই বস্তীতে যেয়ে লোকটিকে হত্যা কর। কিন্তু আমার মনে হয়, তোমরা তাকে পাবে না। তারা উভয়েই সেখানে গেলেন, কিন্তু তাদের পৌঁছার আগেই লোকটি সর্পদংশনে মারা গেল।

আবদুল্লাহ ইবনে হারেছ রেওয়ায়েত করেন ঃ জাদ জুন্দায়ীর দাদা ইয়ামনে যেয়ে সেখানকার এক মহিলার প্রতি পাগলপারা হয়ে যায়। সে বলল ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর আদেশ তোমাদের প্রতি এই যে, তোমরা এই মহিলাকে আমার কাছে প্রেরণ কর। ইয়ামনের লোকেরা বলল ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অঙ্গীকার করেছি এবং তিনি ব্যভিচার হারাম করেছেন। এরপর তারা এক ব্যক্তিকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে প্রেরণ করল। ঘটনা শুনে তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে ইয়ামন প্রেরণ করলেন এবং বললেন ঃ যদি তুমি তাকে জীবিত পাও, তবে হত্যা করবে। আর মৃত পেলে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবে। এদিকে জাদ্দের দাদা রাতে পানি আনতে বের হলে এক সর্প তাকে দংশন করল। ফলে, সে মারা গেল।

হাকামের ঘটনা

আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ হাকাম ইবনে আবুল আস রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মজলিসে বসে তাঁর কথাবার্তায় মুখ

ভ্যাংচাইত। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোর এ অবস্থাই অব্যাহত থাকবে। সেমতে সে মৃত্যু পর্যন্ত মুখ ভ্যাংচাতে থাকে।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার নবী করীম (সাঃ) খোতবা দিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর পেছনে তাঁর অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুই এরূপই হয়ে যা। অতঃপর লোকেরা তাকে ধরাধরি করে বাড়ীতে নিয়ে গেল। দীর্ঘ দুই মাস অজ্ঞান থাকার পর যখন সংজ্ঞা ফিরে এল, তখন হুযূর (সাঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী অনুকরণই করে যাচ্ছিল।

হিন্দ ইবনে খাদীজা নবী করীম (সাঃ)-এর পত্নী থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাকামের কাছে গেলেন। সে তাঁর দিকে চোখে ইশারা করতে লাগল। হুযূর (সাঃ) তাকে দেখে ফেললেন এবং দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ بِهٖ وَزَغًا

হাকাম তৎক্ষণাৎ কাঁপুনি রোগে আক্রান্ত হল। বগভী বলেন ঃ এই হাকাম হচ্ছে মারওয়ানের পিতা।

আগুনে প্রজ্বলিত হওয়ার ঘটনা

ইবনে ওয়াহাব ইবনে লুহাইয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আসওয়াদ আনাসী যখন নুবওয়ত দাবী করল এবং সানাআ দখল করে নিল, তখন সে যুয়ায়ব ইবনে কুলায়বকে গ্রেফতার করল। যুয়ায়ব নবী করীম (সাঃ)-এর নবুওয়তে বিশ্বাসী ছিলেন। একারণে আসওয়াদ তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করল। কিন্তু অগ্নির কোন প্রভাব তার উপর পতিত হল না। তিনি অক্ষত রয়ে গেলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِىْ اُمَّتِنَا مَثَلُ اِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের উম্মতের মধ্যে ইবরাহীম খলীলুল্লাহর মত ব্যক্তিত্ব রেখেছেন।

আবদান কিতাবুস সাহাবায় বলেন ঃ এই যুয়ায়ব ইবনে কুলায়ব ইবনে রবীআ খাওলানী সেই ব্যক্তি, যিনি ইয়ামনবাসীদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

ইবনে আসাকির আবূ বাশার জা'ফর ইবনে আবূ ওয়াহশিয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ জনৈক খাওলানী ব্যক্তি মুসলমান হলেন। তার কওমের লোকেরা তাকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নিতে চাইল। কিন্তু তিনি কুফরে ফিরে

গেলেন না। কওমের লোকেরা তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করল। কিন্তু তিনি প্রজ্বলিত হলেন না। অতঃপর তিনি খলীফা আবূবকর (রাঃ)-এর কাছে এলেন এবং তাকে মাগফেরাতের দোয়া করতে অনুরোধ করলেন। খলীফা বললেন ঃ দোয়া তো তোমার করা উচিত। কারণ, তুমি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়েও অক্ষত রয়ে গেছ। মোটকথা, হযরত আবূ বকর তার জন্যে দোয়া করলেন। এরপর তিনি সিরিয়ায় চলে গেলেন। মানুষ তাকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে তুলনা করত।

ইবনে আসাকির শারজীল ইবনে সলম খাওলানী থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ আসওয়াদ ইবনে কায়স ইয়ামনে নবুওয়ত দাবী করল। সে এক ব্যক্তিকে আবূ সলম খাওলানীর কাছে প্রেরণ করল। সে আবূ সলমকে জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি কি আসওয়াদের নবুওয়তের সাক্ষ্য দাও? আবূ সলম বললেন ঃ আমি শুনতে পাই না। এরপর সে প্রশ্ন করল ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মোহাম্মদ আল্লাহর রসূল? উত্তর হল ঃ অবশ্যই। আসওয়াদ অগ্নি প্রজ্বলিত করার নির্দেশ দিল এবং আবূ সলমকে তাতে নিক্ষেপ করল; কিন্তু আবূ সলমের কোন ক্ষতি হল না। লোকেরা আসওয়াদকে পরামর্শ দিল, আপনি আবূ সলমকে বহিষ্কার না করলে সে আপনার অনুসারীদেরকে বিভ্রান্ত করবে। সেমতে আসওয়াদ আবূ সলমকে দেশান্তরের নির্দেশ দিল। তিনি মদীনায় চলে এলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাত হয়ে গিয়েছে। আবূ বকর (রাঃ) খলীফা ছিলেন। তিনি আবূ সলমকে দেখে বললেন ঃ আল্লাহর শোকর, আমি জীবিত আছি এবং উম্মতের সেই ব্যক্তিকে দেখেছি, যার সাথে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম খলীলুল্লাহর মত আচরণ করেছেন।

খাওলানী লোকেরা আনাসীদেরকে বলত, তোমাদের গোত্রের আসওয়াদ একটা মিথ্যুক। সে আমাদের এক ব্যক্তিকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেছে; কিন্তু তার কোন ক্ষতি হয়নি।

আমর ইবনে মায়মূন রেওয়ায়েত করেন, মুশরিকরা আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার কাছে যেতেন এবং তাঁর পবিত্র হাত তার মাথায় বুলাতেন। তিনি বলতেন ঃ

يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى عَمَّارٍ كَمَا كُنْتِ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ
تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

অর্থাৎ,হে অগ্নি, আম্মারের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও যেমন ইবরাহীমের উপর হয়েছিলে। তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।

আবূ নঈমের রেওয়ায়েতে ওব্বাদ ইবনে আবদুল হামদ বর্ণনা করেন ঃ আমরা আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-এর কাছে এলাম। তিনি বাঁদীকে বললেন ঃ দস্তরখান আন, আমরা খাব। দস্তরখান আনা হলে তিনি বললেন ঃ রুমাল আন। বাঁদী একটি ময়লাযুক্ত রুমাল নিয়ে এল। হযরত আনাস চুল্লী প্রজ্বলিত করার আদেশ দিলেন। অতঃপর রুমালটি চুল্লীর আগুনে নিক্ষেপ করলেন। রুমালটি দুধের মত পরিষ্কার হয়ে চুল্লী থেকে বের হল। আমরা হযরত আনাসকে বললাম ঃ এটা কেমন রুমাল, আগুনে পুড়ল না এবং পরিষ্কার হয়ে এল? তিনি বললেন ঃ এটি সেই রুমাল, যা দ্বারা রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর মুখমণ্ডল মুছতেন। এই রুমাল ময়লাযুক্ত হয়ে গেলে আমরা আগুনে নিক্ষেপ করি। এতে ময়লা দূর হয়ে রুমাল সাদা হয়ে যায়। কেননা, যে বস্তু পয়গাম্বরগণের মুখমণ্ডলে লাগে, অগ্নি তাকে পোড়ায় না।

লাঠি, বেত্র ও অঙ্গুলি উজ্জ্বল হওয়া

আবূ আবাস ইবনে জুবায়র রেওয়ায়েত করেন ঃ তিনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে নামায পড়তেন, এরপর বনী হারেছায় তার বাসগৃহে চলে যেতেন। বর্ষার এক অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে যখন তিনি গৃহে ফিরছিলেন, তখন তার লাঠিতে নূর সৃষ্টি হয়ে গেল। তিনি সেই নূরের আলোকে গৃহে পৌঁছে গেলেন।

বুখারী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর দু'জন সাহাবী অন্ধকার রাতে তাঁর কাছ থেকে বের হন। তাদের সাথে দু'টি প্রদীপের ন্যায় কোন বস্তু চলছিল। পথিমধ্যে যখন তারা পৃথক হয়ে গেলেন, তখন প্রত্যেকের সাথে একটি প্রদীপ হয়ে গেল। তারা প্রদীপের আলোকে গৃহে পৌঁছে গেলেন।

হযরত আনাস বর্ণনা করেন ঃ ওব্বাদ ইবনে বিশর ও ওসায়দ ইবনে হুযায়র এক প্রয়োজনে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলেন। রাত হয়ে গেল। রাতটি ছিল গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি লাঠি ছিল। তারা উভয়েই রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছ থেকে রওয়ানা হলেন। তাদের একজনের লাঠি উজ্জ্বল আলোকময় হয়ে গেল। তারা উভয়েই এর আলোকে পথ চলতে লাগলেন। যখন রাস্তা পৃথক হয়ে গেল, তখন অপরজনের লাঠিতেও আলো এসে গেল। তারা নিজ নিজ লাঠির আলোকে গৃহে পৌঁছে গেলেন।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর গৃহে আলাপ-আলোচনা রত ছিলেন। ইতিমধ্যে রাতের একটি অংশ অতিবাহিত হয়ে গেল। অতঃপর হুযূর (সাঃ) ও

ওমর সেখান থেকে রওয়ানা হলেন। রাতটি ছিল অন্ধকারময়। তাঁদের একজনের হাতে ছিল একটি লাঠি। লাঠিটি আলোকময় হয়ে গেল এবং তাঁরা গৃহে পৌঁছে গেলেন।

হযরত হামযা আসলামী রেওয়ায়েত করেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। অন্ধকার রাতে আমরা তাঁর কাছ থেকে পৃথক হলে আমার অঙ্গুলিসমূহ আলোকময় হয়ে গেল। এই আলোকে আমরা সওয়ারীর উট ও অন্যান্য হারানো বস্তু তালাশ করে নিলাম। এরপরও আমার অঙ্গুলি যথারীতি আলোকময় ছিল।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রেওয়ায়েত করেন ঃ এক বর্ষার রাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এশার নামাযের জন্যে বাইরে এলেন। একটি নূর চমকে উঠল। এর আলোকে তিনি কাতাদাহ ইবনে নোমানকে দেখে বললেন ঃ নামায সমাপ্ত হলে তুমি স্বস্থানে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। নামাযশেষে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কাতাদাহকে একটি বৃক্ষশাখা দিয়ে বললেন ঃ এটি তোমার দশ কদম সামনের এবং দশ কদম পেছনের স্থান আলোকিত করবে।

আবূ নঈমের রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক রাত আমার কাছে থাকেন। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আমি কিছুটা আতংক অনুভব করলাম। আমার মনে হল রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায পড়ছেন। আমিও উযূ করলাম এবং তাঁর পেছনে নামায শুরু করলাম। এরপর তিনি দোয়া করলেন। একটি নূর এল এবং সমগ্র গৃহকে উজ্জ্বল করে তুলল। আল্লাহ যতক্ষণ চাইলেন, নূর বিদ্যমান রইল। হুযূর (সাঃ) তখনও দোয়ায় রত ছিলেন। এরপর পূর্বাপেক্ষা অধিক আলো নিয়ে একটি নূর এল। এটি এত বেশী আলোকময় ছিল যে, গৃহে একটি তিল পড়ে থাকলেও আমি এই আলোকে তাকে কুড়িয়ে নিতে পারতাম। এ নূরটিও চলে যাওয়ার পর আমি এই নূর সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ আয়েশা, তুমি সেই নূরটি দেখেছিলে? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, আমি দেখেছি। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি পরওয়ারদেগারের কাছে আমার উম্মতের জন্যে সওয়াল করলে তিনি আমাকে এক-তৃতীয়াংশ দান করলেন। এ কারণে আমি আল্লাহর হামদ ও শোকর করলাম। এরপর অবশিষ্ট উম্মতের জন্যে সওয়াল করলে তিনি আমাকে দুই-তৃতীয়াংশ দান করলেন। এ জন্যে আমি পরওয়ারদেগারের হামদ ও শোকর করলাম। এরপর অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ সওয়াল করলে তিনি আমাকে তা-ও দান করলেন। আমি আমার রবের হামদ ও শোকর করলাম।

হযরত হাসান ও হুসায়ন (রাঃ)-এর জন্যে প্রকাশিত নূর

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে নামায পড়ছিলাম। তিনি যখন সেজদা করতেন, তখন হাসান ও হুসায়ন লাফ দিয়ে তাঁর পিঠে চড়ে বসতেন। মাথা তোলার সময় তিনি তাদেরকে নম্রভাবে বসিয়ে দিতেন। তিনি আবার যখন সেজদায় যেতেন, তখন উভয় ভ্রাতা তাই করতেন। নামাযান্তে তিনি একজনকে এখানে এবং একজনকে ওখানে বসিয়ে দিলেন। আমি বললাম ঃ আমি তাদেরকে তাদের মায়ের কাছে দিয়ে আসি? তিনি বললেন ঃ না। এরপর একটি নূর চমকে উঠল। হুযূর (সাঃ) উভয় ভ্রাতাকে বললেন ঃ তোমরা তোমাদের মায়ের কাছে চলে যাও। তারা এই নূরের আলোকে গৃহে চলে গেলেন।

অস্ত যাওয়ার পর পুনরায় সূর্যোদয় হওয়া

হযরত আসমা বিনতে ওমায়স (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছিল। তাঁর পবিত্র মস্তক হযরত আলী (রাঃ)-এর কোলে ছিল। হযরত আলী (রাঃ) তখনও আসরের নামায আদায় করেননি। অবশেষে সূর্য অস্ত গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّهٗ كَانَ فِىْ طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُوْلِكَ فَارْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! সে তোমার ও তোমার রসূলের আনুগত্যে ব্যাপৃত ছিল। অতএব তার জন্যে সূর্যকে ফিরিয়ে আন।

আসমা (রাঃ) বলেন ঃ আমি দেখলাম ঃ যে সূর্য অস্ত গিয়েছিল, তা আবার উদিত হল। তিবরানীর এক রেওয়ায়েতে আছে, সূর্য উদিত হয়ে পাহাড় ও পৃথিবীর উপর থেমে গেল। হযরত আলী (রাঃ) উযূ করে আসরের নামায পড়লে সূর্য অদৃশ্য হয়ে গেল। এ ঘটনা সাহবায় সংঘটিত হয়।

চিত্র মিটিয়ে দেয়া

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ নবী করীম (সাঃ) আমার কাছে আসার সময় আমি একটি চিত্রবিশিষ্ট কাপড় পরিহিত ছিলাম। তিনি চিত্রটি ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন ঃ কিয়ামতের দিন তাদেরকে ভীষণ শাস্তি দেবেন, যারা আল্লাহর

সৃষ্টির প্রতিকৃতি তৈরী করে। হযরত আয়েশা আরও বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার কাছে একটি ঢাল আনলেন, যাতে ঈগলের চিত্র ছিল। তিনি তাঁর পবিত্র হাত চিত্রের উপর রেখে দিলেন। অমনি চিত্রটি মুছে গেল।

হযরত মাকহূল (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) একটি ঢাল ছিল, যাতে মেষের মস্তকের চিত্র ছিল। তিনি চিত্রটির কারণে মনে মনে বিষণ্ন হলেন। সকালে দেখা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা চিত্রটি দূর করে দিয়েছেন।

পবিত্র হাতের বরকতে চুল সাদা না হওয়া

মাদলূক আবু সুফিয়ান রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে হাযির হয়ে মুসলমান হয়ে গেলাম। তিনি আমার মস্তকে হাত বুলালেন। রাবীগণ বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) যে জায়গায় হাত বুলিয়েছিলেন, সেই জায়গায় মাথার চুল কাল ছিল। মাথার অবশিষ্ট অংশ সাদা ছিল।

সায়েব ইবনে ইয়াযীদের মুক্ত ক্রীতদাস আতা রেওয়ায়েত করেন ঃ সায়েবের মাথার চুল খুলি থেকে কপাল পর্যন্ত কাল ছিল এবং মাথার অবশিষ্ট অংশ সাদা ছিল। আমি বললাম ঃ প্রভু, আপনার মাথায় যেমন চুল, এমন আমি আর কারও দেখিনি। তিনি বললেন ঃ বৎস, তুমি জান না এই চুল কেন এমন হল। শৈশবে আমি একবার শিশুদের সাথে খেলা করছিলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেদিক দিয়ে গমন করলেন। তিনি আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম ঃ সায়েব ইবনে ইয়াযীদ। তিনি তাঁর পবিত্র হাত আমার মাথায় বুলালেন এবং এই দোয়া করলেন ঃ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ —আল্লাহ তোমার মধ্যে বরকত দিন। যে অংশে তাঁর হাত লেগেছিল, সেই অংশ কখনও সাদা হবে না।

ইউনুস ইবনে আনাসের পিতা বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন আমি দু'সপ্তাহের শিশু ছিলাম। আমাকে তাঁর কাছে আনা হলে তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বরকতের দোয়া করলেন। তিনি আরও বললেন ঃ এর নাম আমার নামে রাখ। তবে আমার কুনিয়ত (ডাকনাম) রেখো না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন বিদায় হজ্জে আগমন করেন, তখন আমার বয়স ছিল দশ বছর। ইউনুস বলেন ঃ আমার পিতা যে বয়স পেয়েছিলেন, তাতে তার সমস্ত চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। তবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে জায়গায় হাত রেখেছিলেন, মাথার সেই জায়গা এবং দাড়ি সাদা হয়নি।

মালেক ইবনে ওমায়র রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) তাঁর পবিত্র হাত তার মাথা ও মুখমণ্ডলে রাখেন। শেষ বয়সে তার মাথা ও দাড়ি সাদা হয়ে গেলেও যে অংশে পবিত্র হাতের ছোঁয়া লেগেছিল, সেই অংশ সাদা হল না।

মোহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) ওবাদা ইবনে সা'দ ইবনে ওছমানের মাথায় পবিত্র হাত বুলিয়ে দেন এবং দোয়া করেন। আশি বছর বয়সে তার ইন্তেকাল হয়। তখনও তার মাথার চুল সাদা হয়নি।

বশীর ইবনে উকরামা রেওয়ায়েত করেন ঃ উহুদ যুদ্ধে আমার পিতা নিহত হলে আমি কাঁদতে কাঁদতে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি কাঁদছ কেন? তুমি কি পছন্দ কর না যে, আমি তোমার পিতা হয়ে যাই এবং আয়েশা তোমার মা? তিনি আমার মাথায় হাত বুলালেন, যার প্রভাবে আমার মাথার সেই অংশ কাল এবং বাকী অংশ সাদা।

ইসহাকের রেওয়ায়েতে আছে, বশীর বলেন ঃ আমার জিহ্বায় গ্রন্থি ছিল। ফলে আমার কথা স্পষ্ট হত না। হুযূর (সাঃ) আমার মুখে লালা দিলেন। ফলে জিহ্বার গ্রন্থি খুলে গেল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার নাম কি? আমি বললাম ঃ মুজীর। তিনি বললেন ঃ বরং তোমার নাম বশীর।

আবূ যায়দ আনসারী রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার মাথা ও দাড়িতে হাত বুলান এবং এই দোয়া করেন ঃ اَللّٰهُمَّ جَمِّلْهُ —হে আল্লাহ, তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। রাবী বলেন ঃ একশ' নয় বছর বয়সে তিনি যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তার দাড়িতে একটি চুলও সাদা ছিল না। তার মুখমণ্ডল ছিল প্রস্ফুটিত, প্রশস্ত। এতে মৃত্যু পর্যন্ত কোন ম্লানিমা দেখা দেয়নি।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ জনৈক ইহুদী রসূলুল্লাহর (সাঃ) দাঁড়ি পরিপাটি করেছিল। তিনি তার জন্যে এই বলে দোয়া করেন ঃ اَللّٰهُمَّ جَمِّلْهُ এতে ইহুদীর সাদা দাড়ি কাল হয়ে গেল। সে নব্বই বছর জীবিত রইল; কিন্তু তার চুল সাদা হল না।

পবিত্র হাতের বরকতে রোগমুক্তি, চমক ও সুগন্ধি সৃষ্টি হওয়া

হানযালা ইবনে হুযায়ম রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) তার মাথায় পবিত্র হাত রেখে বললেন ঃ بُوْرِكَ فِيْكَ —তোমার মধ্যে বরকত হোক। যুবাল বর্ণনা করেন ঃ হানযালার কাছে স্তনফুলা ছাগল, উট ও মানুষ আনা হত। তিনি তাঁর হাতে থুথু দিতেন এবং ছাগল, উট ও মানুষের ফুলা স্থানের উপর বুলাতেন এবং বলতেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى اَثَرِ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ, আল্লাহর নামে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) হাতের প্রভাবে।

এতে ফুলা খতম হয়ে যেত।

আবুল আলা রেওয়ায়েত করেন ঃ কাতাদাহ ইবনে মালহানের রুগ্নাবস্থায় আমি তাকে দেখতে গেলাম। আমি এক ব্যক্তিকে গমন করতে দেখলাম, যার মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব কাতাদার মুখমণ্ডলে এমনভাবে প্রতিফলিত হল, যেমন আয়নায় প্রতিফলিত হয়। কাতাদাহর মুখমণ্ডলে এই আয়নার মত চমক থাকার কারণ এই ছিল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার মুখমণ্ডলে হাত বুলিয়েছিলেন। আমি যখনই তাকে দেখতাম, মনে হত যেন তার মুখমণ্ডলে তৈল মালিশ করা আছে।

বিশর ইবনে মোয়াবিয়া রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি তার পিতা মোয়াবিয়া ইবনে ছওরের সাথে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আসেন। তিনি তার মুখমণ্ডল ও মাথায় পবিত্র হাত বুলিয়ে দেন ও দোয়া করেন। এ কারণে বিশরের মুখমণ্ডলে এমন প্রভাব ছিল, যেমন ঘোড়ার কপালে শুভ্রতা। বিশর যে বস্তুর উপর হাত বুলাতেন, সে রোগমুক্ত হয়ে যেত।

ওতবা ইবনে ফারকাদের পত্নী রেওয়ায়েত করেন ঃ ওতবার কাছে আমরা চার পত্নী ছিলাম এবং প্রত্যেকেই খোশবূ ব্যবহার করতাম। আমরা প্রত্যেকেই চাইতাম যে, ওতবাকে অন্যপত্নী খোশবূ প্রদান করুক। কিন্তু ওতবা খোশবূ স্পর্শ পর্যন্ত করতেন না। এতদসত্ত্বেও তিনি আমাদের সকলের চাইতে বেশী সুগন্ধিযুক্ত ছিলেন। তিনি যখন মানুষের মধ্যে বসতেন, তখন সকলেই তার সুগন্ধির তারীফ করত। আমরা সকলেই ওতবাকে এই সুগন্ধি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) যমানায় আমি একটি রোগে ভুগছিলাম। এই রোগের কথা বলার জন্যে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে পৌছলে তিনি আমাকে বিবস্ত্র হতে বললেন। আমি উলঙ্গ হয়ে তাঁর সামনে বসে গেলাম। কেবল লজ্জাস্থানের উপর একটি কাপড় রেখে দিলাম। হুযূর (সাঃ) তাঁর হাতে ফুঁ মেরে আমার পেট ও পিঠের উপর বুলালেন। সেদিন থেকেই এই খোশবূ আমা থেকে ছড়াতে থাকে।

ওয়াছেল ইবনে হাজর রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে মোসাফাহা করতাম কিংবা আমার ত্বক পবিত্র দেহকে স্পর্শ করত। এরপর তৃতীয় দিনও আমার হাত থেকে মেশকের চাইতেও অধিক সুবাসযুক্ত খোশবূ বের হত।

বায়হাকী আবূ তোফায়ল থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ বনী লায়ছের এক ব্যক্তি ফিরাস ইবনে আমরের মাথায় ভীষণ ব্যথা ছিল। তার পিতা তাকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নিয়ে এলে তিনি তার উভয় চোখের মধ্যবর্তী ত্বক ধরে টান দিলেন। তাঁর অঙ্গুলির জায়গায় একটি চুল গজাল এবং মাথাব্যথা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়ে গেল। তার মাথায় আর কখনও ব্যথা হয়নি। আবূ তোফায়ল বলেন ঃ ফিরাস হারুরাবাসীদের সাথে মিলে হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তার পিতা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে। তখন তার সেই চুল পড়ে যায়। এটা তার কাছে খুব অসহনীয় ঠেকে। লোকেরা তাকে বলল ঃ এই চুল পড়ে যাওয়ার কারণ এই যে, তুমি হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ কিংবা বিদ্রোহ করার ইচ্ছা করেছ। তাই শীঘ্র তওবা কর। ফিরাস তওবা করে নিল। আবূ তোফায়ল বর্ণনা করেন, তওবা করার পর তার চুল পুনরায় গজিয়ে উঠল।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) আংটি

বায়হাকী বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি আংটি পরিধান করতেন। তাঁর ওফাতের পর এটি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর হাতে থাকে। এরপর হযরত উমর (রাঃ)-এর হাতে থাকে। হযরত ওছমান (রাঃ)-এর হাতে ছিল। তার খেলাফতের ছয় বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আংটিটি "আরীস" নামক কূপে পড়ে যায়। সেটি পড়ে যাওয়ার পর হযরত ওছমান (রাঃ)-এর কর্মচারীবৃন্দ বদলে গেল এবং গোলযোগ দেখা দিল।

বুখারী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর আংটি তাঁর পবিত্র হাতে ছিল। তাঁর পরে হযরত আবূ বকরের (রাঃ) হাতে। তারপরে হযরত ওমর (রাঃ)-এর হাতে। একবার হযরত ওছমান (রাঃ) আরীস নামক কূপের পাদদেশে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আংটিটি খুলে হাতে ঘুরাতে থাকেন। হঠাৎ তা কূপে পড়ে গেল। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমরা তিন দিন তাঁর সাথে যেয়ে আংটি তালাশ করলাম। কূপের পানি উত্তোলন করা হল। কিন্তু আংটি পাওয়া গেল না।

কোন কোন আলেম বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর আংটিতে এমন কিছু রহস্যজনক গুণাগুণ ছিল, যেমন ছিল হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর আংটিতে। যখন সোলায়মান (আঃ)-এর আংটি হারিয়ে গেল, তখন তাঁর রাজত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেল। তেমনি হযরত ওছমান (রাঃ)-এর হাত থেকে যখন রসূলুল্লাহর (সাঃ) আংটি হারিয়ে গেল, তখন তাঁর খেলাফতে বিশৃংখলা দেখা দিল, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত হল এবং শেষ পর্যন্ত তাকে শাহাদত বরণ করতে হল।

নবুওয়তের আংটি

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে ডেকে বললেন ঃ আমার এই আংটিতে "মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ" অংকিত করিয়ে দাও। সেটা ছিল রূপার আংটি। হযরত আলী (রাঃ) ভাস্করের কাছে যেয়ে বললেন ঃ এতে এই শব্দগুলো খোদিত করে দাও। সে বলল ঃ আচ্ছা দিচ্ছি। কিন্তু খোদাই করার সময় আল্লাহ তা'আলা তার হাত ঘুরিয়ে দিলেন এবং সে "মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ" খোদাই করে দিল। হযরত আলী (রাঃ) বললেন ঃ আমি তো এটা খোদাই করতে বলেনি। ভাস্কর বলল ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার হাত ঘুরিয়ে দিয়েছেন। ফলে, আমি শব্দগুলো এমন অবস্থায় খোদাই করেছি যে, আমি কিছুই টের পাইনি। হযরত আলী (রাঃ) বললেন ঃ তুমি ঠিক বলেছ। অতঃপর তিনি আংটি নিয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এলেন এবং ঘটনা বর্ণনা করলেন। হুযূর (সাঃ) শুনে মুচকি হাসলেন এবং বললেন ঃ আমি আল্লাহর রসূল।

অবস্তুকে বস্তুরূপে দেখা
রহমত ও স্থিরতাকে দেখা

হাকেম সালমান থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ তিনি একদল লোকের মধ্যে ছিলেন, যারা আল্লাহর যিকর করছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেদিক দিয়ে গেলে তাদের কাছে চলে গেলেন। সকলেই তাঁর সম্মানার্থে যিকর বন্ধ করে দিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি যিকর করছিলে? আমি তোমাদের উপর রহমত নাযিল হতে দেখেছি। তাই আমি সমীচীন মনে করলাম যে, এই রহমতে তোমাদের সাথে শরীক হয়ে যাই।

ইবনে আসাকির হযরত সা'দ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক মজলিসে ছিলেন। তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি তুললেন, অতঃপর দৃষ্টি নত করে নিলেন, এরপর দৃষ্টি তুললেন। কেউ এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ মজলিসের লোকেরা আল্লাহর যিকর করছিল। তাদের উপর সেই স্থিরতা নাযিল হল, যা ফেরেশতারা বহন করছিল। এই স্থিরতা একটি গম্বুজের অনুরূপ ছিল। স্থিরতা তাদের নিকটবর্তী হলে এক ব্যক্তি একটি বাতিল কথা বলল, যে কারণে সেই স্থিরতা তাদের থেকে তুলে নেয়া হল।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একদল লোক যখন মসজিদে হাত তুলে দোয়া করছিল, তখন আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে মসজিদের দিকে গেলাম। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি যে বস্তু দেখতে পাচ্ছি, তুমি কি তা দেখতে পাচ্ছ? আমি বললাম ঃ আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন? তিনি বললেন ঃ আমি তাদের

হাতে নূর দেখতে পাচ্ছি। আমি আরয করলাম ঃ আপনি দোয়া করুন, যাতে এই নূর আল্লাহ তা'আলা আমাকেও দেখান। হুযুর (সাঃ) দোয়া করলেন এবং আল্লাহ তা'আলা সেই নূর আমাকেও দেখিয়ে দিলেন।

বরযখ, বেহেশত ও দোযখের অবস্থা জানা

ইবনে মাজা ফাতেমা বিনতে হুসায়ন থেকে এবং তিনি আপন পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) পুত্র হযরত কাসেম (রাঃ)-এর শিশু অবস্থায় ওফাত হয়ে গেলে হযরত খাদীজা (রাঃ) আক্ষেপ করে বললেন ঃ আমার বাসনা ছিল যে, কাসেম তার দুগ্ধপানের মেয়াদ পর্যন্ত জীবিত থাকুক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ কাসেমের দুগ্ধপান জান্নাতে পূর্ণ হবে। হযরত খাদীজা (রাঃ) বললেন ঃ তার দুগ্ধপান জান্নাতে পূর্ণ হবে এটা জানতে পারলে আমি আশ্বস্ত হতাম। হুযুর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি চাইলে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করব, যাতে তোমাকে কাসেমের কণ্ঠস্বর শুনিয়ে দেন। হযরত খাদীজা বললেন ঃ আমি এটা চাই না; বরং আল্লাহ ও রসূলের কথা সত্য বলে বিশ্বাস করি।

আহমদ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ তিনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে মুশরিকদের শিশু সম্পর্কে কথা বললে তিনি এরশাদ করলেন ঃ তুমি চাইলে আমি দোযখে তাদের চীৎকারের আওয়াজ শুনিয়ে দেই।

বুখারী ও মুসলিম ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) দু'টি কবরের কাছ দিয়ে গমনকালে বললেন ঃ এ দু'জন কবরবাসীকে আযাব দেয়া হচ্ছে। কিন্তু কোন কবীরা গোনাহের কারণে আযাব দেয়া হচ্ছে না; বরং তাদের একজন তার প্রস্রাব থেকে আত্মরক্ষা করত না এবং দ্বিতীয়জন কূটনামি করে ফিরত। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) খেজুরের একটি তাজা শাখা নিলেন এবং সেটি চিরে দুভাগে ভাগ করে প্রত্যেকের কবরের উপর রেখে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি এগুলো কবরের উপর রাখলেন কেন? তিনি বললেন ঃ এই শাখাগুলো শুষ্ক হওয়ার পূর্বে তাদের কবরের আযাব হালকা করে দেয়া হবে।

ইবনে জারীর আবূ ওসামা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বাকী গারকাদে চলে গেলেন এবং দু'টি তাজা কবরের কাছে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা এখানে অমুক অমুককে দাফন করেছ? সাহাবীগণ বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ অমুককে এ সময় বসানো হয়েছে এবং তার উপর পিটুনি পড়ছে। সেই সত্তার কসম, যার কবযায় আমার প্রাণ, তাকে বেদম প্রহার করা হয়েছে, যা মানুষ ও জিন ছাড়া সকলেই শুনেছে। যদি

তোমাদের অন্তরে মলিনতা এবং কথার বাড়াবাড়ি না থাকত, তবে আমি যা কিছু শুনতে পাচ্ছি, তোমরাও শুনতে। প্রহারের চোটে এই ব্যক্তির প্রতিটি হাড্ডি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে এবং তার কবরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এই দু'ব্যক্তির গোনাহ কি? তিনি বললেন ঃ এই ব্যক্তি পেশাব থেকে আত্মরক্ষা করত না এবং এই ব্যক্তি মানুষের গোশত খেত অর্থাৎ গীবত করত।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও বেলাল বাকীতে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বেলাল, আমি যা শুনতে পাচ্ছি, তুমি কি তা শুনতে পাচ্ছ? বেলাল আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি শুনতে পাচ্ছি না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি কবরবাসীদের আওয়াজ শুনছ না? তাদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রেওয়ায়েত করেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে (কবরস্তান দিয়ে) যাচ্ছিলাম। হঠাৎ নাকে দুর্গন্ধ লাগল। তিনি বললেন ঃ তোমরা জান এটা কিসের দুর্গন্ধ? এটা তাদের দুর্গন্ধ, যারা মুমিনদের গীবত করত।

জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রেওয়ায়েত করেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে চলতে চলতে মরুভূমির দিকে চলে গেলাম। আমরা দেখলাম এক ব্যক্তি দ্রুতগতিতে উট চালিয়ে এগিয়ে আসছে। হুযুর (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কোথেকে আসছ? লোকটি বলল ঃ আমি আমার বাড়ী-ঘর ও পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে আসছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোথায় যাচ্ছ? সে বলল ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে যাচ্ছি। তিনি বললেন ঃ তুমি পৌঁছে গেছ। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে ইসলামের তালীম দিলেন। তার উটের পা ইঁদুরের গর্তে ঢুকে পড়ায় সে উট থেকে পড়ে মারা গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমি দেখলাম, দু'জন ফেরেশতা তার মুখে ফল তুলে দিচ্ছে।

বুখারী ও মুসলিম হযরত আসমা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) আমলে সূর্যগ্রহণ হয়। তিনি সূর্যগ্রহণের নামায পড়েন। নামায থেকে ফিরে এলে সাহাবীগণ আরয করলেন ঃ আমরা আপনাকে কোন বস্তু গ্রহণ করতে, অতঃপর তা থেকে বিরত থাকতে দেখেছি। হুযুর (সাঃ) বললেন ঃ আমি জান্নাত দেখে তা থেকে এক গুচ্ছ আঙ্গুর নিতে চেয়েছিলাম। এরপর নেইনি। যদি নিয়ে নিতাম, তবে দুনিয়া বাকী থাকা পর্যন্ত তোমরা তা খেতে। আমি দোযখ দেখেছি। এমন ভয়াবহ দৃশ্য কখনও দেখিনি। দোযখীদের অধিকাংশ ছিল নারী।

বুখারী ও মুসলিম এমরান ইবনে হুসায়ন থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, সূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আমি জান্নাত দেখেছি এবং জান্নাতীদের

অধিকাংশ দরিদ্র দেখেছি। আর আমি দোযখ দেখেছি। দোযখীদের অধিকাংশ ছিল নারী।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমি জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়েছি। আমার সামনে একটি প্রাসাদ এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এটা কার জন্যে? ফেরেশতারা বলল ঃ এটা ওমর ইবনে খাত্তাবের জন্যে। হে ওমর, তোমার মর্যাদাবোধের কারণে আমি প্রাসাদে প্রবেশ করিনি। রাবী আবূ বকর ইবনে আইয়াশ বর্ণনা করেন, আমি হুমায়দকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ নবী করীম (সাঃ) এই প্রাসাদ স্বপ্নে দেখেছেন, না জাগ্রত অবস্থায়? হুমায়দ বললেন ঃ জাগ্রত অবস্থায়।

বুখারী আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আমি আমর ইবনে আমের খুযায়ীকে দেখেছি দোযখে তার নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করা হচ্ছে। আমর সেই ব্যক্তি, যে "সায়েবা" প্রথা চালু করেছিল। সায়েবা সেই উষ্ট্রীকে বলা হয়, যাকে প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হত এবং সওয়ারীর কাজে ব্যবহার করা হত না।

বুখারী হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ আমি দেখেছি যে, জাহান্নামের এক অংশ অন্য অংশকে পিষ্ট করছে। আর আমরকে দেখলাম যে, তার নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করা হচ্ছে। এই আমরই সর্ব প্রথম সায়েবা প্রথার সূচনা করে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, জিবরাঈল আমার হাত ধরে জান্নাতের সেই দরজা দেখালেন, যা দিয়ে আমার উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেন ঃ যদি আমিও আপনার সঙ্গে থাকতাম এবং সেই দরজাটি দেখতাম! হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে যারা জান্নাতে দাখিল হবে, তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমি দাখিল হবে।

হযরত খিযির (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আওফ তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি মসজিদের অপর পার্শ্ব থেকে কাউকে বলতে শুনলেন–

اَللّٰهُمَّ اغْنِىْ عَلٰى مَا يُنْجِيْنِىْ مِمَّا خَوَّفْتَنِىْ مِنْهُ–

হুযূর (সাঃ) হযরত আনাসকে বললেন ঃ এই ব্যক্তির কাছে যেয়ে বল, সে যেন আমার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করে। হযরত আনাস (রাঃ) এই পয়গাম পৌঁছিয়ে দিলেন। লোকটি বলল ঃ তোমাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) পাঠিয়েছেন? আনাস বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর সে বলল ঃ তাকে যেয়ে বলে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সকল পয়গম্বরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, যেমন শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন রমযানকে সকল মাসের উপর। তাঁর উম্মতকে সকল উম্মতের উপর ফযীলত দিয়েছেন, যেমন ফযীলত দিয়েছেন জুমআর দিনকে সকল দিনের উপর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে দেখার জন্যে চলে গেলেন। যেয়ে দেখেন যে,তিনি খিযির (আঃ)।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, একরাতে আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে বাইরে গেলাম। আমার কাছে উযূর পানি ছিল। তিনি কাউকে এই দোয়া করতে শুনলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اَغِنِّىْ عَلٰى مَا يُنْجِيْنِىْ مِمَّا خَوَّفْتَنِىْ مِنْهُ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ হে আনাস, উযূর পানি রেখে দাও। এই ব্যক্তির কাছে যেয়ে বল আপনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে দোয়া করুন, যাতে আল্লাহ তাঁর অভীষ্ট কাজে সহায়তা করেন। তাঁর উম্মতের জন্যে দোয়া করুন, যাতে তারা নবীর প্রদর্শিত সত্যপথে আমল করে। আনাস বলেন ঃ আমি তাঁর কাছে যেয়ে এই পয়গাম পৌঁছিয়ে দিলাম। তিনি বললেন ঃ তাঁকে মারহাবা এবং খিযিরের সালাম বল। আরও বলে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সকল পয়গম্বরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, যেমন শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন রমযান মাসকে সকল মাসের উপর। আপনার উম্মতকে ফযীলত দিয়েছেন সকল উম্মতের উপর, যেমন ফযীলত দিয়েছেন জুমআর দিনকে সকল দিনের উপর। আমি হযরত খিযিরের কাছ থেকে প্রস্থানোদ্যত হলে তিনি বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الْمَرْحُوْمَةِ الْمَتَابِ عَلَيْهَا

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ আমরা শৈত্য অনুভব করলাম এবং একটি হাত দেখলাম। আমরা আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এটা কেমন শৈত্য এবং এই হাতটি কিসের? তিনি বললেন ঃ তোমরা দেখেছ? আমরা বললাম ঃ হ্যাঁ, দেখেছি। তিনি বললেন ঃ ইনি ছিলেন হযরত ঈসা (আঃ)। তিনি আমাকে সালাম করেছেন।

যুহরী রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) পরওয়ারদেগারের কাছে দোয়া

করলেন ঃ আমাকে আদ সম্প্রদায়ের কাউকে দেখিয়ে দাও। আল্লাহ্ তা'আলা এক ব্যক্তিকে দেখালেন, যার পদদ্বয় মদীনায় এবং মাথা যুলহুলায়ফায় ছিল।

উমাইয়া ইবনে মখশী রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহর (সাঃ) সামনে এক ব্যক্তি খাবার খাচ্ছিল; কিন্তু শুরুতে বিসমিল্লাহ বলল না। খাওয়ার শেষপ্রান্তে পৌঁছে সে বলল ঃ বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখেরাহু" (খাওয়ার শুরুতে ও শেষে বিসমিল্লাহ)। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ লোকটির সাথে শয়তানও খেয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সে যখন বিসমিল্লাহ বলল, তখন শয়তান বমি করে পেটে যা কিছু ছিল, বের করে দিল।

সাহাবীগণের ফেরেশতা দেখা ও তাদের কথা শুনা

বুখারী ও মুসলিম আবূ ওছমান নাহদী থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আগমন করলেন। তখন উম্মে সালামাহ্ (রাঃ) হুযূর (সাঃ)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। জিবারাঈল কথাবার্তা বলে চলে গেলে তিনি উম্মে সালামাহ্ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ লোকটি কে ছিল? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আমার মনে হয় দেহইয়া কলবী ছিলেন। এরপর রসূলুল্লাহর (সাঃ) খোতবা শুনে তিনি জানতে পারলেন যে, আগন্তুক হযরত জিবরাঈল (আঃ) ছিলেন।

বুখারী ও মুসলিম আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, একবার নবী করীম (সাঃ) বাইরে সাহাবীগণের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল ঃ ঈমান কি? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ

اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ -

অর্থাৎ, ঈমান হচ্ছে বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, রসূলগণের প্রতি এবং পুনরুত্থানের প্রতি।

আগন্তুক প্রশ্ন করল ঃ ইসলাম কি? তিনি বললেন ঃ

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَاتُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ -

অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর এবাদত করা, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা এবং রমযানের রোযা রাখা। আগন্তুক আরও প্রশ্ন করল ঃ "ইহসান" কি? তিনি বললেন ঃ

تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك

অর্থাৎ, ইহসান হচ্ছে এমনভাবে আল্লাহর এবাদত করা যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তাঁকে না দেখ, তবে তিনি তো তোমাকে দেখেন। আগন্তক আরও জিজ্ঞেস করল ঃ কিয়ামত কবে হবে? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞেসকারীর চাইতে বেশী কিছু জানে না। তবে আমি কয়েকটি আলামত বলে দিচ্ছি। যখন বাঁদী তার প্রভুকে প্রসব করবে, কাল উটের মালিকরা সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরী করবে। পাঁচটি বিষয় আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আগন্তুক চলে গেলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তাকে ফিরিয়ে আন। সাহাবীগণ অগ্রসর হয়ে কাউকে দেখতে পেলেন না। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ ইনি ছিলেন জিবরাঈল। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তোমাদেরকে ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা দান করতে এসেছিলেন।

তামীম ইবনে সালামাহ রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে পৌছলে এক ব্যক্তি তাঁর কাছ থেকে প্রস্থান করছিল। আমি তাকে পশ্চাতদিক থেকে দেখলাম। সে পাগড়ী পরিহিত ছিল এবং পাগড়ী এক প্রান্ত পেছনে ঝুলন্ত ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! লোকটি কে? তিনি বললেন ঃ ইনি জিবরাঈল (আঃ)।

হারেছা ইবনে নোমান রেওয়ায়েত করেন, আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলাম। তখন তাঁর সাথে জিবরাঈল (আঃ) ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করে চলে গেলাম। ফেরার সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছ? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তিনি ছিলেন জিবরাঈল (আঃ)। তিনি তোমার সালামের জওয়াব দিয়েছিলেন।

হারেছা রেওয়ায়েত করেন, আমি সারা জীবনে জিবরাঈলকে দু'বার দেখেছি।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি আমার পিতা আব্বাসের সাথে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলাম। তিনি এক ব্যক্তির সাথে কানে কানে কথা বলছিলেন। তিনি আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমরা চলে এলাম। আমার পিতা বললেন ঃ বৎস, তুমি তো দেখলে তোমার চাচাত ভাই আমাদের থেকে কিরূপে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি বললাম ঃ তাঁর কাছে এক ব্যক্তি ছিল। তিনি তার সাথে বাক্যালাপে রত ছিলেন। আব্বাস (রাঃ) ফিরে এলেন এবং বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি আবদুল্লাহকে এরূপ বলেছিলাম। সে জওয়াব দিল যে, আপনার কাছে বাস্তবিকই কেউ ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবদুল্লাহ, তুমি লোকটিকে দেখেছ? আমি বললাম ঃ জী হ্যাঁ। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তিনি জিবরাঈল (আঃ) ছিলেন। তার কারণেই আমি তোমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি জিবরাঈল (আঃ)-কে দু'বার দেখেছি এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার জন্যে দু'বার দোয়া করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ আমি জিবরাঈলকে দেখেছি। যে মানুষ জিবরাঈলকে (আঃ) দেখে, সে অন্ধ হয়ে যায়-নবীগণ ছাড়া। তোমার অন্ধত্ব শেষ বয়সে হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) জনৈক অসুস্থ আনসারীকে দেখতে যান। তিনি গৃহের নিকটে পৌঁছে শুনতে পান যে, আনসারী কারও সাথে কথা বলছে। কিন্তু তিনি যখন গৃহের ভেতরে প্রবেশ করলেন, তখন সেখানে অন্য কেউ ছিল না। তিনি আনসারীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কার সাথে কথা বলছিলে? আনসারী আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এক ব্যক্তি এসেছিল। অমিয় বাণী ও সুমিষ্ট ভাষণে আপনার পরই তাঁর স্থান। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ ইনি ছিলেন জিবরাঈল (আঃ)। তোমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহর কসম খেয়ে কোন কথা বললে আল্লাহ অবশ্যই তার কসম পূর্ণ করে দেন।

মোহাম্মদ ইবনে সালামাহ্ রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলাম। তিনি এক ব্যক্তির সাথে কানাকানি করে কথা বলছিলেন। আমি সালাম না করেই ফিরে এলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি সালাম করনি কেন? আমি বললাম ঃ আপনি লোকটির সাথে এমনভাবে কথা বলছিলেন যে, কারও সাথে এমনভাবে বলেন না। তাই আমি আপনার কথাবার্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চাইনি। ইয়া রসূলাল্লাহ! লোকটি কে ছিল? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তিনি জিবরাঈল (আঃ) ছিলেন।

মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদির রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবূ বকরের গৃহে গেলেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন। অতঃপর তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে তাঁর পিতার অসুস্থতার সংবাদ দিলেন। ইতিমধ্যে হযরত আবূবকর (রাঃ) সেখানে এসে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। হযরত আয়েশা বললেন ঃ এই তো আব্বাজান এসে গেছেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) ভেতরে এলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর এত দ্রুত আরোগ্য লাভে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেন ঃ আপনার চলে আসার পর আমি কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমার কাছে জিবরাঈল (আঃ) এলেন এবং চিকিৎসা করলেন। এতেই আমি সুস্থ হয়ে গেলাম।

হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নামায পড়িয়ে চলে গেলেন। আমিও তাঁর পিছে পিছে গেলাম। তাঁর সম্মুখ দিয়ে

এক ব্যক্তি আগমন করল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ লোকটিকে তুমি দেখেছ?

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ সে একজন ফেরেশতা, সে ইতিপূর্বে কখনও মর্ত্যে অবতরণ করেনি। সে পরওয়ারদেগারের অনুমতি নিয়ে এখানে এসেছে। সে আমাকে সালাম করে এই সুসংবাদ দিয়েছে যে, হাসান ও হুসায়ন উভয়েই জান্নাতী যুবকদের নেতা এবং ফাতেমা যাহরা জান্নাতী রমণীদের নেত্রী।

এমরান ইবনে হুসায়ন বলেন ঃ ফেরেশতারা আমাকে সালাম করত। আমি যখন দাগ ব্যবহার করতে শুরু করলাম, তখন তারা সালাম করা বর্জন করল। এরপর আমি যখন দাগের ব্যবহার বর্জন করলাম, তখন ফেরেশতারা পুনরায় আমাকে সালাম করতে লাগল।

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তান বলেন ঃ বসরায় আমাদের কাছে এমরান ইবনে হুসায়নের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তি আগমন করেনি। ত্রিশ বছর অবধি ফেরেশতারা তাকে চতুর্দিক থেকে সালাম করত। কাতাদাহ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ ফেরেশতারা এমরান ইবনে হুসায়নের সাথে মোসাফাহা করত। কিন্তু দাগের ব্যবহার শরু করলে ফেরেশতারা তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেল।

ওরওয়া ইবনে রুয়ায়ম বর্ণনা করেন ঃ এরবায ইবনে সারিয়া রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাহাবীগণের মধ্যে একজন বয়োবৃদ্ধ সাহাবী ছিলেন। তিনি মৃত্যুকে পছন্দ করতেন এবং এই দোয়া করতেন—হে আল্লাহ! আমার বয়স অনেক বেশী হয়ে গেছে। আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে গেছে। অতএব, আমাকে মৃত্যু দিয়ে দাও। এই এরবায বলেন ঃ একবার আমি দামেশকের মসজিদে নামায পড়ছিলাম, এরপর মৃত্যুর দোয়া করছিলাম। এমন সময় একজন সুশ্রী যুবক দৃষ্টিগোচর হল। সে সবুজ রেশমী বস্ত্র পরিহিত ছিল। সে আমাকে শাসনের সুরে বলল ঃ তুমি একি দোয়া কর? আমি বললাম ঃ তা হলে কি দোয়া করব? সে বলল ঃ এই দোয়া কর ঃ

اَللّٰهُمَّ حَسِّنِ الْعَمَلَ وَبَلِّغِ الْاَجَلَ —হে আল্লাহ! আমল সুন্দর কর এবং মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছাও। আমি বললাম ঃ তুমি কে? সে বলল ঃ আমার নাম 'রাছাঈল'। আমি মুমিনদের দুঃখ দূর করি। এরপর যুবক অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাহাবীগণের জিন দেখা ও তাদের কথা শুনা

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ যাকাত লব্ধ খাদ্যশস্যের হেফাযত রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার দায়িত্বে সোপর্দ করেন। এক ব্যক্তি এল এবং

নিজ হাতে খাদ্যশস্য তুলে নিতে লাগল। আমি তাকে হাতে-নাতে ধরে ফেললাম। আমি বললাম ঃ আমি তোকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নিয়ে যাব। সে বলল ঃ হুযূর, আমি গরীব মানুষ। আমার পরিবার-পরিজন ক্ষুধায় কষ্ট করছে। আমি খুবই অভাবী হুযূর! এ কথা শুনে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলাম। তিনি আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবূ হুরায়রা, তোমার রাতের কয়েদী কোথায় গেল? আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! সে কাকুতি-মিনতি করে পরিবারের ক্ষুধার কষ্টের কথা বললে আমি দয়াপরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ সে তোমার সাথে মিথ্যা কথা বলেছে। সে আবার তোমার কাছে আসবে। আমি অপেক্ষায় রইলাম। সে পুনরায় এল এবং খাদ্যশস্য হাতে তুলে নিল। আমি তাকে ধরে ফেললাম। সে বলল ঃ আমাকে ছেড়ে দিন হুযূর। আমি ছা-পোষা মানুষ। আমি আর কখনও আসব না। আমি আবার দয়া পরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার রাতের কয়েদী কোথায় গেল? আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ!-সে নিরতিশয় অভাব-অনটনের কথা বললে আমি দয়ার্দ্র হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ সে মিথ্যা বলেছে। সে তৃতীয়বারও আসবে। আমি আবার অপেক্ষায় রইলাম। সে এল এবং খাদ্যশস্য নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম ঃ আমি তোকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নিয়ে যাব। এ নিয়ে তুই তিনবার এলি। সে বলল ঃ আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে উপকারী কলেমাসমূহ শিখিয়ে দেব। তা এই ঃ আপনি যখন নিদ্রা যেতে চান, তখন 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করুন। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আপনার দেহরক্ষী হবে এবং সকাল পর্যন্ত আপনার কাছে শয়তান আসবে না। আমি সকালে উঠে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এ ঘটনা শুনালাম। তিনি বললেন ঃ তোমার কাছে যে এসেছিল, সে ছিল শয়তান। আয়াতুল কুরসী সম্পর্কে তার কথা ঠিক। কিন্তু সে নিজে মিথ্যুক।

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যাকাতের খেজুর আমার হেফাযতে সোপর্দ করেন। আমি এই খেজুর একটি কক্ষে রেখে দিলাম। কিন্তু প্রত্যহ তাতে কিছু ঘাটতি দৃষ্টিগোচর হত। আমি একথা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জানালে তিনি বললেন ঃ এটা শয়তানের কাজ। তুমি তাকে ধরার চেষ্টা কর। সেমতে আমি রাতে অপেক্ষায় রইলাম। কিছু রাত অতিবাহিত হলে শয়তান এল এবং দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। সে খেজুর নিতে লাগল। আমি কাপড় দিয়ে তার কোমর বেঁধে ফেললাম এবং বললাম, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু

ওয়া রাসূলুহ্, হে আল্লাহর দুশমন, তুই যাকাতের খেজুর খাচ্ছিস? অথচ অন্যরা এর বেশী হকদার। সকালে আমি তোকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নিয়ে যাব। সে বলল ঃ আমি আর আসব না। আমি সকালে রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ তোমার রাতের কয়েদী কোথায়? আমি বললাম ঃ সে আর আসবে না বলে ওয়াদা দিয়েছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ সে আবার আসবে। তুমি তার অপেক্ষায় থাক। সেমতে দ্বিতীয় রাতে আমি তার অপেক্ষায় রইলাম। সে এল এবং প্রথম রাতের মত করল। আমিও প্রথম রাতের মতই করলাম। সকালে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে খবর দিলে তিনি বললেন ঃ আবার আসবে। সেমতে তৃতীয় রাতেও সে এলে আমি তাকে বললাম ঃ হে আল্লাহর দুশমন! তুই আমার সাথে দু'বার ওয়াদা করেছিস। এটা তৃতীয় বার। সে বলল ঃ আমি দরিদ্র ছা-পোষা। নসীবাইন থেকে এসেছি। এই খেজুর ছাড়া অন্য কিছু সহজলভ্য হলে আমি এখানে আসতাম না। আমরা এ শহরেই বাস করতাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রেরিত হওয়ার পর যখন তাঁর উপর দু'টি আয়াত নাযিল হল, তখন আমরা এ শহর ত্যাগ করে নসীবাইনে বসতি স্থাপন করলাম। এই আয়াতদ্বয় যে গৃহে পাঠ করা হয়, সেখানে শয়তান প্রবেশ করে না। আমাকে ছেড়ে দিলে আমি আয়াতদ্বয় আপনাকে শিখিয়ে দেব। আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, আমি তোকে ছেড়ে দিচ্ছি। সে বলল ঃ আয়াতদ্বয়ের একটি হচ্ছে 'আয়াতুল কুরসী'। অপরটি সূরা বাকারার আমানার রাসূলু থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াত। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে এ ঘটনা রসূলুল্লাহর (সাঃ) গোচরীভূত করলে তিনি বললেন ঃ তার কথা সত্য কিন্তু সে নিজে মিথ্যাবাদী।

হযরত বুরায়দা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমার কাছে কিছু খাদ্যশস্য ছিল। এতে ঘাটতি দেখা দিল। এক রাতে আমার সামনে এক পেত্নী এই খাদ্যশস্যের উপর নামল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম ঃ আমি তোকে ছাড়ব না। রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নিয়ে যাব। সে বলল ঃ আমি অধিক ছা-পোষা নারী। আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আর আসব না। সে কসমও খেল। আমি ছেড়ে দিলাম। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এ ঘটনা শুনালে তিনি বললেন ঃ সে মিথ্যুক। পেত্নী আবার এল এবং পূর্বে যা বলেছিল, তাই বলল। আমি আবার ছেড়ে দিলাম। এভাবে তৃতীয়বার আসার পর আমি তাকে ধরে ফেললাম। সে বলল ঃ আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে এমন বিষয় শিখিয়ে দেব, যা পাঠ করলে আমাদের কেউ তোমার কাছে আসবে না। যখন তুমি নিদ্রা যাও, তখন নিজ জানমালের হেফাযতের জন্যে আয়াতুল কুরসী পাঠ কর। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আমি এ বিষয়ে অবগত করলে তিনি বললেন ঃ সে আয়াতুল কুরসী সম্পর্কে ঠিকই বলেছে, কিন্তু সে নিজে মিথ্যুক।

আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গ লাভ করে আমি মানুষ ও জিনদের সাথে লড়াই করেছি। রাবী বলেন ঃ আমরা প্রশ্ন করলাম ঃ আপনি জিনদের সাথে কিরূপে লড়াই করলেন? তিনি বললেন ঃ একবার আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে এক জায়গায় অবতরণ করলাম। আমি পানি আনার জন্যে বালতি ও মশক হাতে নিলাম। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমার কাছে কেউ আসবে এবং তোমাকে পানি আনতে বাধা দেবে। কূপের ধারে পৌঁছে আমি জনৈক কৃষ্ণকায় ব্যক্তিকে দেখলাম। তাকে খুব যুদ্ধবাজ মনে হচ্ছিল। সে বলল ঃ অদ্য তুমি এই কূপ থেকে এক বালতি পানিও উঠাতে পারবে না। আমি তখনই তাকে ধরে ভূতলশায়ী করে দিলাম। এরপর একটি পাথর নিয়ে তার নাক ও মুখ ভেঙ্গে দিলাম। এরপর মশক ভর্তি করে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে চলে এলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে কেউ এসেছিল? আমি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন ঃ সে শয়তান।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। জনৈক কুৎসিত চেহারার লোক এল। তার পোশাক-আশাক খুব হীন ও দুর্গন্ধযুক্ত ছিল। উলঙ্গ পায়ে মজলিসের লোকদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে অগ্রসর হয়ে একেবারে রসূলুল্লাহর (সাঃ) সামনে বসে গেল। সে এসেই জিজ্ঞেস করল ঃ আপনার সৃষ্টিকর্তা কে? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা। প্রশ্ন ঃ পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? উত্তর ঃ আল্লাহ তা'আলা। প্রশ্ন ঃ আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? এ প্রশ্ন শুনে হুযূর (সাঃ) 'সোবহানাল্লাহ' বললেন এবং কপালে হাত রেখে মাথা নত করে নিলেন। লোকটি উঠে চলে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাথা তুলে বললেন ঃ লোকটিকে ফিরিয়ে আন। আমরা অনেক তালাশ করলাম; কিন্তু সে এমন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, যেন আসেইনি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ সে ছিল বিতাড়িত ইবলীস। তোমাদের ধর্ম বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে এসেছিল।

নাজ্জাশীর ইন্তেকালের সংবাদ প্রদান

বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, যে দিন আবিসিনিয়ার মুসলিম সম্রাট ইন্তেকাল করেন, সে দিনই রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ সাহাবায়ে-কেরামকে শুনিয়ে দেন। তিনি তাদেরকে নামায পড়ার জায়গায় নিয়ে যান এবং সারিবদ্ধ করেন। অতঃপর চার তাকবীর বলে গায়েবানা নামাযে জানাযা আদায় করেন। হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ অদ্য কৃতীপুরুষ 'আসহামা' মৃত্যুবরণ করেছেন। তোমরা তাঁর জানাযার নামায পড়।

বায়হাকী উম্মে কুলছূম থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উম্মে সালামাহকে বিয়ে করে বললেন ঃ আমি মেশক ও বস্ত্রজোড়া নাজ্জাশীর কাছে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেছি। কিন্তু আমার মনে হয় সে মারা গেছে এবং উপহার ফেরত আসবে। সেমতে তিনি যা বললেন, তাই হল। নাজ্জাশীর মৃত্যু হল এবং উপহার ফেরত এল। বায়হাকী বলেন ঃ এই রেওয়ায়েতে উল্লিখিত রসূলুল্লাহর (সাঃ) উক্তি নাজ্জাশীর ওফাতের পূর্বেকার। কিন্তু যে দিন নাজ্জাশী মারা যান, সে দিনই তিনি তার ইন্তেকালের সংবাদ দিয়ে দেন এবং তার গায়েবানা নামাযে জানাযা আদায় করেন।

জাদুর জ্ঞান হওয়া

যায়দ ইবনে আরকাম রেওয়ায়েত করেন, জনৈক আনসারী রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে যাতায়াত করত। তিনি তাকে বিশ্বস্ত মনে করতেন এবং তার উপর ভরসা করতেন। এই ব্যক্তিই তাঁর জন্যে জাদুর গ্রন্থি লাগায় এবং তা কূপে নিক্ষেপ করে। ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর কাছে দু'জন ফেরেশতা আসে এবং বলে দেয় যে, অমুক ব্যক্তি গ্রন্থি লাগিয়ে কূপে ফেলে দিয়েছে। এই গ্রন্থির জাদুর প্রভাবে কূপের পানি হলদে হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একজন সাহাবীকে সেই কূপে পাঠালেন। তিনি সেখান থেকে গ্রন্থিসমূহ উদ্ধার করলেন এবং দেখলেন যে, পানি হলদে হয়ে গেছে। রাবী বললেন ঃ এ ঘটনার পরও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর কাছে এর উল্লেখ করলেন না এবং কোন শাস্তিও দিলেন না।

বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর উপর জাদু করা হয়। ফলে তাঁর অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, যে কাজ তিনি করেননি, সেই কাজ সম্পর্কেও মনে করতেন যে, কাজটি করেছেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করলেন এবং বললেন ঃ এখন আমি জানতে পেরেছি। আমি আল্লাহর কাছে পরামর্শ চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন। আমার কাছে দু'ব্যক্তি এসে একজন তার সঙ্গীকে বলল ঃ তাঁর অসুখটা কি? সঙ্গী বলল ঃ তাঁর উপর জাদু করা হয়েছে। সে বলল ঃ কে জাদু করেছে? উত্তর ঃ লবীদ ইবনে আ'সাম।

প্রশ্ন ঃ কিসের মধ্যে জাদু করেছে? উত্তর ঃ চিরুনিতে, চিরুনিতে আটকে থাকা চুলে এবং পুং খেজুর বৃক্ষের কুঁড়ির গেলাফে জাদু করেছে। প্রশ্ন ঃ চিরুনি ইত্যাদি কোথায়? উত্তর ঃ যরদান কূপে আছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সেই কূপে এসে বললেন ঃ এ কূপটিই আমাকে দেখানো হয়েছে। অতঃপর তাঁর নির্দেশে কূপ থেকে এসব বস্তু বের করা হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কঠিন রোগাক্রান্ত হলেন। দু'জন ফেরেশতা তাঁর কাছে এল। একজন অপরজনকে প্রশ্ন করল ঃ তোমার কি মনে হয়? উত্তর ঃ মনে হয় জাদু করা হয়েছে। প্রশ্ন কে জাদু করেছে? উত্তর ঃ ইহুদী লবীদ আ'সাম। প্রশ্ন ঃ জাদু করা বস্তু কোথায়? উত্তর ঃ অমুক গোত্রের কূপে একটি পাথরের নীচে। কূপের সমস্ত পানি বের করে পাথরটি উদ্ধার কর। অতঃপর দাফন করা চিত্র বের করে জ্বালিয়ে দাও। প্রত্যুষে রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদল লোকের সঙ্গে আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে কূপের ধারে পাঠালেন। তারা দেখলেন যে, কূপের পানি মেহেন্দী ভিজানো পানির মত হয়ে গেছে। তারা সমস্ত পানি তুলে একটি বড় পাথর তুললেন এবং তার নীচ থেকে দাফন করা চিত্র বের করে জ্বালিয়ে দিলেন। চিত্রের মধ্যে ধনুকের একটি রশিতে এগারটি গ্রন্থি ছিল। এ সময়েই রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রতি সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল হয়। একটি সূরা পাঠ করতেই একটি গ্রন্থি খুলে গেল।

আবদুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালেক রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) উপর আ'সামের কন্যা ও লবীদের ভগিনীরা জাদু করেছিল। লবীদ এই জাদুর সামগ্রী নিয়ে কূপের অভ্যন্তরে পাথরের নীচে চাপা দিয়ে রেখেছিল। আ'সামের এক কন্যা বলেছিল যদি তিনি সত্যিকার নবী হন, তবে জাদুর কথা জানতে পারবেন। আর নবী না হলে এই জাদুর প্রতিক্রিয়ায় উন্মাদ হয়ে যাবেন এবং জ্ঞানবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীকে এই জাদু সম্পর্কে জ্ঞাত করে দেন।

ইবনে সা'দ আমর ইবনে হাকাম থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর উপর মহররম মাসে তখন জাদু করা হয় যখন তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধি সমাপ্ত করে প্রত্যাবর্তন করছিলেন।

ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর খুলে যাওয়ার সংবাদ

বুখারী ও মুসলিম উম্মুল মুমিনীন যয়নব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলেন। তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম ছিল এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ উচ্চারণ করছিলেন। তিনি বলতে লাগলেন ঃ আরবের জন্যে বিপদ আসন্ন হয়ে গেছে। এজন্যে আফসোস। আজ ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে এই বৃত্তের পরিমাণে ফাটল দেখা দিয়েছে। তিনি একটি বৃত্ত বানিয়ে দেখালেন।

মানুষের মনের চিন্তাভাবনা বলে দেয়া

সালামাহ ইবনে আকওয়া রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে ছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কে? তিনি বললেন ঃ আমি নবী। সে প্রশ্ন করল ঃ কিয়ামত কবে হবে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এটা অদৃশ্যের বিষয়, যা কেবল আল্লাহ তা'আলাই জানেন। লোকটি বলল ঃ আমাকে আপনার তলোয়ারটি দেখান। তিনি তলোয়ার তাকে দিলেন। সে তলোয়ারটি নাড়াচাড়া করে ফিরিয়ে দিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি যে ইচ্ছা করেছিলে, তার ক্ষমতা তোমার নেই। সে বলল ঃ আমার তাই ইচ্ছা ছিল। তিবরানীর রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ লোকটির মনে ছিল যে, সে আমার তলোয়ার নিয়ে আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু তা সে পারল না।

ওয়াবেসা আসাদী রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে 'বির' (সৎকর্ম) ও 'ইছম' (পাপকর্ম) সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্যে হাযির হলাম। তিনি বললেন ঃ হে ওয়াবেসা, তুমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্যে এসেছ, আমি তোমাকে তা বলে দিচ্ছি। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! বলুন। তিনি বললেন ঃ তুমি সৎকর্ম ও পাপকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছ। আমি বললাম ঃ আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন— আমি এজন্যই এসেছি। অতঃপর তিনি বললেন ঃ 'বিরর' সেই কাজ, যে কাজে তোমার বক্ষ উন্মুক্ত থাকে, কোনরূপ সন্দেহের কাঁটা অনুভূত হয় না। আর 'ইছম' সেই কাজ, যে কাজে তোমার মনে খট্‌কা থাকে যদিও মানুষ তোমাকে (জায়েয বলে) ফতোয়া দিয়ে দেয়।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে ছিলাম। তাঁর খেদমতে দু'ব্যক্তি উপস্থিত হল। তাদের একজন ছিল আনসারী, অপরজন ছকফী। তারা কিছু জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছকফীকে বললেন ঃ তুমি প্রশ্ন কর। আর যদি চাও, তবে আমি বলে দেই তুমি কি প্রশ্ন করতে এসেছ। ছকফী বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি বলুন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি নামায, রুকূ, সেজদা, রোযা এবং জানাবতের গোসল সম্পর্কে জানতে এসেছ। সে বলল ঃ সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি এসব বিষয়েই জ্ঞানার্জন করতে এসেছি। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) আনসারীকে বললেন ঃ তুমিও প্রশ্ন কর। তুমি চাইলে আমি তোমার প্রশ্নও বলে দিতে পারি। আনসারী বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! বলুন। তিনি

বললেন ঃ তুমি এসেছ একথা জানতে যে, গৃহ থেকে বায়তুল্লাহর নিয়তে বের হলে তার কি ছওয়াব? তুমি আরও জানতে চাও যে, আমি আরাফাতে অবস্থান করব, মাথা মুন্ডন করব, তওয়াফ করব এবং কংকর নিক্ষেপ করব কি না? আনসারী বলল ঃ সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন–আমি একথাই জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম।

ওকফা ইবনে আমের জুহানী রেওয়ায়েত করেন, কয়েকজন ইহুদী আগমন করল। তাদের সাথে তাদের ধর্মগ্রন্থ ছিল। তারা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল। আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁকে জ্ঞাত করলাম। তিনি বললেন ঃ তাদের সাথে আমার সাক্ষাতে লাভ কি? তারা আমাকে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করতে চায়, যা আমি জানি না। আমি একজন বান্দা। আমি কেবল তাই জানি, যা আমার রব আমাকে বলে দেন। এরপর তিনি ওযূ করে মসজিদে এলেন। অতঃপর দু'রাকআত নামায পড়ে প্রফুল্ল মনে মসজিদের বাইরে এলেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডলে আনন্দের চিহ্ন প্রস্ফুটিত ছিল। তিনি বললেন, তাদেরকে আমার কাছে পাঠাও। তারা এলে তিনি বললেন ঃ তোমরা ইচ্ছা করলে যে কথা জিজ্ঞেস করতে তোমরা এসেছ, তা আমি বলে দেই। তারা বলল ঃ হ্যাঁ, আমাদের ইচ্ছা তাই। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা আমার কাছে যুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে এসেছ।

যুলকারনাইন একজন রোমক ছিল। সে সম্রাট হয়ে গেল। সে দিগ্বিজয়ে বের হয়ে অবশেষে মিসরের উপকূলে উপস্থিত হল। সে একটি শহর নির্মাণ করল, যার নাম আলেকজান্দ্রিয়া। শহরের নির্মাণ সমাপ্ত হলে আল্লাহ তা'আলা তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা একে নিয়ে আকাশে আরোহণ করল। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল পর্যন্ত উঁচুতে উঠে ফেরেশতা বলল ঃ নীচে দেখ, কি আছে? যুলকারনাইন বলল ঃ দু'টি শহর দেখা যাচ্ছে। ফেরেশতা তাকে আরও উপরে নিয়ে গেল এবং বলল ঃ নীচে কি আছে? সে বলল ঃ কিছুই দেখা যায় না। ফেরেশতা বলল ঃ যে দু'টি শহর দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, সেটা শহর নয়, মহাসাগর। আল্লাহ তা'আলা তোমার পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তুমি সে পথে চলবে। মূর্খকে জ্ঞান শিখাবে এবং জ্ঞানীকে জ্ঞানের উপর দৃঢ় রাখবে। এরপর ফেরেশতা যুলকারনাইনকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিল। সে দু'পাহাড়ের মধ্যস্থলে প্রাচীর নির্মাণ করেছিল। এরপর ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ করেছিল। সে এক সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হয়েছিল, যাদের চেহারা ছিল কুকুরের মত। এরপর আরও এক সম্প্রদায়ের কাছে গমন করেছিল। ইহুদীরা এই বিবরণ শুনে বলল ঃ আমাদের কিতাবাদিতে এরূপই বলা হয়েছে।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার পিতা আমার ধনসম্পদ নিয়ে যেতে চায়। হুযূর (সাঃ) তার পিতাকে ডাকলেন। ইতিমধ্যে জিবরাঈল (আঃ) এসে বললেন ঃ এই বৃদ্ধ মনে মনে কিছু বলেছে, যা মুখে উচ্চারণ করেনি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি মনে মনে কি বলেছ? সে বলল ঃ আল্লাহ তা'আলা আপনার কারণে আমাদের অন্তর্জ্ঞান ও বিশ্বাস বৃদ্ধি করে দেন। আমি অবশ্যই কিছু বলেছি। অতঃপর সে এই কবিতা আবৃত্তি করল ঃ

শৈশবে তোর লালন-পালন করেছি।
যৌবনে, তোর সাথে আশা আকাঙ্খা জড়িত করেছি।
তোকে সর্বপ্রকারে সিক্ত ও নিদ্রাতৃপ্ত করেছি।
যখন তুই রুগ্ন হতিস, তখন তোর রোগের কারণে
রাত্রি কঠিন হয়ে যেত।
আমি অশান্ত ও অস্থির হয়ে
রাত্রি অতিবাহিত করতাম।
তোর বিনাশের কথা ভেবে আমার মন ভীত থাকত। অথচ
আমি জানি মৃত্যু একদিন না একদিন আসবেই।
তোর অসুখ-বিসুখ আসলে আমার উপর চড়াও হত।
আমার চক্ষু থেকে দরদর অশ্রু প্রবাহিত হত।
যখন তুই যৌবনে উত্তীর্ণ হলি এবং আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার
চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হলি, তখন রূঢ়া ভাষা ও
অসৎ আচরণ দ্বারা আমাকে প্রতিদান দিলি যেন এ যাবত তুই-ই আমাকে
স্নেহ-মমতা ও অর্থসম্পদ দিয়ে বড় করেছিস।
তুই পিতৃত্বের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখিস না। হায়,
তুই যদি একজন পড়শীর মতই আচরণ করতি!

এই কবিতা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) অশ্রুসজল হয়ে গেলেন। তিনি বৃদ্ধের পুত্রকে ধরে বললেন ঃ তুমি এবং তোমার ধনসম্পদ সবই তোমার পিতার।
হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার খাদ্যাভাবে আমরা ক্ষুধায় এমন কাতর হয়ে পড়লাম যে, ইতিপূর্বে কখনও এরূপ হইনি। আমার ভগিনী বলল ঃ তুমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে যেয়ে আমাদের এ অবস্থা বল। সেমতে আমি তাঁর কাছে এলাম। তিনি তখন খোতবা দিচ্ছিলেন। খোতবায় তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি সাধুতা কামনা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সাধুতা দিবেন। আর যে ধনাঢ্যতা অন্বেষণ করবে, আল্লাহ তাকে ধনী করে দেবেন।

একথা শুনে আমি মনে মনে বললাম ঃ এ উক্তি আমার ক্ষেত্রেই খাটে। এখন আমি তাঁর কাছে কোন সওয়াল করব না। ভগিনীর কাছে ফিরে এসে আমি তাকে একথা বললাম। সে বলল ঃ তুমি ভালই করেছ। পরদিন আমি এক দুর্গের নীচে মজুরী শুরু করলাম এবং কয়েক দেরহাম উপার্জন করলাম। এগুলো দিয়ে খাদ্য ক্রয় করে খেলাম। এরপর থেকে দুনিয়ার ধনদৌলত যেন আমার হাতে এসে গেল। আমার চেয়ে অধিক ধনশালী কোন আনসারী পরিবার রইল না।

মুনাফিকদের খবর দেয়া

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) খোতবায় বললেন ঃ মুসলমানগণ, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মুনাফিক। আমি যে মুনাফিকের নাম বলি, সে যেন দাঁড়িয়ে যায়। অতঃপর তিনি এক একজন মুনাফিকের নাম বলতে বলতে ছাব্বিশ জনের নাম বললেন।

ছাবেতুল বনানী রেওয়ায়েত করেন, মুনাফিকরা এক জায়গায় সমবেত হয়ে পরস্পরে আলাপ-আলোচনা করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমাদের অনেক ব্যক্তি সমবেত হয়ে এমন এমন কথাবার্তা বলেছে। তোমরা উঠ এবং আল্লাহর কাছে তওবা ও এস্তেগফার কর। আমিও তোমাদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করব। কিন্তু মুনাফিকরা উঠল না। তিনি একথা তাদেরকে তিনবার বললেন। অতঃপর বললেন ঃ আমি তোমাদের নাম নিয়ে ডাকছি। এখন তোমরা উঠ। অতঃপর তিনি তাই করলেন। মুনাফিকরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় মুখ ঢেকে দাঁড়াল।

আবূ দারদার ইসলাম গ্রহণের খবর

জুবায়র ইবনে নুযায়র রেওয়ায়েত করেন ঃ আবূ দারদা প্রতিমা পূজা করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এবং মোহাম্মদ ইবনে সালামাহ্ তার গৃহে যেয়ে তার প্রতিমাগুলো ভেঙ্গে দিলেন। আবূ দারদা গৃহে ফিরে এসে প্রতিমাগুলোর ভগ্নদশা দেখে বললেন ঃ তোমরা নিজেদের প্রতিরক্ষাও করলে না? অতঃপর তিনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে পৌছলেন। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা তাকে আসতে দেখে বললেন ঃ মনে হয় সে আমাদের খোঁজে আসছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন-ঃ সে তোমাদের খোঁজে আসছে না; বরং ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে আসছে। কেননা, আবূ দারদা ইসলাম গ্রহণ করবে বলে আমার রব আমার সাথে ওয়াদা করেছেন।

সেই ব্যক্তির খবর, যে পথিমধ্যে বালিকার প্রতি হাত বাড়িয়েছিল

আবূ হায়ছাম রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি মদীনার পথে এক বালিকাকে দেখে তার কোমরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। পরদিন কিছু লোক বয়াতের জন্যে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এলে আমিও আপন হাত বয়াতের জন্যে বাড়িয়ে দিলাম। বললাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে বয়াত করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি তো কাল আপন হাত বালিকার দিকে বাড়িয়েছিলে। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে বয়াত করুন। আল্লাহর কসম, আমি সারাজীবন এরূপ কাজ কখনও করব না। তিনি বললেন ঃ আমি তোমার বয়াত কবুল করছি।

অন্যায়ভাবে নেওয়া ছাগলের সংবাদ

বায়হাকী জনৈক আনসারী থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ জনৈক মহিলা রসূলে করীম (সাঃ)-কে দাওয়াত করল। খাবার পেশ করা হলে তিনি এক লোকমা মুখে দিয়ে চর্বণ করতে লাগলেন, অতঃপর বললেন ঃ এটা সেই ছাগলের গোশত, যা অন্যায়ভাবে নেওয়া হয়েছে। মহিলাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল ঃ তার প্রতিবেশিনী এই ছাগলটি তার স্বামীর অনুমতি ছাড়াই প্রেরণ করেছিল।

হযরত জাবের রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ এক মহিলার কাছ দিয়ে গমন করেন। মহিলা তাদের জন্যে একটি ছাগল যবেহ করে খাবার প্রস্তুত করল। তিনি এক লোকমা মুখে দিলেন; কিন্তু গলাধকরণ করতে পারলেন না। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এ ছাগলটি অনুমতি ছাড়াই গ্রহণ করা হয়েছে। মহিলা বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! মুয়ায পরিবারের লোকদের সাথে আমাদের কোন লৌকিকতা নেই। আমরা তাদের বস্তু নিয়ে নেই এবং তারা আমাদের বস্তু নিয়ে নেয়।

এক চোরের খবর

হারেছ ইবনে হাতেব রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) আমলে এক ব্যক্তি চুরি করল। তাকে পাকড়াও করে হুযুর (সাঃ)-এর কাছে আনা হলে তিনি বললেন ঃ একে হত্যা কর। আরয করা হল, সে কেবল চুরি করেছে (হত্যাযোগ্য অপরাধ করেনি)। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তার হাত কেটে ফেল। এরপর লোকটি পুনরায় চুরি করলে তার দ্বিতীয় হাতও কাটা হল। এরপর সে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে চুরি করলে তার একটি পা কেটে দেওয়া হল। সে চতুর্থবার চুরি করলে তার দ্বিতীয় পাও কেটে দেয়া হল। চার হাত-পা

কর্তিত হওয়ার পর সে পঞ্চমবার চুরি করল। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার বেহায়াপনা সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন। তাই প্রথমেই তাকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং এখন তাকে নিয়ে যাও এবং হত্যা কর। সেমতে তাই করা হল।

সেই মহিলার খবর, যে রোযা রাখত এবং গীবত করত

আবুল বুখতারী রেওয়ায়েত করেন ঃ জনৈকা কটুভাষিণী মহিলা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আগমন করে। রাতের বেলায় তিনি তাকে খাওয়ার জন্যে ডাকলেন। সে বলল ঃ আমি রোযাদার ছিলাম। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমার রোযা ছিল না। পরদিন সে তার জিহ্বাকে কিছুটা সংযত করল। হুযূর (সাঃ) তাকে খাওয়ার জন্যে ডাকলে সে বলল ঃ আমি রোযাদার ছিলাম। তিনি আবার বললেন ঃ তোমার রোযা ছিল না। পরের দিন সে তার রসনাকে পূর্ণরূপে সংযত রাখল। সন্ধ্যায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে খাওয়ার জন্যে ডাকলে সে বলল ঃ অদ্য আমি রোযাদার ছিলাম। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ হ্যাঁ, আজ তুমি রোযা রেখেছ।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) রোযা রাখার আদেশ দিলেন এবং বললেন ঃ আমি অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত কেউ ইফতার করবে না। সকলেই রোযা রাখল। সন্ধ্যা হলে প্রত্যেক ব্যক্তি আসত এবং বলত ঃ ইয়া রসূল্লাহ, আমি রোযাদার ছিলাম। আপনি আমাকে ইফতারের অনুমতি দিন। হুযূর (সাঃ) তাকে অনুমতি দিয়ে দিতেন। এরপর এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ আপনার পরিবারের দু'জন মহিলা রোযা রেখেছিল। তারা আপনার কাছে আসতে লজ্জাবোধ করে। আপনি তাদেরকে ইফতারের অনুমতি দিন। হুযূর (সাঃ) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি আবার আরয করল। তিনি আবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তৃতীয়বারের পর হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তারা রোযা রাখেনি। যারা মানুষের গোশ্‌ত খায়, তাদের আবার রোযা কিসের? তুমি তাদের কাছে যেয়ে বল, তোমরা রোযা রেখে থাকলে বমি করে দাও। মহিলাদ্বয়কে একথা বলা হলে তারা বমি করল। বমির সাথে জমাট রক্ত বের হল। লোকটি এসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এ সংবাদ দিলে তিনি বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যার কব্জায় আমার প্রাণ, এই জমাট রক্ত তাদের পেটে থেকে গেলে অগ্নি তাদেরকে খেয়ে ফেলত।

নবী করীম (সাঃ)-এর গোলাম ওবায়দ বর্ণনা করেন ঃ দু'জন মহিলা রোযা রাখল। এক ব্যক্তি বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! দু'জন মহিলা রোযা রেখেছে। এখন

পিপাসায় তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তাদেরকে ডেকে আন। তারা এলে একটি বড় পেয়ালা আনা হল। হুযূর (সাঃ) একজনকে বললেন ঃ এতে বমি কর। সে পুঁজ, গোশত ও কিছু রক্ত বমি করল। এতে পেয়ালা অর্ধেক ভরে গেল। অতঃপর অপরজনকেও বমি করতে বললেন। সে-ও পুঁজ, গোশত ও রক্ত বমি করল এবং পেয়ালা ভরে গেল। অতঃপর হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এরা উভয়েই আল্লাহর হালাল করা বস্তু খেয়ে রোযা রেখেছে এবং হারাম করা বস্তু দিয়ে ইফতার করেছে। তারা পাশাপাশি বসে মানুষের গোশত খেয়েছে; অর্থাৎ গীবত করেছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে বসা অবস্থায় এক মহিলা সম্পর্কে বললাম, তার অঞ্চল বেশ দীর্ঘ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ থুথু ফেল, থুথু ফেল। আমি মুখ থেকে রক্ত পিন্ডের থুথু ফেললাম।

যায়দ ইবনে ছাবেত রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) সাহাবীগণের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। অতঃপর তিনি উঠে গৃহে চলে গেলেন। তাঁর কাছে উপহার স্বরূপ গোশত এসেছিল। কিছু লোকে বলল ঃ যায়দ তুমি হুযূর (সাঃ)-এর কাছে যেয়ে আবেদন করলে ভাল হত যে, সমীচীন মনে করলে আমাদেরকেও কিছু গোশত দান করতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যায়দকে বললেন ঃ তুমি তাদের কাছে যেয়ে বল যে, তারা তোমার চলে আসার পর গোশত খেয়ে ফেলেছে। যায়দ এসে তাদেরকে একথা বললেন। তারা বলল ঃ আমরা তো গোশত খাইনি! অতঃপর তারা হুযূর (সাঃ)-এর কাছে চলে এল। তিনি বললেন ঃ তোমাদের দাঁতে আমি যায়দের গোশতের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। সকলেই বলল ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাদের জন্যে দোয়া করুন। হুযূর (সাঃ) তাদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করলেন।

হযরত আনাস রেওয়ায়েত করেন ঃ আরবে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, সফরে একে অন্যের সেবাযত্ন করত। এক সফরে এক ব্যক্তি হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর সেবা করছিল, এমন সময় তারা উভয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন। জাগ্রত হয়ে দেখলেন যে, লোকটি তাদের জন্যে খাবার প্রস্তুত করেনি। তারা বললেন ঃ এতো খুব ঘুমায়। অতঃপর লোকটিকে জাগ্রত করে বললেন ঃ তুমি হুযূর (সাঃ)-এর কাছে যাও এবং তাকে আবূ বকর ও ওমরের সালাম বলে খাবার নিয়ে আস। রসূলুল্লাহ (সাঃ) পয়গাম শুনে বললেন ঃ তারা উভয়েই খাবার খেয়ে নিয়েছে। একথা শুনে তারা উভয়েই এলেন এবং বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা কি খাবার খেয়েছি? তিনি বললেন ঃ আপন ভাইয়ের

গোশত। সেই সত্তার কসম, যার কব্জায় আমার প্রাণ, আমি তার গোশত তোমাদের সামনের দাঁতে দেখতে পাচ্ছি। তারা উভয়েই আরয করলেন ঃ আপনি আমাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করুন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা সেই লোকটিকে মাগফেরাতের দোয়া করতে বল।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য বিষয়সমূহের সংবাদ প্রদান করেছেন।

বুখারী ও মুসলিম অন্য সনদে হুযায়ফা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) আমাদের মধ্যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সেইসব বিষয় বর্ণনা করলেন ঃ যেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে। যে স্মরণ রেখেছে, সে স্মরণ রেখেছে, আর যে ভুলে গেছে, সে ভুলে গেছে। তাঁর বর্ণিত বিষয়সমূহের মধ্যে যখন আমি কোন একটি ভুলে যাই, তখন সেটি দেখা মাত্রই মনে পড়ে যায়, যেমন ভুলে যাওয়া মানুষ সামনে এলে মনে পড়ে যায়।

মুসলিম আবু যায়দ থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ালেন। অতঃপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করে যোহর পর্যন্ত খোতবা দিলেন। মিম্বর থেকে নেমে তিনি যোহরের নামায আদায় করলেন। এরপর আবার সূর্যাস্ত পর্যন্ত খোতবা দিলেন। এই সুদীর্ঘ খোতবায় তিনি অতীত ঘটনাবলী এবং কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য বিষয়াবলী বর্ণনা করলেন। যে অধিক মনে রাখতে পেরেছে, সে অধিক জ্ঞানী।

হযরত ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন– আমার জন্যে বিশ্বকে তুলে ধরা হয়েছে। আমি বিশ্বকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য বিষয়সমূহকে এমনভাবে দেখেছি, যেমন আমার হাতের তালু দেখি। অতীত নবীগণের অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর সামনে ভবিতব্যকে উদঘাটিত করে দিয়েছেন।

সামরাহ ইবনে জুনদুব রেওয়ায়েত করেন ঃ সূর্যগ্রহণ হল। নবী করীম (সাঃ) সূর্যগ্রহণের নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি নামাযে তোমাদের সেই সব বিষয় প্রত্যক্ষ করেছি, ভবিষ্যতে তোমরা যেগুলোর সম্মুখীন হবে।

উম্মতের স্বাচ্ছন্দ্যের খবর

আবূ সায়ীদ থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন—দুনিয়া সুমিষ্ট ও শস্যশ্যামল। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দুনিয়াতে

খলীফা করবেন এটা দেখার জন্যে যে, তোমরা কিরূপ আমল কর। তোমরা দুনিয়া এবং নারী থেকে বেঁচে থাক। কেননা, বনী ইসরাঈলের প্রথম ফেতনা বা গোলযোগ নারীদের মধ্যে ঘটেছিল।

আমর ইবনে আওফ রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের জন্যে দারিদ্র্যের ভয় করি না; কিন্তু আমার আশংকা হয় যে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ তোমাদের মধ্যেও ধনসম্পদের প্রাচুর্য না হয়ে যায়। তারা যেমন ধনসম্পদকে ভালবেসেছিল, তোমরাও তেমনি ধনসম্পদের মোহে না পড়ে যাও। ধনসম্পদ তাদেরকে যেমন ক্রীড়া ও অনবধানতার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল, তোমাদেরকেও তেমনি অনবধানতার মধ্যে ফেলে না দেয়।

বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে জাবের (রাঃ) বলেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের কাছে নকশাযুক্ত ফরশ আছে কি? আমি বললাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! নকশাযুক্ত ফরশ আমাদের কাছে কোথেকে আসবে? তিনি বললেন ঃ তোমাদের কাছে নকশাযুক্ত ফরশ থাকবে। জাবের বলেন ঃ এখন আমি আমার পত্নীকে বলি, এই নকশাযুক্ত ফরশ দূরে সরাও। কিন্তু সে জওয়াব দেয়, কেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ই তো বলেছিলেন, তোমাদের কাছে নকশাযুক্ত ফরশ থাকবে।

তালহা নযরী রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির কাছে সকালে একটি বড় পিয়ালা আসবে এবং সন্ধ্যায় একটি বড় পিয়ালা আসবে। তোমরা কা'বার পর্দার অনুরূপ পোশাক পরবে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আজিকার দিনে আমরা উত্তম, না সেদিন উত্তম হব? তিনি বললেন ঃ তোমরা আজকার দিনে উত্তম। এখন তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক মহব্বত আছে। তখন তোমরা পরস্পরে শত্রুতা করবে এবং একে অপরের ঘাড় কাটবে।

আবূ নঈম রেওয়ায়েত করেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদকে কোথাও ভোজের দাওয়াত করা হয়। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, গৃহের প্রাচীরে পর্দা ঝুলানো আছে। তিনি গৃহের বাইরে বসে গেলেন এবং ক্রন্দন করতে লাগলেন। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি বাইরে বসে আছেন কেন এবং কাঁদছেনই বা কেন?

তিনি বললেন ঃ নবী করীম (সাঃ) তিনবার বলেছিলেন— তোমাদের উপর দুনিয়ার ধনসম্পদ আত্মপ্রকাশ করবে। অতঃপর তিনি এরশাদ করলেন ঃ তোমরা আজ উত্তম, না তখন উত্তম হবে, যখন তোমাদের কাছে সকালে একটি খাদ্যভর্তি পিয়ালা আসবে এবং সন্ধ্যায় একটি? তোমরা সকালে এক পোশাক পরবে এবং

বিকালে এক পোশাক। তোমরা আপন গৃহে এমন পর্দা লাগাবে, যেমন কা'বা গৃহে লাগানো হয়। আবদুল্লাহ বললেন ঃ এহেন পরিস্থিতিতে আমি ক্রন্দন না করে কি করব? আমি দেখতে পাচ্ছি তোমরা গৃহে এমন পর্দা ঝুলিয়েছ, যেমন কা'বা গৃহে ঝুলানো হয়।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এসে আরয করল ঃ

দুর্ভিক্ষ আমাদেরকে খেয়ে ফেলেছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি দুর্ভিক্ষের চেয়ে বেশী এ বিষয়ের আশংকা করি যে, দুনিয়া তোমাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবে। হায়, আমার উম্মত যদি স্বর্ণকে অলংকার না বানাত!

হীরা বিজিত হওয়ার খবর

হাযীম ইবনে আউস ইবনে হারেছা রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন আমি তাঁর কাছে হিজরত করলাম। তিনি বললেন ঃ হীরা আমার সামনে তুলে ধরা হয়েছে। আমি তা দেখতে পাচ্ছি। এই শায়মা বিনতে নফীলাকে সাদা খচ্চরের উপর সওয়ার দেখা যাচ্ছে, সে কাল ওড়না পরিহিতা। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি আমরা হীরা জয় করি এবং শায়মাকে তেমনি পাই, যেমন আপনি বললেন, তবে শায়মা আমার হবে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ হ্যাঁ, সে তোমার হবে। এরপর আবূ বকর (রাঃ)- এর খেলাফতকাল এল। আমরা মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে দমন অভিযান সমাপ্ত করে হীরা আগমন করলাম। হীরায় সর্বপ্রথম আমরা শায়মা বিনতে নফীলাকে পেলাম। রসূলুল্লাহর (সাঃ) বর্ণনা অনুযায়ী সে কাল ওড়না পরিহিতা হয়ে খচ্চরের উপর সওয়ার ছিল। আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম। আমি বললাম ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই মহিলা আমাকে দান করেছেন। খালিদ ইবনে ওলীদ এ বিষয়ে সাক্ষী পেশ করতে বললেন। আমি মোহাম্মদ ইবনে সালামাহ্ ও মোহাম্মদ ইবনে বিশর আনসারীকে সাক্ষীস্বরূপ পেশ করলাম। অতঃপর খালিদ শায়মাকে আমার হাতে সোপর্দ করলেন। শায়মার ভাই এসে বলল ঃ শায়মাকে আমার হাতে বিক্রয় করে দাও। আমি বললাম ঃ এর মূল্য এক হাজারের কম নেব না। সে আমাকে হাজার দেরহামই দিল। লোকেরা বলল ঃ যদি তুমি এক লাখ দেরহাম চাইতে, তা হলেও শায়মার ভাই তোমাকে তা দিয়ে দিত। আমি বললাম ঃ দশ শ'য়ের বেশী গণনা আমার জানাই ছিল না।

ইরাক ও সিরিয়া বিজিত হওয়ার খবর

বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে সুফিয়ান ইবনে আবূ যুহায়র বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ইয়ামন জয় করা হবে। এমন এক সম্প্রদায় আসবে, যা গবাদি-পশুকে হাঁকাবার সময় "বস্, বস্" বলবে। তারা আপন পরিজন ও আনুগত্যকারীদেরকে নিয়ে যাবে। হায়, তারা যদি জানত যে, মদীনা ভাল আবাসস্থল! অর্থাৎ তারা জানে না যে, মদীনা ভাল আবাসস্থল। জানলে মদীনাতেই থাকত।

আবদুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা ইযদী রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন— তোমরা কয়েক লশকর হয়ে যাবে। এক লশকর সিরিয়ায়, এক ইরাকে এবং এক ইয়ামনে থাকবে। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আমার জন্যে স্থান নির্বাচন করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি সিরিয়া থেকে চলে যাবে না এবং সেখানেই থাকবে। যে সিরিয়ায় থাকতে চায় না, সে ইয়ামনে চলে যাবে এবং তার নদীর পানি পান করবে। আল্লাহ তা'আলা আমার জন্যে সিরিয়া ও সিরিয়াবাসীদের দায়িত্ব দিয়েছেন।

সা'দ ইবনে ইবরাহীমের রেওয়ায়েতে আবদুর রহমান ইবনে আওফ বলেন ঃ নবী করীম (সাঃ) আমাকে সিরিয়ায় জায়গীর দিয়েছেন। যার নাম সলীল। তিনি এর সনদ আমাকে লিখে দেয়ার আগেই ওফাত পেয়ে যান। তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন সিরিয়ার উপর বিজয় দান করবেন, তখন সেই জায়গীরটি তোমার হবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) ইরাকবাসীদের জন্যে 'যাতে ইরক'-কে ওকূফের স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

বায়তুল মোকাদ্দাস জয়ের খবর

আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা ছয়টি বিষয় গণনা কর, যেগুলো কিয়ামতের পূর্বে আসবে। তন্মধ্যে একটি আমার ওফাত। এরপর বায়তুল মোকাদ্দাস বিজয়, এরপর দুটি মৃত্যু, যেমন ছাগলের কিয়াস রোগ হয়, আর মরে যায়, এরপর এত বেশী ধনদৌলত আসা যে, এক ব্যক্তি দু'শ' আশরফী পেয়েও সন্তুষ্ট হবে না, এরপর একটি ফেতনা আসবে এবং আরবের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করবে, এরপর তোমাদের ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে সন্ধি হবে এবং শ্বেতাঙ্গরা তোমাদের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে, অবশেষে নারীর গর্ভ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করবে। আমওয়াস দুর্ভিক্ষের বছরে আওফ ইবনে মালেক মুয়াযকে বললেন ঃ রসূলুল্লাহ

(সাঃ) আমাকে বলেছেন ঃ তুমি ছয়টি বিষয় গণনা কর। তন্মধ্যে তিনটি হয়ে গেছে এবং তিনটি বাকী আছে। মুয়ায বললেন, এই তিন বিষয়ের জন্যে দীর্ঘ সময় বাকী আছে।

ইবনে সাদের রেওয়ায়েতে যীল আসাবে বলেন ঃ আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার পরে আমরা জীবিত থাকলে আমি কোথায় অবস্থান করব? তিনি বললেন ঃ তুমি বায়তুল মোকাদ্দাসে থাকবে। আল্লাহ্ তোমাকে এমন সন্তান দিবেন, যে মসজিদকে আবাদ করবে এবং সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে যাবে।

মিসর জয়ের খবর

হযরত আবূ যর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন— তোমরা এমন দেশ জয় করবে, যেখানে কীরাতের কথা বলা হবে। তোমরা সেই দেশের অধিবাসীদেরকে হিতোপদেশ দেবে। যখন তোমরা দু'ব্যক্তিকে এক ইটের জায়গা নিয়ে লড়াই করতে দেখবে, তখন তোমরা সেখান থেকে বের হয়ে যাবে। আবূ যর বলেন ঃ ইবনে শোরাহবিল ইবনে হাসানা রবিয়া ও আবদুর রহমানের কাছে যেয়ে দেখল যে, তারা এক ইটের জায়গা নিয়ে লড়ছে। তখন সে সেখান থেকে চলে গেল।

কা'ব ইবনে মালেক রেওয়ায়েত করেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি—তোমরা যখন মিসর জয় করবে, তখন কিবতীদেরকে হিতোপদেশ দেবে। কেননা, তাদের সাথে শান্তির অঙ্গীকার এবং আত্মীয়তা রয়েছে। (হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জননী কিবতী ছিলেন এবং হুযূর (সাঃ)-এর পুত্র ইবরাহীমের জননী 'মারিয়া' কিবতী ছিলেন।)

হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওফাতের পূর্বে ওসিয়ত করেন, যে, মিসরীয় কিবতীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাদের উপর বিজয়ী হবে। তারা তোমাদের জন্যে সাজসরঞ্জাম এবং আল্লাহর পথে মদদগার হবে।

সামুদ্রিক জেহাদে উম্মে হারামের যোগদানের খবর

বুখারী ও মুসলিম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) উম্মে হারামের কাছে এলেন এবং ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর যখন জাগ্রত হলেন, তখন তাঁর মুখে ছিল মুচকি হাসি। উম্মে হারাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি হাসছেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের অনেককে আমার সামনে পেশ করা হয়েছে, যারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে। তারা মধ্য

দরিয়ায় থাকবে এবং আপন সম্প্রদায়ের বাদশাহ হবে। উম্মে হারাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি দোয়া করুন, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। হুযূর (সাঃ) উম্মে হারামের জন্যে দোয়া করলেন। সেমতে হযরত আমীর মোয়াবিয়ার শাসনামলে উম্মে হারাম তার স্বামী ওবাদা ইবনে সামেতের সাথে গাযীরূপে সমুদ্রে গমন করেন।

বুখারী ওমর ইবনে আসওয়াদ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ উম্মে হারাম বর্ণনা করেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন— আমার উম্মতের লশকর দরিয়ায় জেহাদ করবে। তারা জান্নাতী হবে। উম্মে হারাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি কি সেই গাযীদের অন্তর্ভুক্ত হব? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের প্রথম লশকর রোম সম্রাটের শহরে যাবে। তাদের জন্যে মাগফেরাত রয়েছে। উম্মে হারাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি তাদের মধ্যে থাকব? তিনি বললেন ঃ না।

রোমকদের শান্তিচুক্তি সম্পাদনের খবর

আবদুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা রেওয়ায়েত করেন, আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে বসে আমাদের অভাব-অনটন ও নিঃস্বতার কথা বলছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের জন্যে দ্রব্যাদির স্বল্পতার চেয়ে আধিক্যের ভয় বেশী করি। পারস্য, রোম ও হিমইয়ার জয় করা পর্যন্ত তোমাদের বর্তমান অবস্থা অব্যাহত থাকবে। তোমাদের তিনটি বড় বাহিনী হবে। একটি সিরিয়ায়, একটি ইরাকে ও একটি ইয়ামনে থাকবে। তোমাদের স্বাচ্ছন্দ্য এমন হবে যে, এক ব্যক্তিকে শ' দেরহাম কিংবা দীনার দেওয়া হলে সে একে কম মনে করে নারাজ হবে। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! সিরিয়া কিরূপে জয় হবে? সিরিয়া তো রোমকদের করতলগত। সেখানে তাদের বড় বড় সরদার রয়েছে! তিনি বললেন ঃ সিরিয়া অবশ্যই জয় হবে। সেখানে তোমরা খলীফা হবে। তোমাদের পায়দল বিচরণকারী কৃষ্ণকায় ব্যক্তির আশে পাশে শ্বেতাঙ্গদের প্রচণ্ড ভিড় থাকবে এবং তারা তার আদেশের প্রতীক্ষা করবে। আবদুর রহমান ইবনে জুবায়র ইবনে ফুযায়ল বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরাম এই হাদীসের প্রতিচ্ছবি জুয ইবনে সুহায়ল সলমীর মধ্যে দেখতে পেয়েছেন। তিনি সেই যুগে অনারবদের উপর চেপে বসেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে যাওয়ার সময় জুয ইবনে সুহায়ল ও তার আশেপাশে দণ্ডায়মান শ্বেতাঙ্গদেরকে দেখে রসূলুল্লাহর (সাঃ) বর্ণিত হাদীসের কথা স্মরণ করে বিস্মিত হতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে বুসরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, সেই সত্তার কসম, যার কজায় আমার প্রাণ—পারস্য ও রোম অবশ্যই বিজিত হবে। ফলে খাদ্যসামগ্রীর প্রাচুর্য হয়ে যাবে এবং আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হবে না। অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর নাম নিয়ে খাবে না।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যখন আমার উম্মত হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে গর্ব ভরে চলবে এবং পারস্য ও রোমের অধিবাসীরা তাদের খেদমতগার হবে, তখন তাদের দুষ্টরা সাধুদের উপর চড়াও হয়ে যাবে।

ওরওয়া ইবনে মালেকের রেওয়ায়েতে আছে, নবী করীম (সাঃ) একবার সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে দণ্ডায়মান হয়ে এরশাদ করলেন ঃ তোমরা দারিদ্র্যের ভয় কর; অথচ আল্লাহ তা'আলা পারস্য ও রোম তোমাদের করতলগত করে দেবেন। তখন ধনসম্পদ তোমাদের উপর ভেঙ্গে পড়বে। আমার পরে ধনসম্পদ ছাড়া কোন বস্তু তোমাদেরকে সত্য থেকে বিচ্যুত করবে না।

হাশেম ইবনে ওতবা রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে জেহাদে ছিলাম। তখন তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ তোমরা আরব উপদ্বীপে জেহাদ করবে। আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করবেন। এরপর পারস্যে জেহাদ করবে, সেখানেও বিজয় অর্জিত হবে। এরপর রোমে জেহাদ করবে, সেখানেও জয় হবে। অবশেষে তোমরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়বে। আল্লাহ তা'আলা তাতেও তোমাদেরকে বিজয়মাল্যে ভূষিত করবেন।

আমর ইবনে শেরাহবিলের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমি আজ রাতে স্বপ্ন দেখেছি যেন কাল ছাগপাল আমার পেছনে পেছনে আসছে। এরপর সাদা ছাগপাল কাল ছাগপালের পশ্চাতে এল। ফলে কাল ছাগপাল আর দৃষ্টিগোচর হল না। হযরত আবূ বকর (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! কাল ছাগলপাল হচ্ছে আরবের বাসিন্দা, যারা আপনার অনুসারী হবে। এরপর অনারবরা আপনার অনুসরণ করবে। তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে আরবরা তাদের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ কথা সমর্থন করে বললেন ঃ নিঃসন্দেহে এরূপই হবে। শেষ রাতে ফেরেশতা আমাকে স্বপ্নের এ অর্থই বলেছে।

পারস্যরাজ ও রোম সম্রাটের বিলুপ্তির খবর

বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহর (সাঃ) এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, পারস্য রাজের বিলুপ্তির পর আর কোন পারস্যরাজ হবে না এবং কায়সর তথা রোম সম্রাটের বিলুপ্তির পর কোন রোম

সম্রাট হবে না। সেই সত্তার কসম, যার কব্জায় আমার প্রাণ, তোমরা তাদের ধনভাণ্ডারকে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে।

জাবের ইবনে সামরা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ মুসলমানদের একটি দল পারস্যরাজের শ্বেতপ্রাসাদের ধনভাণ্ডার অবমুক্ত করবে। জাবের বলেন ঃ যারা সেই ধনভাণ্ডার অবমুক্ত করেছিল, তাদের মধ্যে আমি এবং আমার পিতা ছিলাম। এতে আমরা এক হাজার দেরহাম অংশ পাই।

হযরত হাসান (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, পারস্য বিজয়ের পর যখন খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে পারস্য রাজের হাতের বলয় আনা হল, তখন সুরাকা ইবনে মালেক উভয় বলয় পরে নিলেন, যা তার কাঁধ পর্যন্ত পৌছে গেল। এটা দেখে খলীফা বললেন ঃ আলহামদু লিল্লাহ, কেসরা ইবনে হরমুযের উভয় বলয় বনী মুদাল্লাজ গোত্রীয় বেদুঈন সুরাকা ইবনে মালেকের হাতে শোভা পাচ্ছে। ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ সুরাকা ইবনে মালেক এই বলয়দ্বয় পরিধান করেছিলেন। কেননা, এক সময়ে তার হাতের কব্জির দিকে তাকিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন ঃ আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি পারস্যরাজের বলয়দ্বয় পরিধান করেছ। তার কোমরবন্ধ লাগিয়েছ এবং তার মুকুট মাথায় পরিধান করেছ।

হযরত হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সুরাকা ইবনে মালেককে বললেন ঃ তুমি যখন পারস্য রাজের কংকন পরিধান করবে, তখন তোমার অবস্থা কি হবে? সেমতে খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে পারস্যরাজের কংকন আনা হলে তিনি সুরাকাকে ডেকে কংকন পরিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ বল, আলহামদু লিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলাই কেসরা ইবনে হরমুযের কাছে থেকে কংকন ছিনিয়ে এনে সুরাকা বেদুঈনকে পরিয়ে দিয়েছেন।

খলীফা চতুষ্টয়, বনূ উমাইয়া ও বনূ আব্বাসের খবর

হযরত আবূ হুরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ বনী ইসরাঈলের রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশুনা পয়গম্বরগণ করতেন। এক পয়গম্বরের ওফাত হয়ে গেলে অন্য পয়গম্বর এসে যেতেন। কিন্তু আমার পর কোন নবী নেই। আমার পরে হবেন খলীফাগণ, তারা খুব উন্নতি করবেন। সাহাবীগণ আরয করলেন ঃ আপনি তাদের সম্পর্কে আমাদের কি আদেশ দেন? তিনি বললেন ঃ প্রথমে বয়াত, এরপর বয়াত পূর্ণকরণ এবং খলীফাগণকে সেই বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, যার রক্ষক তাদেরকে বানাবেন।

জাবের ইবনে সামরা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে

বলতে শুনেছি–ইসলাম সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অবশেষে কোরাইশদের বারজন খলীফা হবে। এরপর কিয়ামতের পূর্বে মিথ্যুকদের আবির্ভাব ঘটবে।

হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমার পরে এমন খলীফা হবে, যারা যা জানবে, তা করবে। সে বিষয়ের আদেশ দেবে, যা নিজেরাও করবে। তাদের পরে এমন খলীফা হবে, যারা যা জানবে না তা করবে এবং যে কাজ তাদেরকে করতে বলা হয়নি, তা করবে।

বুখারী ও মুসলিম আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ অনেক অপ্রিয় অবস্থা ও ঘটনা ঘটবে, যা তোমরা পছন্দ করবে না। সাহাবীগণ আরয করলেন ঃ আমাদের কেউ যদি এমন অপ্রিয় অবস্থার সম্মুখীন হয়, তবে সে কি করবে? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর যা ওয়াজেব করেছেন, তা আদায় করবে এবং আল্লাহ্র কাছে তোমাদের প্রাপ্য তলব করবে।

এরবায ইবনে সারিয়া রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের উদ্দেশে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় ওয়ায করলেন ঃ যা শুনে আমাদের মন অস্থির হয়ে গেল এবং আমাদের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। সাহাবীগণ আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! এই উপদেশ তো কোন বিদায় গ্রহণকারীর উপদেশের মত। আপনি আমাদের কাছ থেকে কি অঙ্গীকার নিতে চান? তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে ওসিয়ত করছি যে, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাকবে। কোন কাফ্রী গোলাম তোমাদের আমীর হলেও তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে। কারণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জীবিত থাকবে, সে অনেক মতবিরোধ দেখবে। ধর্মকর্মে সৃষ্ট নতুন আবিষ্কারকে ভয় করবে। কেননা, নতুন আবিষ্কার পথভ্রষ্টতা বৈ নয়। যে ব্যক্তি এসব বিষয় পাবে, তার উপর আমার এবং আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নত ওয়াজেব। এই সুন্নতের উপর দৃঢ়তা সহকারে কায়েম থাকবে।

হযরত সফীনা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) মসজিদের নির্মাণ শুরু করলে হযরত আবূ বকর (রাঃ) একটি পাথর বহন করে নিয়ে এলেন এবং সেটি স্থাপন করলেন। হযরত ওমর (রাঃ)-ও একটি পাথর আনলেন এবং স্থাপন করলেন। অতঃপর হযরত ওছমান (রাঃ) একটি পাথর এনে স্থাপন করলেন। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ এরা আমার পরে শাসক হবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ মসজিদ নির্মাণের জন্যে সর্বপ্রথম পাথর নবী করীম (সাঃ) বহন করেন। এরপর একটি পাথর আবূ বকর (রাঃ) ও অতঃপর একটি পাথর হযরত ওছমান (রাঃ) বহন করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ এই সাহাবীগণ আমার পরে খলীফা হবে।

কুতবা ইবনে মালেক রেওয়ায়েত করেন, আমি যখন রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলাম, তখন তিনি মসজিদে কুবার ভিত্তি স্থাপন করছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবূ বকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি কেবল তিনজন সাহাবীর সঙ্গে মসজিদ নির্মাণ করছেন? তিনি বললেন ঃ এই তিনজন আমার পরে খলীফা হবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি কাল ছাগপালকে পানি পান করাচ্ছি। এরপর এদের মধ্যে শ্বেত ছাগপালও শামিল হয়ে গেল। এরপর আবূ বকর এল, সে এক অথবা দু'বালতি পানি তুলল। তার মধ্যে দুর্বলতা ছিল। এরপর ওমর এসে বালতি হাতে নিতেই বালতি বৃহদাকার ধারণ করল। সে সকল মানুষকে তৃপ্তি সহকারে পানি পান করাল। ছাগপালগুলোও পানি পান করে প্রস্থান করল। হুযূর (সাঃ) এরশাদ করেন, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে, কাল ছাগপাল হচ্ছে আরব এবং শ্বেত ছাগপাল হচ্ছে অনারব। ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ নবীগণের স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে। হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর দুর্বলতার অর্থ হচ্ছে তাঁর শাসনামলের সংক্ষিপ্ততা এবং অনতিবিলম্বে ওফাত পাওয়া।

বুখারী ও মুসলিম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) অসুস্থ অবস্থায় আমাকে বললেন ঃ তুমি তোমার বাপ ও ভাইকে ডেকে আন। আমি আবূ বকরকে একটি কাগজ লিখে দেব। কারণ, আমার আশংকা হয় যে, নানাজনে নানা কথা বলবে এবং অনেকেই আশা করবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা কেবল আবূ বকরকে চান।

হযরত ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমার পরে বারজন খলীফা হবে। আবূ বকর আমার পরে অল্প সময়কাল থাকবে। অতঃপর তিনি হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বললেন ঃ সে শহীদ হবে। অতঃপর তিনি হযরত ওছমান (রাঃ)-কে বললেন ঃ মানুষ তোমাকে সেই জামা খুলে ফেলতে বলবে, যা আল্লাহ তোমাকে পরিধান করিয়েছেন। আল্লাহর কসম, তুমি সেই জামা খুলে ফেললে জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না যে পর্যন্ত সুঁচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ না করে।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ বনী মুস্তালিকের দূতেরা আমাকে এই প্রশ্ন দিয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে প্রেরণ করল যে, আমরা আগামী বছর এসে যদি আপনাকে না পাই তবে যাকাতের অর্থ কাকে দেব? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তাদেরকে বলে দাও যে, যাকাতের অর্থ আবূ বকরকে দিবে। আমি একথা তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিলাম। তারা বলল ঃ যদি আবূ বকরকে না পাই,

তবে কাকে দেব? আমি এসে আরয করলে তিনি এরশাদ করলেন ঃ ওমরকে দিবে। আমি একথাও তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিলাম। কিন্তু তারা আবার প্রশ্ন করল ঃ যদি ওমরকে না পাই, তবে কাকে দিব? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ ওছমানকে দিবে। যে দিন ওছমান নিহত হবে, সে দিন তোমাদের জন্যে ধ্বংস।

জাবের ইবনে সামরাহ বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলীকে বললেন ঃ তুমি আমীর ও খলীফা হবে এবং নিহত হবে। তোমার দাড়ি তোমার মাথার রক্তে রঞ্জিত হবে।

ছওর ইবনে মাজযাহ্ রেওয়ায়েত করেন ঃ জামাল যুদ্ধে আমি যখন তালহার কাছে গেলাম, তখন তার মধ্যে সামান্য প্রাণ স্পন্দন অবশিষ্ট ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কোন্ দলের লোক? আমি বললাম ঃ আমি হযরত আলী (রাঃ)-এর সহচরগণের একজন। তালহা বললেন ঃ হাত বাড়াও। আমি তোমার বয়াত করব। আমি হাত বাড়ালে তিনি বয়াত করলেন। সেই মুহূর্তে তার আত্মা দেহপিঞ্জর থেকে উড়ে গেল। আমি ফিরে এসে এই ঘটনা হযরত আলীকে (রাঃ) শুনালে তিনি বললেন ঃ আল্লাহু আকবার! রসূলুল্লাহ (সাঃ) সত্য বলেছিলেন যে, আমার বয়াতের বেড়ি ঘাড়ে না নিয়ে তালহা জান্নাতে যাবে—এটা আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় নয়।

উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী আবদুর রহমান ইবনে সহল আনসারী রেওয়ায়েত করেন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবুওয়তের পরে খেলাফত ছিল। প্রত্যেক খেলাফতের পরে বাদশাহী (রাজতন্ত্র) জন্ম নিয়েছে এবং প্রত্যেক যাকাত খেরাজ তথা ট্যাক্সের রূপ ধার করেছে।

হযরত সফীনার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমার উম্মতে ত্রিশ বছর খেলাফত থাকবে। এরপর রাজতন্ত্র এসে যাবে। বলা বাহুল্য, চারটি খেলাফতের সময়কাল ছিল ত্রিশ বছর।

হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা নবুওয়তের সময়কালে জীবনযাপন করছ। আল্লাহ তা'আলা যতদিন চাইবেন, নবুওয়ত থাকবে। এরপর নবুওয়ত তুলে নেওয়া হবে এবং নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ যতদিন চাইবেন, এই খেলাফত অব্যাহত থাকবে। এরপর খেলাফত তুলে নেওয়া হবে এবং যুলুম ও অবিচারে পরিপূর্ণ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। এ সময় অত্যাচার ও নিপীড়ন চলবে। যতদিন আল্লাহ চাইবেন, এই অত্যাচার বাকী থাকবে। এরপর খতম হয়ে যাবে এবং নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) যখন খলীফা হলেন, তখন তাঁর কাছে এই হাদীস বর্ণনা করা হল। গুণীজনেরা

তাকে বললেন ঃ আমরা আশা করি এই খেলাফত আপনার খেলাফত। একথা শুনে তিনি উৎফুল্ল হলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমায়রের রেওয়ায়েতে হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) বলেন ঃ একটি মাত্র বিষয় আমাকে খেলাফতের প্রতি উৎসাহিত করেছে। তা হচ্ছে রসূলুল্লাহর (সাঃ) এই এরশাদ–হে মোয়াবিয়া, যদি তুমি শাসনকর্তা হও, তবে আল্লাহকে ভয় করবে এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবে। আমি সর্বদা ভাবতাম যে, আমি শাসনকার্যে নিয়োজিত হব। কেননা, হুযূর (সাঃ) একথা বলে দিয়েছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) মোয়াবিয়াকে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাকে জামা পরিধান করান, অর্থাৎ খেলাফত দান করেন, তবে তোমার কি অবস্থা হবে? উম্মে হাবীবা (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আমার ভাইকে জামা পরাবেন কি? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ অবশ্যই। কিন্তু এতে ভীষণ পরীক্ষা আছে। একথাটি তিনি তিনবার বললেন।

ওরওয়া ইবনে রুয়ায়ম রেওয়ায়েত করেন ঃ জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে বলল ঃ আপনি আমার সাথে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হোন। মোয়াবিয়া (রাঃ) বললেন ঃ আমি তোর সাথে মল্লযুদ্ধ করব। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ মোয়াবিয়া পরাভূত হবে না। সেমতে তিনি বেদুঈনকে ভূতলশায়ী করে দিলেন। সিফফীন যুদ্ধের সময় হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ এই হাদীস আমার মনে থাকলে আমি মোয়াবিয়ার সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতাম না।

নাফের রেওয়ায়েতে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন ঃ আমার বংশধরের মধ্যে এক ব্যক্তির মুখমণ্ডলে একটি বিশ্রী চিহ্ন থাকবে। সে খেলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হবে এবং ভূপৃষ্ঠকে ন্যায়বিচারে পূর্ণ করে দিবে। নাফে বলেন ঃ আমার মতে সেই ব্যক্তি ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে ইবনে ওমর বলেন ঃ মানুষ বলাবলি করে যে, দুনিয়া খতম হবে না যে পর্যন্ত ওমর বংশীয়দের মধ্যে কোন ব্যক্তি খলীফা না হয় এবং হযরত ওমরের ন্যায় খেলাফত পরিচালনা না করে। মানুষের ধারণা ছিল সেই ব্যক্তি বেলাল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর। কেননা, তার মুখমণ্ডলে চিহ্ন ছিল। কিন্তু পরে জানা গেল যে, সেই ব্যক্তি ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)। তাঁর জননী ছিলেন আসেম ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাবের কন্যা।

হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন বনূ উমাইয়াকে অভিসম্পাদ করো না। কেননা, বনূ উমাইয়ার মধ্যে একজন সাধু পুরুষ হবেন যিনি ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)।

আবূ নঈমের রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, উম্মুল ফযল আমার কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে তিনি বলেন ঃ আমি রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে গেলে তিনি বললেন ঃ তুমি একটি শিশুর জননী হবে। সে ভূমিষ্ঠ হলে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমি আরয করলাম ঃ শিশু কিরূপে হবে, কোরায়শরা তো কসম খেয়েছে যে, তারা স্ত্রীদের কাছে যাবে না। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি তোমাকে যে খবর দিয়েছি, তাই হবে। মোটকথা, আমার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে আমি তাকে নিয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি শিশুর ডান কানে আযান দিলেন এবং বাম কানে একামত বললেন। অতঃপর তার মুখে আপন পবিত্র থুথু দিলেন। শিশুর নাম রাখলেন আবদুল্লাহ। সবশেষে বললেন ঃ খলীফাগণের পিতাকে নিয়ে যাও। আমি এই ঘটনা সম্পর্কে হযরত আব্বাসকে অবহিত করলাম। তিনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে এসে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ উম্মুল ফযল ঠিকই বলেছে। এই শিশু খলীফাগণের পিতা। সেই খলীফাগণের একজন সাফ্‌ফাহ্ এবং একজন মাহদী হবে। তাদের মধ্যে একজন সেই ব্যক্তিও হবে, যে হযরত ঈসা (আঃ)-কে নামায পড়াবে।

যুবায়র ইবনে বাক্কার রেওয়ায়েত করেন ঃ যে সময় ইবনে মুলজিম হযরত আলী (রাঃ)-এর উপর খুনীসুলভ হামলা করে, তখন হযরত আলী (রাঃ) ওসিয়ত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) আমাকে পরবর্তীকালের মতবিরোধ সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। তিনি আমাকে বিশ্বাসঘাতক, ধর্মত্যাগী ও যালেমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে এই হামলা সম্পর্কেও খবর দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, মোয়াবিয়া ও তার পুত্র ইয়াযীদ খেলাফত লাভ করবে। খেলাফত বনূ উমাইয়ার হাতে চলে যাবে। তারা একে উত্তরাধিকার স্বত্বে পরিণত করবে। এরপর আসবে বনুল আব্বাস। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে সেই ভূখণ্ডও দেখিয়েছেন, সেখানে হুসাইনকে শহীদ করা হবে।

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রেওয়ায়েত করেন ঃ হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে বলেছেন ঃ আল্লাহর কসম; বনূ উমাইয়া ইসলামকে কানা করে দেবে, এরপর অন্ধ করে দেবে। এরপর জানা যাবে না যে, ইসলাম কোথায় আছে এবং ইসলামের শাসনকর্তা কে? তখন ইসলাম এখানে-ওখানে থাকবে। এই অবস্থা একশ ছত্রিশ বছর অব্যাহত থাকবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা একদল দূত প্রেরণ করবেন, যারা রাজকীয় দূতের মত হবে। তাদের সুগন্ধি পবিত্র হবে। তাদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে দিবেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এই দূত কারা? হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ তারা হবে ইরাকী, আজমী ও প্রাচ্য দেশীয়।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাহাদতের খবর

ইবনে সা'দ ও ইবনে আবিল আশহাব মুযায়না গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ওমরের শরীরে এক পোশাক দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা নতুন, না ধৌত করা? হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ ধৌত করা। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ ওমর, নতুন পোশাক পর, প্রশংসনীয় জীবন যাপন কর এবং শাহাদতের মৃত্যু বরণ কর।

হযরত সহল ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন যে, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ), হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর ও হযরত ওছমান (রাঃ) উহুদ পাহাড়ে দণ্ডায়মান ছিলেন। পাহাড় কেঁপে উঠল। হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ হে উহুদ পাহাড়, স্থির থাক। তোমার উপরে একজন নবী, একজন সিদ্দীক এবং দু'জন শহীদ মওজুদ আছেন।

তিবরানী হযরত ইবনে ওমর থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন এক বাগানে অবস্থান করছিলেন। হযরত আবূ বকর ভিতরে আসার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদও। এরপর হযরত ওমর (রাঃ) অনুমতি চাইলে তিনি বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাত ও শাহাদতের সুসংবাদও। এরপর হযরত ওছমান (রাঃ) অনুমতি চাইলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাত ও শাহাদতের সুখবরও।

তিবরানীর রেওয়ায়েতে আবদুর রহমান ইবনে ইয়াসার বলেন ঃ আমি হযরত ওমরের শাহাদতের সময় উপস্থিত ছিলাম। সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল।

হযরত ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদতের খবর

বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার রসূলে করীম (সাঃ) আরীস কূপের দিকে চলে গেলেন। তিনি কূপের বেড়াপ্রাচীরে বসে উভয় পা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। অতঃপর উভয় পায়ের মোজা খুলে ফেললেন। আমি মনে মনে বললাম, আজ আমার উচিত রসূলুল্লাহর (সাঃ) দারোয়ানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। ইতিমধ্যে হযরত আবূ বকর এলেন। আমি তাকে বললাম ঃ আপনি থামুন। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম ঃ আবূ বকর এসেছেন, অনুমতি চান। তিনি বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আবূ বকর এসে হুযূর (সাঃ)-এর ডান দিকে বসে গেলেন। তিনিও আপন পদদ্বয় ঝুলিয়ে দিলেন। অতঃপর হযরত ওমর এলেন। আমি আবার খেদমতে উপস্থিত

হয়ে আরয করলাম ঃ ওমর এসেছেন এবং সাক্ষাতের অনুমতি চান। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও। হযরত ওমর এসে কূপের প্রাচীরের উপর হুযূর (সাঃ)-এর বামদিকে বসে গেলেন। তিনিও কূপের মধ্যে পা ঝুলিয়ে দিলেন। অতঃপর হযরত ওছমান এলে আমি খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম ঃ ওছমান এসেছেন এবং সাক্ষাতের অনুমতি চাইছেন। তিনি বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং এই সুসংবাদ দাও যে, সে অনেক দুঃখ-কষ্ট ও যাতনা সহ্য করার পর জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর হযরত ওছমান তার কাছে এলেন এবং ডানে-বামে স্থান না পেয়ে তার বিপরীত দিকে প্রাচীরে বসে পা ঝুলিয়ে দিলেন। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব বলেন ঃ এই ঘটনার ব্যাখ্যা তাঁদের কবর; অর্থাৎ হযরত আবূ বকর ও ওমর (রাঃ) উভয়েই রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে সমাধিস্থ হবেন এবং হযরত ওছমান (রাঃ)-কে আলাদা জায়গায় দাফন করা হবে।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে বাগানে ছিলাম। কেউ এসে দরজায় খট্‌খট্‌ আওয়াজ করল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আনাস, দরজা খুলে দাও, আগন্তুককে জান্নাতের সুসংবাদ দাও এবং আমার পরে খলীফা হওয়ার সুখবর জানিয়ে দাও। আমি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে দেখতে পেলাম। পুনরায় কেউ এসে খট্‌খট্‌ আওয়াজ করল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আনাস, যাও দরজা খুলে দাও। আগন্তুককে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে বল যে, আবূ বকরের পরে সে খলীফা হবে। আমি হযরত ওমর (রাঃ)-কে দেখতে পেলাম। এরপর আরও এক ব্যক্তি এসে দরজায় খট্‌খট্‌ আওয়াজ করল। তিনি বললেন ঃ আনাস, যাও, দরজা খুলে দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে বল যে, ওমরের পরে সে খলীফা হবে এবং তাকে হত্যা করা হবে। এরপর আমি হযরত ওছমান (রাঃ)-কে দেখতে পেলাম।

উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ওছমানকে ডেকে পাঠালে তিনি উপস্থিত হলেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি নিহত ও শহীদ হবে, তাই সবর করবে। আল্লাহ যে পোশাক তোমাকে পরিধান করাবেন, তা বার বছর ছয় মাস পর্যন্ত থাকবে। কিন্তু তুমি নিজে তা খুলে ফেলবে না। হযরত ওছমান সেখান থেকে ফিরে এলে হুযূর (সাঃ) এই বলে দোয়া দিলেন ঃ আল্লাহ তোমাকে সবর দান করুন। তুমি সত্বরই রোযা অবস্থায় শহীদ হবে এবং আমার সাথে ইফতার করবে।

আবদুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা থেকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) এই উক্তি বর্ণিত আছে যে, একজন জান্নাতী ব্যক্তি চাদরের পাগড়ী বেঁধে মুসলমানদের কাছ থেকে বয়াত

নেবে। তোমরা তার উপর আক্রমণ করবে। সেমতে যখন হযরত ওছমান (রাঃ)-এর উপর আক্রমণ হয়, তখন তিনি সবরের চাদর দিয়ে পাগড়ী বেঁধে বয়াত নিচ্ছিলেন।

হযরত ওছমান (রাঃ)-এর পত্নী নায়েলা বিনতে কারাকিসা রেওয়ায়েত করেন—যখন হযরত ওছমানের গৃহ অবরোধ করা হয়, তখন তিনি রোযাদার ছিলেন। ইফতারের সময় তিনি পানি চাইলে অবরোধকারীরা পানি দিল না। পিপাসিত অবস্থায় তিনি রাত্রি অতিবাহিত করলেন। সেহরীর সময় তিনি বললেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) এক বালতি পানি নিয়ে আমার কাছে এলেন। তিনি বললেন ঃ ওছমান পানি পান কর। আমি তৃপ্ত হয়ে পানি পান করলাম। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আরও পান কর। আমি আবার পান করলাম। অবশেষে আমার পেট ভরে গেল।

হযরত আলী (রাঃ)-এর শাহাদতের খবর

হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ হে আলী, তোমার এ স্থানে এবং এ স্থানে আঘাত করা হবে। (তিনি কানপট্টির দিকে ইশারা করলেন)। এ স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হবে এবং তোমার দাড়ি রঞ্জিত হয়ে যাবে।

আম্মার ইবনে ইয়াসির রেওয়াতে করেন, রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আলীকে বললেন ঃ এক হতভাগা তোমার কানপট্টিতে তরবারি দিয়ে আঘাত করবে। ফলে তোমার দাড়ি রক্তাপ্লুত হয়ে যাবে। যুহরী রেওয়ায়েত করেন ঃ যে দিন সকালে হযরত আলী (রাঃ) নিহত হন, বায়তুল মোকাদ্দাসে যে পাথরই উত্তোলন করা হয়, তার নীচে রক্ত পাওয়া যায়।

হযরত তালহা ও যুবায়র (রাঃ)-এর শাহাদতের খবর

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবূ বকর, ওমর, ওছমান, আলী, তালহা ও যুবায়র (রাঃ) সহ সিরা পাহাড়ে ছিলেন। এসময় একটি বড় পাথর নড়ে উঠল। তিনি বললেন ঃ হে পাথর থেমে যাও। নড়াচাড়া করবে না। তোমার উপর নবী, ছিদ্দীক ও শহীদ রয়েছেন।

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন শহীদকে দেখতে চায়, সে তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহকে দেখে নিক।

ছাবেত ইবনে কায়স ইবনে শাম্মাসের শাহাদতের খবর

ইসমাঈল ইবনে মোহাম্মদ ইবনে ছাবেত আপন পিতা থেকে রেওয়ায়েত

করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) একবার ছাবেত ইবনে কায়সকে বললেন ঃ তুমি কি এতে আনন্দিত নও যে, তোমার জীবন হবে প্রশংসনীয় এবং মৃত্যু হবে শাহাদতের? ছাবেব বললেন ঃ অবশ্যই আমি এতে আনন্দিত। সেমতে ছাবেত প্রশংসনীয় জীবন যাপন করেন এবং মুসায়লামাতুল কাযযাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

হযরত ইমাম হুসায়ন (রাঃ)-এর শাহাদতের খবর

উম্মুল ফযল বিনতুল হারিছ রেওয়ায়েত করেন, আমি হুসায়নকে নিয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলাম এবং তাঁর কোলে দিয়ে দিলাম। পরক্ষণই আমি দেখলাম যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে জিবরাঈল আঃ) এসে খবর দিল যে, আমার উম্মত আমার এই সন্তানকে হত্যা করবে। জিবারাঈল সেই জায়গার মাটি নিয়েও আমার কাছে এল, যেখানে তাকে হত্যা করা হবে।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একদিন রসূলে করীম (সাঃ) বিশ্রামের জন্যে শয়ন করলেন। অতঃপর অত্যন্ত বিষণ্ন অবস্থায় জাগ্রত হলেন। তাঁর হাতে লাল মাটি ছিল, যা তিনি ওলট-পালট করে দেখছিলেন। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এ কেমন মাটি? তিনি বললেন ঃ জিবরাঈল আমাকে খবর দিয়েছে যে, হুসায়ন ইরাকী ভূখণ্ডে নিহত হবে। এটা সেই জায়গার মাটি।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, বৃষ্টির ফেরেশতা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আসার অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। ইতিমধ্যে হুসায়ন এলেন এবং নানাজীর কাঁধে বসতে লাগলেন। ফেরেশতা বলল ঃ আপনি একে ভালবাসেন? হুযুর (সাঃ) বললেন ঃ অবশ্যই। ফেরেশতা বলল ঃ আপনার উম্মত তাকে হত্যা করবে। আপনি চাইলে আমি আপনাকে সেই জায়গাও দেখিয়ে দেই, যেখানে তাকে হত্যা করা হবে। অতঃপর ফেরেশতা হাত মেরে লাল মাটি দেখিয়ে দিল। উম্মে সালামা (রাঃ) সেই মাটি নিয়ে একটি কাঁপড়ে বেঁধে নিলেন। আমরা শুনতাম যে, হযরত হুসায়ন (রাঃ) কারবালায় শহীদ হবেন।

মোহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাসান রেওয়ায়েত করেন ঃ আমরা হুসায়নের সঙ্গে কারবালার নদীর কাছে ছিলাম। তিনি শিমার ইবন যুল জওশনের দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন ঃ আমি দাগযুক্ত কুকুরকে আমার পরিবারের রক্ত পান করতে দেখতে পাচ্ছি। অভিশপ্ত শিমারের শরীরে শ্বেতকুষ্ঠের দাগ ছিল।

শা'বী রেওয়ায়েত করেন ঃ ইবনে ওমর (রাঃ) মদীনায় আগমন করলে তাকে বলা হল যে, হযরত হুসায়ন ইরাক অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেছেন। ইবনে ওমর তাকে বিরত রাখার জন্যে মদীনা থেকে দ্রুতবেগে দু'রাতের দূরত্বে যেয়ে দেখা করলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্য থেকে একটিকে গ্রহণ করার ক্ষমতা দেন। আল্লাহ্র নবী আখেরাতকে গ্রহণ করলেন এবং দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যান করলেন। আপনি তাঁরই সুযোগ্য সন্তান। আপনাদের কাউকে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার শাসক করবেন না। আপনাদের কল্যাণের নিমিত্তই দুনিয়াকে আপনাদের থেকে দূরে রাখা হবে। একথা ভেবে আপনি ফিরে চলুন এবং ইয়াযীদের সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হবেন না। কিন্তু হযরত হুসায়ন তাতে সম্মত হলেন না। ইবনে ওমর তার সাথে কোলাকুলি করলেন এবং বললেন ঃ আমি আপনাকে আল্লাহ্র হাতে অর্পন করছি। অথচ আপনি হত্যার শিকার হতে যাচ্ছেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, আমরা নবী পরিবারের লোকজন বিপুল সংখ্যক ছিলাম। তাই ভাবতেও পারতাম না যে, হুসায়ন ইরাকে নিহত হয়ে যাবেন।

ইয়াহইয়া হাসরামী রেওয়ায়েত করেন, আমরা হযরত আলী (রাঃ)-এর সঙ্গে সিফফীন গেলাম। নায়নুয়ার বিপরীতে পৌঁছে তিনি বললেন ঃ হে আবূ আবদুল্লাহ্! ফোরাতের কিনারে থেমে যাও। আমি বললাম ঃ কেন? তিনি বললেন ঃ নবী করীম (সাঃ) বলেছেন যে, হযরত জিবরাঈল তাঁকে বলেছেন ঃ হুসায়ন ফোরাতের কিনারায় নিহত হবে। তিনি সেই জায়গার মাটিও তাঁকে দেখান।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি এই মর্মে ওহী প্রেরণ করেন যে, আমি ইবনে যাকারিয়ার বিনিময়ে সত্তুর হাজার মানুষের হত্যা অবধারিত করেছি। আপনার দৌহিত্রের বিনিময়ে সত্তর হাজার এবং আরও সত্তর হাজারের হত্যা অবধারিত করছি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একদিন দ্বিপ্রহরের সময় আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এলোকেশ, পেরেশান ও ধূলি ধূসরিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম। তাঁর হাতে একটি শিশি ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এটা কি? তিনি বললেন ঃ এটা হুসায়ন ও তার সহকর্মীদের রক্ত। আজ দিনের শুরু থেকে আমি এটা বহন করছি।

হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখলাম। তাঁর মাথা ও দাঁড়িতে মৃত্তিকা লেগে ছিল। আমি কুশল জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি এই মাত্র হুসায়নের বধ্যভূমিতে উপস্থিত ছিলাম।

পরবর্তীকালে মানুষের ধর্মত্যাগী হওয়ার খবর

মুসলিম ছওবান (রাঃ) থেকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) এই উক্তি রেওয়ায়েত করেছেন ঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত আমার উম্মতের অনেক গোত্র মুশরিকদের সাথে হাত মিলিয়ে তাদের অনুরূপ মূর্তিপূজা শুরু না করে।

মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ অনেক মানুষকে আমার হাওয থেকে সরিয়ে দেয়া হবে, যেমন পথভ্রান্ত উটকে সরিয়ে দেয়া হয়। আমি তাদেরকে ডাকব। কিন্তু আমাকে বলা হবে যে, এরা আপন ধর্ম বিসর্জন দিয়েছিল। আমি বলব ঃ দূর হও, দূর হও।

আরব উপদ্বীপে কখনও মূর্তিপূজা না হওয়ার খবর

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ শয়তান এ বিষয়ে হতাশ হয়ে গেছে যে, আরব উপদ্বীপে নামাযীরা তার এবাদত করবে। কিন্তু শয়তান নামাযীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রাখবে।

সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণ কারিণী পত্নীর খবর

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ পত্নীদের মধ্যে আমার কাছে সর্বপ্রথম সে-ই যাবে, যার হাত দীর্ঘ। এতে পত্নীগণ পরস্পরে হাত মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে থাকেন যে, কার হাত দীর্ঘ। এরপর সর্বপ্রথম হযরত যয়নব (রাঃ)-এর ইন্তেকাল হলে পত্নীগণ বুঝলেন যে, তার হাতই দীর্ঘ ছিল; অর্থাৎ তিনি ছিলেন অধিক দানশীলা।

ওয়ায়স কারনীর খবর

হযরত ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ ইয়ামনের জনৈক ব্যক্তি তোমাদের কাছে আসবে। ইয়ামনে কেবল তার মা থাকবে। তার শরীরে সাদা দাগ হবে। এটা দূর করার জন্যে সে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই সাদা দাগ দূর করে দেবেন। তবে এক দীনার পরিমাণ জায়গা সাদা থেকে যাবে। তার নাম হবে ওয়ায়স। কেউ তার সাথে দেখা করলে তার উচিত হবে তাকে দিয়ে নিজের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করানো।

হযরত ওমর (রাঃ) আরও রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তাবেয়ীগণের মধ্যে এক ব্যক্তি হবে কারনের অধিবাসী। তার নাম

হবে ওয়ায়স ইবনে আমের। তার শরীরে সাদা দাগ দেখা দেবে। সে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, যাতে আল্লাহ্ এই দাগ দূর করে দেন এবং আল্লাহর নেয়ামত মনে রাখার জন্যে সামান্য কিছু অংশ বাকী রাখেন। সেমতে আল্লাহ তা'আলা তার শরীরে সামান্য সাদা অংশ বাকী থাকতে দেবেন। তোমাদের কেউ তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারলে সে যেন নিজের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করায়।

আবদুর রহমান ইবনে আবী ইয়ালা বর্ণনা করেন ঃ ছিফফীন যুদ্ধের সময় সিরীয় সেনাবাহিনীর এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনাদের মধ্যে ওয়ায়স কারনী আছে? লোকেরা বলল ঃ হ্যাঁ। লোকটি বলল যে, সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছে–ওয়ায়সকারনী শ্রেষ্ঠতম তাবেয়ী। এরপর সে আপন বাহিনীর মধ্যে দাখিল হয়ে গেল।

হযরত ওমর (রাঃ) ওয়ায়স কারনীকে বললেন ঃ আপনি আমার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করুন। ওয়ায়স কারনী বললেন ঃ আমি আপনার জন্যে কিরূপে মাগফেরাতের দোয়া করব? আপনি তো নিজে সাহাবী। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ ওয়ায়স কারনী নামক এক ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতম তাবেয়ী হবে।

রাফে' ইবনে খদীজের শাহাদতের খবর

ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল হামিদ ইবনে রাফে' বর্ণনা করেন, আমার দাদী আমাকে বলেছেন যে, উহুদ কিংবা হুনায়ন যুদ্ধে রাফে' ইবনে খদীজের বুকে তীর বিদ্ধ হয়ে গেলে তিনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! তীরটি টেনে নিন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ রাফে, তুমি চাইলে তীর এবং ফলা উভয়টি টেনে নেই, আর যদি চাও, তবে ফলাটি থাকতে দেই এবং কিয়ামতের দিন তোমার শাহাদতের সাক্ষ্য দেই। রাফে বললেন ঃ আপনি তীর টেনে নিন এবং ফলাটি থাকতে দিন, এরপর কিয়ামতের দিন আমার শাহাদতের সাক্ষ্য দিন। রাফে এই ঘটনার পর দীর্ঘদিন জীবিত থাকেন এবং মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফতকালে তার ক্ষতস্থান বিদীর্ণ হয়ে যায়। ফলে তিনি ইন্তেকাল করেন।

হযরত আবূ যর (রাঃ) সম্পর্কিত খবর

আবূ যর-পত্নী উম্মে যর রেওয়ায়েত করেন ঃ হযরত আবূ যর (রাঃ)-কে খলীফা হযরত ওছমান (রাঃ) বহিষ্কার করেননি; বরং রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বলেছিলেন ঃ শহরের আবাসিক গৃহ যখন সলা, পাহাড় পর্যন্ত চলে যায়, তখন তুমি শহর ত্যাগ করবে। সেমতে আবাসিক এলাকায় সলা, পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেলে আবূ যর (রাঃ) সিরিয়া চলে গেলেন।

উম্মে যর থেকেই বর্ণিত আছে ঃ হযরত আবূ যরের ওফাত আসন্ন হয়ে গেলে তিনি বলেছিলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) মুখ থেকে শুনেছি, তিনি একদল লোক সম্পর্কে, যাদের মধ্যে আমিও ছিলাম– বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি জনশুন্য প্রান্তরে মারা যাবে। তার মৃত্যুর সময় একদল মুমিন উপস্থিত থাকবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যাদের সম্পর্কে একথা বলেছিলেন. তারা সকলেই বসতি এলাকায় ইন্তেকাল করে গেছেন। এখন জনশূন্য প্রান্তরে মৃত্যু বরণকারী আমিই রয়ে গেছি। তুমি পথের উপর দৃষ্টি রেখো। আমি বললাম ঃ এখন রাস্তায় কেউ নেই। হাজীগণ আমাদের অতিক্রম করে চলে গেছেন। কিছুক্ষণ পর আমি উটের পিঠে সওয়ার কিছু লোককে যেতে দেখলাম। আমি কাপড় নেড়ে নেড়ে তাদের আহ্বান করলাম। তারা এসে গেল এবং আবূ যরের কাছে দাঁড়িয়ে গেল। তার ইন্তেকালের পর তারা তার দাফন কার্য সমাধা করে আপন পথে চলে গেল।

হযরত আবূ যর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ যখন এমন লোক আমীর বা দলপতি হবে, যারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিজেরাই আত্মসাৎ করে নেবে, তখন তুমি কি করবে? আমি আরয করলাম ঃ আমি আমার তরবারি কাজে লাগাব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমি তোমাকে তরবারি চালনা অপেক্ষা উত্তম কাজ বলে দিচ্ছি। তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত সবর করবে।

হযরত আবূ যর (রাঃ) আরও রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে অবগত করেছেন যে, মানুষ আমাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না এবং আমার নীতি সম্পর্কে আমাকে কোন বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিতে পারবে না। আমি একা মুসলমান হয়েছি, একা মৃত্যুবরণ করব এবং কিয়ামতের দিন একা পুনরুত্থিত হব।

আসমা বিনতে ইয়াযীদ রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) আবূ যরকে মসজিদে নিদ্রা যেতে দেখে বললেন ঃ তুমি মসজিদে ঘুমাচ্ছ? আবূ যর বললেন ঃ আমি কোথায় ঘুমাব? মসজিদ ছাড়া আমার যে কোন গৃহ নেই। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ যখন মানুষ তোমাকে মসজিদ থেকেও বের করে দেবে, তখন কি করবে? তিনি বললেন ঃ আমি সিরিয়া চলে যাব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ যখন সিরিয়া থেকে বহিষ্কৃত হবে, তখন কি করবে? তিনি বললেন ঃ পুনরায় সিরিয়া চলে যাব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ পুনরায় বহিষ্কৃত হলে কি করবে? তিনি বললেন ঃ আমি তরবারি তুলে নেব এবং আমরণ লড়াই করব। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি তোমাকে এর চেয়ে ভাল পথ দেখাচ্ছি। মানুষ তোমাকে যে দিকে নিয়ে যায়, চলে যাবে এবং যে দিকে ঠেলে দেয়, সে দিকেই যাবে। অবশেষে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে।

আবুল মুছান্না মুলায়কী রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন গৃহ থেকে সাহাবীগণের দিকে যেতেন, তখন বলতেন ঃ ওয়ায়মির আমার উম্মতের প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি, আর জুনদুব (আবূ যর) আমার উম্মতের হাঁকানো ব্যক্তি। সে একাকী জীবন যাপন করবে, একাকী মরবে এবং আল্লাহ তা'আলা একা তার জন্যে যথেষ্ট হবেন।

মোহাম্মদ ইবনে সীরীন রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূযরকে বললেন ঃ যখন দালান-কোঠা সলা পাহাড় পর্যন্ত পৌছে যায়, তখন তুমি বের হয়ে যেয়ো। তিনি হাতে সিরিয়ার দিকে ইশারা করলেন। তিনি আরও বললেন ঃ আমার মনে হয় না যে, তোমাদের শাসকরা তোমাকে তোমার অবস্থার উপর ছেড়ে দেবে। আবূ যর আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! যারা আমার এবং আপনার কর্মপন্থার মধ্যে অন্তরায় হবে, আমি কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন ঃ না, তাদের কথা শুনবে এবং তাদের আনুগত্য করবে যদিও একজন কাফ্রী গোলাম তোমার আমীর হয়। যখন কথিত যুগ এল, তখন আবূ যর সিরিয়া চলে গেলেন। সেখানকার শাসনকর্তা আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) খলীফা হযরত ওছমান (রাঃ)-কে লিখলেন যে, আবূ যর সিরিয়ায় জনগণকে বিগড়ে দিচ্ছে। অতঃপর হযরত ওছমান আবূযরকে ডেকে মদীনায় নিয়ে এলেন। তিনি এখানে এসে রবযা নামক জনশূন্য প্রান্তরে যেয়ে বসবাস করতে লাগলেন। সেই এলাকায় খলীফার পক্ষ থেকে জনৈক কাফ্রী গোলাম আমীর নিযুক্ত ছিল। আবূ যর যেদিন সেখানে পৌছেন, নামাযের একামত হয়। কাফ্রী আমীর পেছনে সরতে লাগলে আবূ যর বললেন ঃ তুমি নামায পড়াও। কেননা, আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেন আমি কাফ্রী গোলামের কথাও শুনি এবং তার আনুগত্য করি।

উম্মে ওয়ারাকাকে শাহাদতের খবর প্রদান

উম্মে ওয়ারাকা বিনতে নওফেল রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন বদর যুদ্ধে রওয়ানা হন, তখন আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকেও যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দিন, যাতে আল্লাহ পাক আমাকে শাহাদত নসীব করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি এখানেই থাক। এখানেই তোমার শাহাদত নসীব হবে। উম্মে ওয়ারাকাকে মানুষ শহীদ বলত। তিনি কোরআন পাঠ করেছিলেন এবং একটি গোলাম ও একটি বাঁদীকে শর্তাধীনে মুক্ত করেছিলেন। সেই গোলাম ও বাঁদী উভয়েই এক রাতে আততায়ীর বেশে এসে তাঁকে গলাটিপে হত্যা করে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে এ ঘটনা

সংঘটিত হয়। খলীফার নির্দেশে তাদের উভয়কে শূলীতে চড়ানো হয়। এটা ছিল মদীনার প্রথম শূলী। এক রেওয়ায়েতে হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সত্য বলেছেন। তিনি বলতেন ঃ চল, শহীদ (উম্মে ওয়ারাকা)-এর সাথে দেখা করি।

উম্মুল ফযলের সাথে কথাবার্তা

যায়দ ইবনে আলী ইবনে হুসায়ন রেওয়ায়েত করেন ঃ নবুওয়তপ্রাপ্তির পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) হালাল নয়–এমন কোন মহিলার কোলে আপন মস্তক রাখেননি; কিন্তু আব্বাস-পত্নী উম্মুল ফযলের কোলে তিনি মস্তক রেখেছেন। উম্মুল ফযল তাঁর মাথায় উকুন তালাশ করতেন এবং চোখে সুরমা লাগাতেন। একদিন তিনি যখন সুরমা লাগাচ্ছিলেন, তখন তাঁর চোখ থেকে এক ফোঁটা অশ্রু রসূলুল্লাহর (সাঃ) গণ্ডদেশে পতিত হল। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি হল? উম্মুল ফযল বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আপনার ওফাতের খবর আমাদের দিয়েছেন। আপনার পরে কে আপনার স্থলাভিষিক্ত হবে–একথা বলে গেলে ভাল হত। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমার পরে তোমরা নিগৃহীত ও অবহেলিত বিবেচিত হবে।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাহাদত থেকে ফেতনার সূচনা

বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযায়ফা (রাঃ) বলেন ঃ আমরা খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনাদের মধ্যে কে রসূলুল্লাহর (সাঃ) সেই উক্তি স্মরণ রেখেছে, যা তিনি "ফেতনা" (গোলযোগ) সম্পর্কে বলেছিলেন? আমি (হুযায়ফা) বললাম ঃ আমি স্মরণ রেখেছি। খলীফা বললেন ঃ বর্ণনা করুন। আমি বললাম ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ কারও ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীর মধ্যে কোন ফেতনা ও পরীক্ষা দেখা দেয়, তার কাফফারা হচ্ছে নামায ও দান-খয়রাত। খলীফা বললেন ঃ আমি এই ফেতনার কথা বলছি না; বরং সেই ফেতনা ও গোলযোগের কথা বলছি, যা সমুদ্রের তরঙ্গমালার অনুরূপ হবে। আমি বললাম ঃ আমীরুল মুমিনীন, এই ফেতনার ব্যাপারে আপনার শংকিত হওয়ার কিছু নেই। আপনার মধ্যে এবং এই ফেতনার মধ্যে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই দরজা খুলে যাবে, না ভেঙ্গে যাবে? আমি বললাম ঃ ভেঙ্গে যাবে। খলীফা বললেন ঃ এই দরজা ভেঙ্গে গেলে কখনও

বন্ধ হবে না। হুযায়ফা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়, এই দরজাটি কি? তিনি বললেন ঃ দরজাটি হচ্ছে খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)।

ওরওয়া ইবনে কায়স রেওয়ায়েত করেন ঃ কিছু লোক হযরত খালিদ ইবনে ওলীদকে বলল ঃ ফেতনা আত্মপ্রকাশ করেছে। খালিদ বললেন ঃ যে পর্যন্ত ইবনে খাত্তাব (খলীফা) জীবীত আছেন, ফেতনা আত্মপ্রকাশ করবে না; বরং তার পরে আত্মপ্রকাশ করবে।

ওছমান ইবনে মযউন রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ওমর সম্পর্কে বলেছেন ঃ সে ফেতনার জন্যে বাধা। যতদিন সে তোমাদের মধ্যে থাকবে, ততদিন তোমাদের মধ্যে ও ফেতনার মধ্যে একটি দরজা দৃঢ়ভাবে বন্ধ থাকবে।

হযরত আবূ যর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ ওমর যতদিন তোমাদের মধ্যে থাকবে, ফেতনা তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।

হযরত ছওবানের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন আমার উম্মতের মধ্যে তরবারি কোষমুক্ত হয়ে যাবে, তখন তা আর কোষাবদ্ধ হবে না এবং কিয়ামত পর্যন্ত খুন-খারাবি অব্যাহত থাকবে।

হযরত আবূ মূসা আশআরীর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে "হরজ" হবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ হরজ কি? তিনি বললেন ঃ তোমাদের পারস্পরিক অব্যাহত হত্যাযজ্ঞ।

কুরয ইবনে আলকামার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ ফেতনা শিশিরের মত বর্ষিত হবে। এসব ফেতনায় তোমরা বিষাক্ত সর্প হয়ে একে অপরকে হত্যা করবে।

খালেদ ইবনে আরফাতার রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ)-এরশাদ করেন ঃ অনেক নতুন বিষয় ও ফেতনা হবে, পরস্পরে বিচ্ছেদ ও বিরোধ হবে। সম্ভব হলে তুমি নিহত হও; কিন্তু ঘাতক হয়ো না।

মোহাম্মদ ইবনে মাস্‌লামার ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকার খবর

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন ঃ আমি প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাপারে ফেতনার আশংকা করি মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা ছাড়া। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বলেছিলেন ঃ কোন ফেতনা তোমার ক্ষতি করবে না।

ছা'লাবা ইবনে সনিয়া বর্ণনা করেন, আমরা মদীনায় এসে দেখলাম মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা শহরের বাইরে একটি তাঁবুতে বসবাস করছেন। কারণ জিজ্ঞেস

করা হলে তিনি বললেন ঃ মুসলমানদে উপর থেকে ফেতনা দূর না হওয়া পর্যন্ত আমি কোন শহরে বসবাস করব না।

মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ তুমি যখন মুসলমানদেরকে পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত দেখ, তখন হাররার প্রস্তর খণ্ডের কাছে চলে যাবে এবং প্রস্তর খণ্ডে আঘাত করে আপন তরবারি ভেঙ্গে দিবে। অতঃপর আপন গৃহে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে যে পর্যন্ত কোন পাপিষ্ঠের হাত তোমার দিকে প্রসারিত না হয় অথবা স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ না কর। সেমতে আমি তাঁর আদেশ প্রতিপালন করেছি।

মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা আরও রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে তরবারি দিয়ে বললেন ঃ এই তরবারি দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করতে থাক। কিন্তু যখন মুসলমানদের দু'টি দল পরস্পরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন এই তরবারি পাথরে মেরে ভেঙ্গে ফেলবে এবং আপন জিহ্বা ও হাতকে সংযত রাখবে যে পর্যন্ত মৃত্যু না আসে অথবা কোন পাপিষ্ঠ তোমার দিকে হাত না বাড়ায়। হযরত ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদতের সময় মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা একটি পাথরে মেরে আপন তরবারি ভেঙ্গে ফেলেন।

জমল, সিফফীন ও নাহারওয়ান যুদ্ধের খবর

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন পত্নীদের কারও বিদ্রোহের কথা আলোচনা করলেন, যা শুনে হযরত আয়েশা (রাঃ) হাসতে লাগলেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ হুমায়রা, সে তুমিও হতে পার। অতঃপর তিনি হযরত আলীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ যদি তার কোন ব্যাপার তোমার হাতে থাকে, তবে তার সাথে সদয় আচরণ করবে।

কায়স রেওয়ায়েত করেন ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বনী আমেরের বসতিতে পৌঁছলে কুকুররা ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটি কোন্ জায়গা? উত্তর হল ঃ হাওয়াব। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ সম্ভবত আমাকে ফিরে যেতে হবে। হযরত যুবায়র বললেন ঃ না, এখনও ফিরে যাওয়ার সময় আসেনি। আপনি সম্মুখে অগ্রসর হোন। জনগণ আপনাকে দেখলে তাদের পারস্পরিক কলহ মিটে যাবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ সম্ভবত আমাকে ফিরেই যেতে হবে। কেননা, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন ঃ তোমাদের একজনকে দেখে হাওয়াবের কুকুররা ঘেউ ঘেউ করবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) পত্নীগণকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ তোমাদের একজন অধিক কেশবিশিষ্টা উটের উপর সওয়ার হয়ে বের হবে এবং তাকে দেখে হাওয়ারের কুকুররা ঘেউ ঘেউ করবে। তার আশেপাশে অনেক মানুষ নিহত হবে এবং সে অল্পের জন্যে রক্ষা পাবে।

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ কেউ কেউ তাকে বলল ঃ আপনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছ থেকে যে সকল কথা শুনেছেন, আমাদেরকেও শুনান। তিনি বললেন ঃ সেসব কথা তোমাদের শুনালে তোমরা আমাকে প্রস্তর বর্ষণে মেরে ফেলবে। উপস্থিত লোকেরা বলল ঃ সোবহানাল্লাহ, এটা কিরূপে হতে পারে! হুযায়ফা বললেন ঃ যদি আমি বর্ণনা করি যে, তোমাদের কতক জননী (অর্থাৎ নবী-পত্নী) এক বাহিনী নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করবে এবং সেই বাহিনী তোমাদের তরবারি দিয়ে মারবে, তবে তোমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস করবে? সকলেই বলল ঃ সোবহানাল্লাহ, এটাও সত্য হতে পারে? হুযায়ফা বললেন ঃ হুমায়রা তোমাদের কাছে একটি বড় বাহিনী নিয়ে আসবেন। বায়হাকীর বর্ণনা অনুযায়ী হযরত হুযায়ফা জামাল যুদ্ধের পূর্বেই ইন্তেকাল করেন।

আবূ বকরার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ একটি সম্প্রদায় বিদ্রোহ করে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তারা সফলতা পাবে না। তাদের নেতৃত্বে থাকবে একজন মহিলা, যে জান্নাতে যাবে।

আবূ রাফে' রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলীকে বললেন ঃ তোমার ও আয়েশার মধ্যে একটি ঘটনা ঘটবে। এরূপ হলে তুমি আয়েশাকে শান্তির জায়গায় পৌঁছিয়ে দেবে।

বুখারী ও মুসলিম আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে দু'টি দল পরস্পরে যুদ্ধ করবে। তাদের মধ্যে বিরাট হত্যাযজ্ঞ হবে এবং তারা একই দাবী করবে।

আবূ আইউব রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আলীকে বিশ্বাসঘাতক, অত্যাচারী ও ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন।

আম্মার ইবনে ইয়াসিরের হত্যার খবর

বুখারী ও মুসলিম আবূ সায়ীদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আম্মারকে বললেন ঃ তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল কতল করবে।

বায়হাকী ও আবূ নঈম আম্মারের বাঁদী থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ আম্মার অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এক পর্যায়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এরপর তার জ্ঞান ফিরে এল। আমরা তখন ক্রন্দন করছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা মনে কর আমি শয্যাশায়ী হয়ে মারা যাব। না, আমার হাবীব মোহাম্মদ (সাঃ) আমাকে বলেছেন ঃ তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। দুনিয়াতে আমার সর্বশেষ খাবার হবে পানি মিশ্রিত দুধ।

আবুল বুখতারী রেওয়ায়েত করেন ঃ ছিফফীন যুদ্ধের সময় আম্মার ইবনে

ইয়াসিরের কাছে দুধ আনা হল। তিনি দুধ দেখে হাসতে লাগলেন। হাসির কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন— দুনিয়াতে তোমার সর্বশেষ পানীয় হবে দুধ। এরপর তিনি যুদ্ধে এগিয়ে গেলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন।

হযরত হুযায়ফা রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আম্মারকে বললেন ঃ তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। তুমি পিপাসা পরিমাণে পানি মিশ্রিত দুধ পান করবে। এটাই হবে দুনিয়াতে তোমার সর্বশেষ রিযিক।

হযরত আমর ইবনুল আ'ছ রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন, হে আল্লাহ, তুমি আম্মারের প্রতি কোরায়শকে ক্ষেপিয়ে তুলেছ। আম্মারের ঘাতক এবং যুদ্ধে তার সরঞ্জাম গ্রহণকারী জাহান্নামী হবে।

ইবনে সাদ হুযায়ল থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) আগমন করলে লোকেরা বলল যে, আম্মারের উপর প্রাচীর ভেঙ্গে পড়েছে। হুযুর (সাঃ) বললেন ঃ সে মরেনি।

হাররাবাসীদের হত্যার খবর

আইউব ইবনে বশীর রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সফরে যাওয়ার পথে হাররা যাহরার কাছে অবস্থান করলেন এবং ইন্না লিল্লাহি --- পাঠ করলেন। সাহাবায়ে কেরাম কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ তোমাদের পরে আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ লোকগণ এই হাররার কাছে নিহত হবে।

বায়হাকী হাসান থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ হাররার যুদ্ধে মদীনার লোকজনকে সমূলে হত্যা করা হয়।

হযরত মালেক ইবনে আনাস বর্ণনা করেন ঃ হাররার যুদ্ধে সাত শ' হাফেযে কোরআন শহীদ হন এবং তাদের মধ্যে তিনশ' ছিলেন সাহাবী। এই মর্মান্তিক ঘটনা ইয়াযীদের শাসনামলে সংঘটিত হয়।

বায়হাকী মুগীরা থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ মুসলিম ইবনে ওকবা তিন দিন পর্যন্ত মদীনায় লুণ্ঠন কার্য চালায় এবং এক হাজার অবিবাহিতা কুমারীর ইযযত হরণ করে। লায়ছ ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, হাররার যুদ্ধ ৬৩ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের তিনদিন বাকী থাকতে বুধবার দিন সংঘটিত হয়।

যায়দ ইবনে আরকামের অন্ধ হওয়ার খবর

যায়দ ইবনে আরকাম রেওয়ায়েত করেন ঃ অসুস্থ অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে দেখতে এলেন। তিনি বললেন ঃ তোমার এ রোগ বিপজ্জনক নয়। কিন্তু আমি আশংকা করি যে, তুমি আমার পরে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে এবং অন্ধ হয়ে

যাবে। আমি বললাম ঃ এজন্যে আমি আল্লাহর কাছে ছওয়াব আশা করব এবং ছবর করব। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এরূপ করলে তুমি বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। নবী করীম (সাঃ)-এর ওফাতের পর যায়দ অন্ধ হয়ে যান, অতঃপর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে এবং এরপর ইন্তেকাল করেন।

ওয়াক্তের বাইরে নামায পড়ার খবর

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা এমন লোকদেরকে পাবে, যারা বে-ওয়াক্ত নামায পড়বে। যখন তাঁদেরকে পাবে, তখন তোমরা আপন আপন গৃহে ওয়াক্তের মধ্যে নামায পড়ে নিবে, এরপর তাদের সাথে নামায পড়বে এবং একে নফল নামায মনে করবে।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন— আমার পরে এমন লোক তোমাদের শাসনকর্তা হবে, যারা সুন্নতের নূরকে নির্বাপিত করে দিবে, প্রকাশ্যে বেদআত করবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের নামায বিলম্বিত করবে।

ওবাদা ইবনে সামেতের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ ভবিষ্যতে এমন শাসকবর্গ আসবে, যারা জাগতিক বিষয়াদিতে ব্যাপৃত থেকে বিলম্বে নামায পড়বে। তোমরা নিজেদের নামায তাদের সাথে নফল স্বরূপ পড়ে নেবে। জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহ ঃ) বলেন ঃ এই শাসকবর্গ হচ্ছে বনী উমাইয়ার শাসকবর্গ, যারা বিলম্বে নামায পড়ার ব্যাপারে সবিশেষ খ্যাত। অবশ্য খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের আগমনের পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তিনি নতুন করে যথা সময়ে নামায পড়ার রীতি প্রবর্তন করেন।

শতাব্দী সমাপ্ত হওয়ার খবর

বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলুলাহ (সাঃ) শেষ বয়সে এক রাতে এশার নামায পড়লেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের এ রাত থেকে শতাব্দীর সূচনা হচ্ছে। এ শতাব্দীর যে সকল লোক ভূপৃষ্ঠে এখন আছে, তাদের কেউ বাকী থাকবে না। এই উক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি শতাব্দী খতম হয়ে যাওয়া

মুসলিমের রেওয়ায়েতে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন ঃ আমি শুনেছি যে, রসূলে করীম (সাঃ) ওফাতের এক মাস পূর্বে বললেন ঃ তোমরা কিয়ামতের কথা জিজ্ঞেস কর। কিয়ামতের কথা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা জানেন। আল্লাহর কসম, আজকার দিনে ভূপৃষ্ঠে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার উপর দিয়ে একশ বছর অতিবাহিত হয়েছে।

মুসলিমের রেওয়ায়েতে আবু তোফায়ল বলেন ঃ যারা রসূলে করীম (সাঃ)-কে দেখেছে, তাদের মধ্যে আমাকে ছাড়া কেউ অবশিষ্ট নেই। আবূ তোফায়ল শতাব্দীর শুরুতে মারা যান।

আবদুল্লাহ ইবনে বুসর রেওয়ায়েতে করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) তাঁর মাথায় হাত রেখে বললেন ঃ এই বালক এক শতাব্দী জীবিত থাকবে। সেমতে তিনি একশ' বছর জীবিত থাকেন। তাঁর মুখমণ্ডলে কাল কাল দাগ ছিল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এই দাগ দূর না হওয়া পর্যন্ত সে মরবে না। সেমতে মৃত্যুর পূর্বে সেই দাগ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ইবনে আবী মুলায়কা রেওয়ায়েত করেন ঃ জেহাদে যোগদানের উদ্দেশ্যে হাবীব ইবনে মাস্লামা মদীনায় রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে উপস্থিত হয়। এরপর তার পিতা মাসলামাও আগমন করে এবং আরয করে ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! এই হাবীব ছাড়া আমার আর কোন পুত্র নেই। সে আমার অন্ধের যষ্ঠি। আমার ধনসম্পদ, পরিবার-পরিজন এবং ক্ষেত-খামারের ব্যবস্থাপনা সে-ই করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাবীবকে তার পিতার সাথে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ এ বছর তুমি সকল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যাবে। কোন বাধা থাকবে না। (কারণ, তোমার পিতা মারা যাবে।) সেমতে হাবীব পিতার সাথে চলে গেল। তার পিতা সে বছরই মারা গেল এবং হাবীব জেহাদে অংশগ্রহণ করল।

নোমান ইবনে বশীরের শাহাদতের খবর

আমর ইবনে কাতাদাহ্ রেওয়ায়েত করেন ঃ উমরা বিনতে রাওয়াহা তার পুত্র নোমান ইবনে বশীরকে নিয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি দোয়া করুন আল্লাহ্ যেন এর ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে না যে, সে তার মামার অনুরূপ জীবন যাপন করুক?

তার মামা জীবদ্দশায় প্রশংসনীয় ছিল, শহীদরূপে নিহত হয় এবং জান্নাতে প্রবেশ করে।

আবদুল মালেক ইবনে ওমায়র রেওয়ায়েত করেন ঃ বশীর ইবনে সা'দ আপন পুত্র নোমান ইবনে বশীরকে নিয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এলেন এবং আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার এই পুত্রের জন্যে দোয়া করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত যে, যে মর্তবায় তুমি পৌছবে, সে-ও সেই মর্তবায় পৌছবে। এরপর সে সিরিয়া যাবে। সেখানকার কোন মুনাফিক তাকে হত্যা করবে।

ইবনে স'াদ মাসলামা ইবনে মাহারিব থেকে বর্ণনা করেন ঃ মারওয়ানের খেলাফতকালে যাহহাক ইবনে কায়স মরজে রাহেতে নিহত হন, তখন নোমান ইবনে বশীর হেমস থেকে পলায়ন করতে চেয়েছিলেন। তিনি তখন হেমসের গভর্নর ছিলেন এবং মারওয়ানের বিরোধিতা করেছিলেন। হেমসবাসীরা তাকে তালাশ করে হত্যা করে।

মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীদের খবর

মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আমার উম্মতের শেষ ভাগে এমন লোক আসবে, যারা মিছামিছি হাদীস বর্ণনা করবে ঃ এমন হাদীস , যা তোমরা শুনে থাকবে না এবং তোমাদের বড়রাও শুনে থাকবে না। তোমাদের উচিত হবে এমন লোকদের থেকে বেঁচে থাকা

ওয়াছেলা ইবনে আসকা' রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত ইবলীস বাজারে ঘুরাফেরা করে একথা প্রচার না করবে যে, অমুকের পুত্র অমুক আমার কাছে এই হাদীস বর্ণনা করেছে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, শয়তান এক ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করে মানুষের কাছে মিথ্যা হাদীস বয়ান করবে। ফলে মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে।

ওলীদ ইবনে ওকবার অবস্থা

ওলীদ ইবনে ওকবা রেওয়ায়েত করেন ঃ মক্কা বিজয়ের পর মক্কাবাসীরা তাদের শিশুদেরকে নিয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আগমন করে। তিনি শিশুদের মাথায় সস্নেহ হাত বুলান এবং দোয়া করেন। আমার জননীও আমাকে নিয়ে তাঁর কাছে আসেন। আমার শরীরে সুগন্ধি মাখা ছিল। তিনি আমার মাথায় হাত বুলালেন না এবং স্পর্শও করলেন না। বায়হাকী বলেন ঃ ওলীদ সম্পর্কে এই আচরণ রসূলুল্লাহর (সাঃ) জ্ঞানের ভিত্তিতেই হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় ছিল যে, ওলীদ এই বরকত থেকে বঞ্চিত থাকুক। হযরত ওছমান (রাঃ) ওলীদকে গভর্নর করে দিয়েছিলেন। সে শরাব পান করে এবং নামাযে বিলম্ব করে। তার এসব বদভ্যাস বিখ্যাত। হযরত ওছমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল, তন্মধ্যে ওলীদের ব্যক্তিত্বও অন্যতম ছিল। অবশেষে হযরত ওছমান (রাঃ) জালেমদের হাতে শহীদ হয়ে যান।

কায়স ইবনে মাতাতার অবস্থা

আবূ সালামা ইবনে আবদুর রহমান রেওয়ায়েত করেন ঃ কায়স ইবনে মাতাতা সেই বৃত্তের কাছে এল, যাতে সালমান ফারেসী, সোহায়ব রূমী ও বেলাল হাবশী (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। সে এসেই বলল ঃ আওস ও খাজরাজের লোকজন এই ব্যক্তিকে (নবী করীমকে) মদদ যোগাচ্ছে। আমি বুঝি না তারা কেন এ কাজ করছে? একথা শুনে মুয়ায তার টুটি চেপে ধরলেন এবং জোরপূর্বক রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নিয়ে এলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘটনা শুনে ক্রুদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি মসজিদে চলে গেলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে সমবেত হওয়ার আহব্বান জানালেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা শেষে এরশাদ করলেন ঃ মানুষের প্রতিপালক একজনই। তাদের পিতা এক এবং ধর্মও এক। আরবী তোমাদের পিতা নয়, মা-ও নয়। এটা কেবল তোমাদের ভাষা। যে এই ভাষা বলে, সে আরব। মুয়ায ইবনে জবল তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এই মুনাফিক সম্পর্কে আদেশ করুন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ একে দোযখের জন্যে ছেড়ে দাও। রাবী বর্ণনা করেন ঃ কায়স ইবনে মাতাতা এর পরে ইসলাম ত্যাগ করে এবং তদবস্থায়ই নিহত হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর অবস্থা

আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি আমার পুত্র আবদুল্লাহকে কোন কাজে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে প্রেরণ করলাম। সে সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখে তার পদমর্যাদার কারণে রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে কোন কথা না বলেই ফিরে এল। এরপর আমি হুযূর (সাঃ)-এর সাথে দেখা করে বললাম ঃ আপন পুত্রকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম। আপনার কাছে এক ব্যক্তিকে উপবিষ্ট দেখে সে আপনার সাথে কথা বলেনি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আপনার পুত্র লোকটিকে দেখেছিল কি? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, দেখেছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ শেষ বয়সে আপনার পুত্রের দৃষ্টিশক্তি লোপ পাবে। তাকে গভীর জ্ঞান দান করা হবে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি সাদা পোশাক পরিহিত হয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলাম। তিনি দেহইয়া কালবীর সাথে কথা বলছিলেন, যিনি প্রকৃতপক্ষে জিবরাঈল ছিলেন। কিন্তু আমি জানতাম না। আমি সালাম করলাম না। জিবরাঈল বললেন ঃ তার কাপড় সাদা। কিন্তু তার বংশধর কাল পোশাক পরবে। সে সালাম করলে আমি জওয়াব দিতাম। আমি যখন ফিরে এলাম, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি সালাম করলে না

কেন? আমি বললাম ঃ আমি আপনাকে দেহইয়া কালবীর সাথে কথা বলতে দেখে কথাবার্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা সমীচীন মনে করলাম না। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি তাকে দেখেছ? আমি বললাম ঃ জী হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ শেষ বয়সে তোমার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাবে এবং মৃত্যুর সময় ফিরে আসবে। ইকরামা বলেন ঃ যখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ওফাত হয় এবং তাকে খাটিয়ায় রাখা হয়, তখন একটি সাদা পাখী এসে তার কাফনে ঢুকে যায়, যা আর বাইরে আসেনি।

উম্মতে তেহাত্তর ফেরকা হওয়ার খবর

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ ইহুদীদের একাত্তর কিংবা বাহাত্তর ফেরকা হয়েছে,খৃস্টানদেরও তাই হয়েছে। আমার উম্মত তেহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে।

হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ গ্রন্থধারীরা তাদের ধর্মকর্মে বাহাত্তর ফেরকা হয়ে গেছে। এই উম্মতও তেহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে। তারা খেয়ালখুশীর পূজারী হয়ে যাবে। সকলেই দোযখী হবে একটি ফেরকা ছাড়া। তারা জাহান্নামী হবে না। তারা হচ্ছে আমার অনুসারী একতা বদ্ধ দল। আমার উম্মতের মধ্যে এমন সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করবে, যারা খেয়ালখুশীর অনুসরণে অতীত সম্প্রদায়সমূহের অনুগামী হবে, যেমন কুকুর তার প্রভুর অনুগামী হয়। এই উম্মতের এমন কোন শিরা ও গ্রন্থি থাকবে না, যেখানে খেয়ালখুশী প্রবিষ্ট না হবে।

ইবনে ওমর রেওয়ায়েত করেন ঃ বনী ইসরাঈলের উপর যে দশা এসেছে, আমার উম্মতও হুবহু সেই দশার সম্মুখীন হবে। বনী ইসরাঈলের মধ্যে কেউ তার মায়ের সাথে প্রকাশ্যে যিনা করে থাকলে আমার উম্মতের মধ্যেও তদনুরূপ হবে। তাদের মধ্যে একাত্তর ফেরকা হবে, আর আমার উম্মতে হবে তেহাত্তর ফেরকা। একটি ছাড়া সকল ফেরকাই দোযখে যাবে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন ঃ সেই একটি ফেরকা কোনটি? তিনি বললেন ঃ আজ আমি এবং আমার সাহাবীরা যে তরীকায় আছি, সেই তরীকার অনুসারী ফেরকা।

আমর ইবনে আওফের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা অবশ্যই পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অনুসরণ করবে।

আওফ ইবনে মালেক আশজায়ীর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ এই উম্মত যখন তেহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে, তখন তোমার কি অবস্থা হবে? একটি ফেরকা জান্নাতে এবং অবশিষ্ট সকল ফেরকা জাহান্নামে যাবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এরূপ কবে হবে? তিনি বললেন ঃ যখন

নীচ লোকদের প্রাচুর্য হবে। বাঁদীরা প্রভু হয়ে যাবে। মজুর শ্রেণীর লোক মিম্বরে বসবে। কোরআন শরীফ বাদ্যে পরিণত হবে। মসজিদে কারুকার্য হবে এবং উঁচু উঁচু মিম্বর তৈরী করা হবে। যাকাতকে জরিমানা এবং আমানতকে গনীমত গণ্য করা হবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে ধর্মীয় পাণ্ডিত্য অর্জন করা হবে। পুরুষ স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং মায়ের অবাধ্যতা করবে। পিতাকে দূরে ঠেলে দেবে এবং বন্ধুকে আপন করে নেবে। পূর্ববর্তীদেরকে গালমন্দ করবে। পাপাচারী ব্যক্তি গোত্রের সরদার হয়ে যাবে। জাতির নীচাশয় ব্যক্তি জাতির নেতা হবে। কারও অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তার সম্মান করা হবে। যখন এসব বিষয় আত্মপ্রকাশ করবে, তখন উম্মত তেহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে। মানুষ সিরিয়ার দিকে ধাবিত হবে। আমি প্রশ্ন করলাম ঃ সিরিয়া বিজিত হয়ে যাবে? তিনি বললেন ঃ অতিসত্বরই সিরিয়া বিজিত হয়ে যাবে। সিরিয়া বিজিত হওয়ার পর ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।

খারেজী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের খবর

বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি কোন বস্তু মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করছিলেন। এমন সময় যুল-খুয়ায়সেরা সেখানে এসে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! ন্যায়বিচার করুন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুই ধ্বংস হ। আমি ন্যায়বিচার না করলে কে করবে? হযরত ওমর (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! অনুমতি দিন। আমি এর গর্দান উড়িয়ে দেই। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ ওমর একে ছাড়। এর অনেক সঙ্গী-সাথী হবে। তোমাদের একব্যক্তি তাদের নামাযের সামনে নিজের নামাযকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে এবং তাদের রোযার সামনে নিজের রোযাকে নগণ্য মনে করবে। তারা কোরআন তেলাওয়াত করবে; কিন্তু কোরআন তাদের গলার নীচে নামবে না। তারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে, যেমন তীর ধনুক থেকে দূর হয়ে যায়। তাদের চিহ্ন এই হবে যে, এক ব্যক্তি হবে কাল বর্ণের। তার বাহু নারীর স্তনের মত অথবা মাংসপিণ্ডের মত হবে। তারা সর্বোত্তম মানব দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। আবূ সাঈদ বলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আমি এই হাদীস রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে শুনেছি। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, হযরত আলী ইবনে আবী তালেব তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি কথিত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দেন। তাকে যখন তালাশ করে আনা হল, তখন আমি দেখলাম যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেমনটি বলেছিলেন, সে তেমনই।

মুসলিম আবূ ওবায়দা থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ যখন হযরত আলী (রাঃ) খারেজীদের সাথে যুদ্ধ সমাপ্ত করলেন, তখন বললেন ঃ খোঁজ নিয়ে দেখ, যদি এরা সেই দলই হয়, যাদের কথা রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন, তবে তাদের মধ্যে একজন অসম্পূর্ণ হাতবিশিষ্ট ব্যক্তি থাকবে। আমরা খোঁজ নিয়ে তাকে পেয়ে গেলাম। হযরত আলী (রাঃ) তাকে দেখে তিনবার আল্লাহু আকবার বললেন। অতঃপর বললেন ঃ তোমরা শুনে স্পর্ধা দেখাবে এবং অহংকার করবে— এরূপ আশংকা না থাকলে আমি সেই গোপন কথাটি বলে দিতাম, যা সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছিলেন, যে খারেজীদেরকে হত্যা করেছে। আমি হযরত আলীকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছ থেকে কিছু শুনেছেন? তিনি তিন বার বললেন ঃ কা'বার কসম, আমি শুনেছি।

হযরত মায়মূনা (রাঃ)-এর ইন্তেকালের খবর

ইয়াযীদ ইবনূল আহাম রেওয়ায়েত করেন, হযরত মায়মূনা (রাঃ) মক্কায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি বললেন ঃ আমাকে মক্কার বাইরে নিয়ে যাও। মক্কায় আমার মৃত্যু হবে না। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বলেছেন যে, আমি মক্কায় মরব না। সেমতে লোকেরা তাকে বহন করে "সরফ" নামক স্থানে সেই বৃক্ষের কাছে নিয়ে গেল, যার নীচে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বিয়ে করে এনেছিলেন। সেখানেই তার ইন্তেকাল হয়।

আবূ রায়হানার ঘটনা

আবূ রায়হানা রেওয়ায়েত করেন— রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ আবূ রায়হানা, সে দিন তোমার কি অবস্থা হবে, যে দিন তুমি একদল লোকের কাছ দিয়ে গমন করবে, যারা তাদের গবাদি পশুকে ঘাসপানি ছাড়াই বেঁধে রাখবে? তুমি তাদেরকে বলবে—এরূপ করতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিষেধ করেছেন। তারা বলবে— তুমি এ সম্পর্কে কোরআনের কোন আয়াত পেশ কর। সেমতে পরবর্তীকালে আমি একদল লোকের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম যে, তারা একটি মুরগীকে দানাপানি ছাড়াই বেঁধে রেখেছে। আমি তাদেরকে নিষেধ করলে তারা বলল ঃ এ প্রসঙ্গে কোরআনের আয়াত পেশ কর। এতে আমার বুঝতে বাকী রইল না যে, এরাই সেই লোক, যাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন।

উম্মতের অবস্থা সম্পর্কিত যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে

হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রেওয়ায়েত করেন ঃ মুসলমানরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কল্যাণকর বিষয়াদি জিজ্ঞাসা করত; কিন্তু কোন অকল্যাণকর বিষয় আমাকে পেয়ে বসে-এই ভয়ে আমি অকল্যাণকর বিষয়াদি জিজ্ঞেস করতাম। একবার আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা মূর্খতা যুগে ছিলাম এবং অনিষ্টের মধ্যে ছিলাম। আল্লাহ আমাদের কাছে এই কল্যাণ প্রেরণ করেছেন। প্রশ্ন এই যে, এই কল্যাণের পরে কোন অকল্যাণ আছে কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আছে এবং তা হচ্ছে ইসলামের পরিবর্তন। আমি আরয করলাম ঃ ইসলামের পরিবর্তন কিরূপে হবে? তিনি বললেন ঃ মানুষ আমার সুন্নত বর্জন করে অন্য তরীকা অবলম্বন করবে। আমার পথ থেকে সরে গিয়ে অন্য পথে চলবে। জাহান্নামের দরজায় আহবানকারীরা থাকবে। যারা এই আহবান কবুল করবে, তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আমি বললাম ঃ এই লোকদের পরিচিতি বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, বলছি। তারা আমাদের মধ্য থেকেই হবে এবং আমাদের ভাষায় কথাবার্তা বলবে। ইমাম আওযাঈ বলেন ঃ কল্যাণের পর প্রথম যে অকল্যাণ হবে, তা হচ্ছে রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাতের পর সংঘটিত ইরতিদাদ তথা ধর্মত্যাগের ফেতনা।

হযরত ছওবান রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের কাছে অন্যান্য উম্মত সমবেত হবে, যেমন আহারকারীরা দস্তরখানের কাছে সমবেত হয়। কেউ প্রশ্ন করল ঃ আমরা তখন সংখ্যায় কম হব কি? তিনি বললেন ঃ না, তোমরা প্রচুর সংখ্যক হবে। কিন্তু তোমরা কম মর্যাদাবান হবে, বৃক্ষের সেই পচা পত্রের মত, যা বন্যার সময় ফেনার সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়। তোমাদের শত্রুদের মন থেকে আল্লাহ তোমাদের ভয় দূর করে দেবেন এবং তোমাদের মনে "ওহন" সৃষ্টি করে দেবেন। প্রশ্ন করা হল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! ওহন কি? তিনি বললেন ঃ দুনিয়ার মহব্বত এবং মৃত্যুর প্রতি ঘৃণা।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ এমন এক কাল অবশ্যই আসবে, যখন মানুষ হালাল-হারামের পরওয়া না করেই অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে তিনি আরও বলেন ঃ আমি আমার ভাইদেরকে দেখা পছন্দ করি। সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন ঃ তোমরা আমার সাহাবী। আমার ভাই তারা, যারা এখনও আসেনি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা আমার কাছ থেকে শুন। অন্যরা তোমাদের কাছ থেকে আমার হাদীস শুনবে। তাদের কাছ থেকে পরবর্তীরা শুনবে।

আবূ বকর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি উপস্থিত, তার উচিত অনুপস্থিত ব্যক্তিকে আমার হাদীস পৌঁছিয়ে দেয়া। নিশ্চিতই যার কাছে আমার হাদীস পৌঁছবে, সে তার পূর্বসূরী অপেক্ষা অধিক মুখস্থ রাখবে।

ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ হাদীসে আছে-আল্লাহ তা'আলা আলেমগণকে মৃত্যু দিয়ে ইলমকে তুলে নেবেন। যখন কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবে না, তখন মানুষ মূর্খদেরকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করবে। তারা না জেনেই ফতোয়া দেবে। ফলে নিজেরাও গোমরাহ্ হবে এবং অপরকেও গোমরাহ্ করবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ ইলম সপ্তর্ষিমণ্ডলে থাকলেও পারস্যবাসীরা তা অর্জন করে ছাড়বে।

হযরত ওবাদা ইবনে সাবেত বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমার পরে তোমাদের এমন শাসক হবে, যে বিষয়কে তোমরা অসৎকাজ বলবে, তারা তাকে সৎকাজ বলবে। আর যে কাজকে তোমরা সৎকাজ বলবে, তারা তাকে অসৎকাজ বলবে। আল্লাহর এমন নাফরমান শাসকের আনুগত্য করা তোমাদের উপর ওয়াজেব নয়।

হিজর ইবনে আদীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমার উম্মতের একটি সম্প্রদায় শরাব পান করবে এবং তার অন্য কোন নাম রাখবে।

জাবের ইবনে সামরাহ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি- আমি উম্মতের জন্যে তিনটি বিষয়ের আশংকা করি ঃ (১) তারা তারকারাজির কাছে বৃষ্টির পানি চাইবে, (২) তাদের উপর রাজ-রাজড়াদের যুলুম হবে এবং (৩) তারা তাকদীরে অবিশ্বাস করবে।

কিয়ামতের আলামতের খবর

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের আলামত এই যে, ইলম তুলে নেওয়া হবে, মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে, মদ পান করা হবে এবং যিনা ব্যাপক আকার ধারণ করবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ কিয়ামত কবে হবে? তিনি বললেন ঃ এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে বেশী কিছু জানে না। তবে আমি তোমাকে কিছু আলামত বলে দিচ্ছি। যখন তুমি দেখবে যে, বাঁদী তার প্রভুকে প্রসব করেছে,

যখন তুমি দেখবে যে, নগ্নপদ, উলঙ্গদেহ, মূক ও বধির ভূপৃষ্ঠের বাদশাহ হয়ে গেছে, যখন তুমি দেখবে যে, গবাদি পশুর রাখালরা সুউচ্চ দালান-কোঠা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করছে, তখন মনে করবে যে, কিয়ামত আসন্ন। এগুলোই কিয়ামতের আলামত।

আমর ইবনে আওফ রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ কিয়ামতের সন্নিকটে চক্রান্ত ও প্রবঞ্চনার ব্যাপক প্রসার ঘটবে। তখন মিথ্যুককে সত্যবাদীর আসনে আসীন করা হবে এবং সত্যবাদীকে মিথ্যারোপ করা হবে। খিয়ানতকারীকে আমানতদার করা হবে এবং আমানতদার খিয়ানত করবে। মানুষের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে নীচাশয় ও ঘৃণ্য লোকদের কথাই কার্যকর হবে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের আলামত হচ্ছে এগুলো ঃ দুষ্টলোকদের প্রাচুর্য হওয়া, অপরিচিতের প্রতি সদয় হওয়া এবং আত্মীয়বর্গের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, গোত্রের মুনাফিক ব্যক্তির সরদার হওয়া, মেহরাব সুসজ্জিত ও কারুকার্য খচিত হওয়া এবং অন্তর উজাড় হওয়া, পতিত ভূমি আবাদ হওয়া এবং আবাদ ভূমি পতিত হওয়া, মদ্যপান করা এবং জারজ সন্তানদের প্রাচুর্য হওয়া। হযরত ইবনে মাসউদকে প্রশ্ন করা হল ঃ সে সব লোক মুসলমান হবে কি? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই। এমনও হবে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েও নিজের কাছে রাখবে এবং উভয়েই যিনাকার হবে।

ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে—কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত এই যে, দুষ্ট লোকদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং ভদ্রদের মর্তবা হ্রাস পাবে। কথার রাজত্ব কায়েম হবে এবং কর্ম খতম হয়ে যাবে।

ইসতিস্কার মো'জেযা

বুখারী ও মুসলিম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) আমলে অনাবৃষ্টিজনিত কারণে দুর্ভিক্ষ হয়। একবার তিনি যখন মিম্বরে খোতবা পাঠ করছিলেন, তখন জনৈক বেদুঈন এসে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! ধনসম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে এবং পরিবার-পরিজন ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছে। আপনি দোয়া করুন। হুযূর (সাঃ) হাত তুললেন। তখন আকাশ ছিল সম্পূর্ণ নির্মেঘ। কিন্তু রসূলুল্লাহর (সাঃ) হাত নামাবার আগেই পাহাড়সম মেঘমালা উত্থিত হল। এরপর মিম্বর থেকে অবতরণের পূর্বেই আমি দেখলাম যে, তাঁর দাড়ি বেয়ে বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হচ্ছে। দ্বিতীয় জুমুআ পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টি

ঝরল। সেই বেদুঈন আবার দাঁড়াল এবং আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! বসতগৃহসমূহ ধসে পড়ছে। হুযূর (সাঃ) উভয় হাত উত্তোলন করে বললেন। اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا হে আল্লাহ! আমাদের উপকারার্থে বৃষ্টি হোক–অপকারের জন্যে নয়। তিনি আপন পবিত্র হাত দিয়ে মেঘের দিকে ইশারা করতেন, অমনি মেঘ বিদীর্ণ হয়ে যেত। এই বৃষ্টিপাতের ফলে মদীনার মাটি শক্ত হয়ে গেল। মরু এলাকা জলমগ্ন হয়ে গেল। কানাত উপত্যকা দিয়ে একমাস পর্যন্ত স্রোত বইল। যে দিক থেকেই কেউ মদীনায় এল, সে একথাই বলল যে, এমন বৃষ্টিপাত পূর্বে কখনও হয়নি।

রুবাইয়' বিনতে মুয়াওয়ায রেওয়ায়েত করেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে সফরে ছিলাম। সকলেরই ওযূর পানির প্রয়োজন দেখা দিল। উষ্ট্রারোহীদের মধ্যে পানি তালাশ করা হল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলেন। বৃষ্টি বর্ষিত হল। সকলেই আপন আপন পাত্র ভরে নিল এবং তৃপ্ত হয়ে পানি পান করল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ সকলেই রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করলে তিনি ঈদগাহে চলে গেলেন। মিম্বরে বসার পর তিনি উভয় হাত উত্তোলন করলেন, এমন কি তাঁর বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা একখণ্ড মেঘ সৃষ্টি করলেন। তাতে গর্জন হল এবং বিদ্যুৎ চমকে উঠল। এরপর এত বৃষ্টিপাত হল যে, তিনি মসজিদে আসতে আসতে বন্যা প্রবাহিত হয়ে গেল।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) বিভিন্ন দোয়া
আপন পরিবারের জন্যে দোয়া

বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন পরিবারের জন্যে এই দোয়া করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, মোহাম্মদের পরিবারকে খাদ্যের রিযিক দান কর। বায়হাকী বলেন ঃ তাঁর পরিবারবর্গ খাদ্য লাভ করে এবং তারা এতে সবর করে।

হযরত ইবনে মসসউদ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে একজন মেহমান আগমন করে। তিনি পত্নীগণের এক একজনের কাছে খাদ্যের জন্যে পাঠালেন। কিন্তু কারও কাছে খাদ্য ছিল না। তিনি দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَاِنَّهٗ لَايَمْلِكُهَا اِلَّا اَنْتَ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার কৃপা ও রহমত প্রার্থনা করছি। রহমতের মালিক একমাত্র তুমিই। এই দোয়ার পর তাঁর কাছে হাদিয়া স্বরূপ ভাজা করা ছাগলের গোশত এল। তিনি বললেন ঃ এই বকরীর গোশ্‌ত আল্লাহ্ তা'আলার কৃপা ও রহমত।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর জন্যে দোয়া

ইবনে ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন পবিত্র হাত তিনবার হযরত ওমর (রাঃ)-এর বুকে মারলেন, অতঃপর এই দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَخْرِجْ مَافِىْ صَدْرِ عُمَرَ مِنْ غِلٍّ وَاَبْدِلْهُ اِيْمَانًا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! ওমরের বুকে যে হিংসা-বিদ্বেষ আছে, তা বের করে দাও এবং তাকে ঈমানে রূপান্তরিত কর। এটা তাঁর ইসলাম গ্রহণের সময়কার ঘটনা।

হযরত আলী (রাঃ)-এর জন্যে দোয়া

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একবার আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। হুযূর (সাঃ) আমাকে দেখতে এলেন। আমি তখন এই দোয়া করছিলাম— হে আল্লাহ! যদি আমার মৃত্যুক্ষণ এসে থাকে, তবে আমাকে স্বস্তি দাও। যদি মৃত্যুতে বিলম্ব থাকে, তবে আরোগ্য দান কর। আর যদি এই রোগ পরীক্ষার্থে হয়, তবে আমাকে সবর দান কর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার জন্যে এই দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اشْفِهِ اَللّٰهُمَّ عَافِهِ-

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তাকে আরোগ্য দান কর। হে আল্লাহ! তাকে নিরাপত্তা দান কর। অতঃপর তিনি বললেন ঃ দাঁড়িয়ে যাও। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। এখন পর্যন্ত পুনরায় সেই রোগ আমার হয়নি।

হযরত জাবের (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে এক মহিলার দাওয়াতে গেলাম। সে একটি ছাগল যবেহ করল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ একজন জান্নাতী এসে গেছে। দেখা গেল হযরত আবূ বকর (রাঃ) এসেছেন। এরপর তিনি বললেন ঃ জান্নাতীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আসবে। দেখা গেল হযরত ওমর (রাঃ) এসেছেন। তিনি আবার বললেন ঃ জান্নাতীদের একজন আসবে। হে আল্লাহ, তুমি চাইলে সে যেন আলী হয়। সেমতে আলীই এলেন।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর জন্যে দোয়া

কায়স ইবনে আবী হাযেম রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সা'দ (রাঃ)-এর জন্যে এই দোয়া করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اسْتَجِبْ لَهُ اِذَا دَعَاكَ হে আল্লাহ! যখন সা'দ দোয়া করে, তুমি কবুল কর।

হযরত সা'দ (রাঃ)-ও অনুরূপ দোয়া করার কথা রেওয়ায়েত করেছেন। এরপর থেকে তিনি যে দোয়া করতেন, তা কবুল হত।

হযরত আবূ বকর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সা'দের জন্যে এই দোয়া করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ سَدِّدْ سَهْمَهُ وَاَجِبْ دَعْوَتَهُ وَحَبِّبْهُ হে আল্লাহ! সাদের তীরকে সোজা রাখ, তার দোয়া কবুল কর এবং তাকে প্রিয় করে নাও।

হযরত জাবের ইবনে সামরাহ্ রেওয়ায়েত করেন ঃ কূফাবাসীদের কিছু লোক সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের বিরুদ্ধে খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে অভিযোগ করে। হযরত ওমর (রাঃ) অবস্থা সরে জমিনে তদন্ত করার জন্যে এক ব্যক্তিকে সা'দের সঙ্গে কূফায় প্রেরণ করলেন। সে সা'দকে কূফার প্রত্যেকটি মসজিদে নিয়ে গেল এবং লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করল। সা'দ সম্পর্কে কেউ ভাল ছাড়া মন্দ বলল না। অবশেষে সে এক মসজিদের নিকটে আবূ সা'দা নামক এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল ঃ আপনি কসম দিয়েছেন। তাই বলছি —সা'দ সমান বন্টন করেন না, লশকরের মধ্যে যান না এবং ন্যায় বিচার করেন না। সা'দ একথা শুনে অভিযোগকারীকে এই বলে বদদোয়া দিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ كَاذِبًا فَاَطِلْ عُمْرَهُ وَاَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার বয়ঃক্রম দীর্ঘ কর এবং দীর্ঘ কর তার দারিদ্র্যকে, আর তাকে ফেতনার শিকার কর।

ইবনে ওমায়র (রাঃ) বলেন ঃ আমি এই আবূ সা'দাকে অশীতিপর বৃদ্ধ অবস্থায় দেখেছি। বার্ধক্যের কারণে ভ্রূযুগল চোখের ভেতরে পড়ে গিয়েছিল। সে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল। পথিমধ্যে ছোট বালিকাদেরকে উত্ত্যক্ত করত। কেউ তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলে সে বলত ঃ আমি অশীতিপর বৃদ্ধ। আমি ফেতনায় পতিত হয়েছি, সা'দের বদদোয়া লেগে গেছে।

মুসয়িব ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন ঃ সা'দ কূফায় খোতবা দেওয়ার পর উপস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কেমন শাসক? এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল ঃ আমার ধারণায় আপনি জনগণের ব্যাপারাদিতে ইনসাফ করেন না, সমান বন্টন করেন না, সৈন্যদের মধ্যে অবস্থান করে জেহাদ করেন না। সা'দ এ কথা শুনে বললেন ঃ হে আল্লাহ, লোকটি মিথ্যাবাদী হলে তাকে অন্ধ করে দাও। তাকে নিঃস্ব করে দাও। তার আয়ু দীর্ঘ করে ফেতনায় জড়িত করে দাও। সেমতে সে অন্ধ ও দরিদ্র হয়ে ভিক্ষা করতে থাকে এবং অবশেষে মিথ্যাবাদী মুখতারের ফেতনায় নিহত হয়।

কায়স রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)-কে গালমন্দ করল। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস শুনে এই বদদোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ, এই ব্যক্তি তোমার ওলীকে গালমন্দ করেছে। অতএব সমাবেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই তুমি তোমার কুদরত দেখিয়ে দাও। কায়স বলেন ঃ আমরা তখনও বিচ্ছিন্ন হইনি, এমতাবস্থায় লোকটি ঘোড়া থেকে উপুড় হয়ে পাথরের উপর পড়ে গেল। ফলে মস্তিষ্ক ফেটে গিয়ে অকুস্থলেই মারা গেল।

মুসয়িব ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন ঃ হযরত সা'দ এক ব্যক্তিকে বদদোয়া দিলেন। কোথা থেকে একটি ক্ষেপা উষ্ট্রী এসে লোকটিকে মেরে ফেলল। সা'দ ব্যথিত হয়ে একটি গোলাম মুক্ত করলেন এবং কসম খেলেন যে, আর কখনও কাউকে বদদোয়া দেবেন না।

ইবনুল মুসাইয়িব রেওয়ায়েত করেন ঃ মারওয়ান বলল ঃ এই ধনসম্পদ আমার। আমি যাকে চাইব, দেব। একথা শুনে হযরত সা'দ উভয় হাত তুলে বললেন ঃ বদদোয়া করব? মারওয়ান দৌড়ে এসে সা'দকে গলায় লাগিয়ে বলল ঃ হে আবূ ইসহাক, বদদোয়া করবেন না। এই ধনসম্পদ আল্লাহর।

ইয়াহইয়া ইবনে আবদুর রহমান ইবনে লবীদ আপন দাদা থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ সা'দ (রাঃ) দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ, আমার শিশু পুত্ররা ছোট। অতএব তাদের যুবক হওয়া পর্যন্ত আমার মৃত্যু বিলম্বিত কর। সেমতে সা'দ আরো বিশ বছর পরে ওফাত পান।

আমের ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন ঃ সা'দ (রাঃ) একবার এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে গমন করছিলেন। সে হযরত আলী, তালহা ও যুবায়র (রাঃ)-কে গালমন্দ করছিল। সা'দ তাকে বললেন ঃ তুমি এমন ব্যক্তিবর্গকে গালমন্দ করছ, যাদের সম্পর্কে আল্লাহর ফয়সালা চূড়ান্ত হয়ে গেছে। অতএব তাদেরকে গালমন্দ করা থেকে তোমার বিরত থাকা উচিত। নতুবা আমি তোমাকে বদদোয়া দেব। এতে লোকটি মুখ ভ্যাংচিয়ে বলতে লাগল ঃ আহা রে, তিনি আমাকে এমন ভয়

দেখাচ্ছেন, যেন তিনি কোন নবী-রসূল, যা দোয়া করবেন, তাই কবুল হয়ে যাবে। অতঃপর সা'দ এই বলে বদদোয়া দিলেন ঃ হে আল্লাহ, এই লোকটি তাদেরকে গালমন্দ করছে, যাদের সম্পর্কে তোমার ফয়সালা অকাট্য হয়ে গেছে। অতএব আজই তুমি তাকে শাস্তি দাও। দেখা গেল, একটি উষ্ট্রী এগিয়ে আসছে। লোকেরা তাকে পথ দিয়ে দিল। সে এসেই লোকটিকে পদতলে পিষ্ট করে দিল। লোকজন সা'দের পেছনে পেছনে গেল এবং বলল ঃ হে আবূ ইসহাক, আল্লাহ তা'আলা আপনার দোয়া কবুল করেছেন।

মালেক ইবনে রবীআর জন্যে দোয়া

মালেক ইবনে রবীআ সলূলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার জন্যে দোয়া করেন, যাতে তার সন্তানদের মধ্যে বরকত হয়। সেমতে তার আশিজন পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

আবদুল্লাহ ইবনে ওতবার জন্যে দোয়া

আবদুল্লাহ ইবনে ওতবার উম্মে ওয়ালাদ রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি আমার প্রভু আবদুল্লাহ ইবনে ওতবাকে প্রশ্ন করলাম ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) কোন্ বিষয়টি আপনার স্মৃতিতে আছে? তিনি বললেন ঃ আমি যখন পাঁচ অথবা সাত বছরের ছিলাম, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে আপন কোলে বসান এবং আমার ও আমার সন্তানদের জন্যে দোয়া করেন। এই দোয়ার বরকতে আমরা বুড়ো হইনি।

নাবেগার জন্যে দোয়া

ইয়ালা ইবনে আশদাক (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি নাবেগা জা'দীকে বলতে শুনেছি যে, সে রসূলুল্লাহর (সাঃ) সামনে কবিতা পাঠ করলে তিনি তা পছন্দ করেন এবং এই বলে দোয়া করেন– لَا يَفْضُضِ اللّٰهُ فَاكَ আল্লাহ তোমার মুখাবয়বকে অবিকৃত রাখুন। রাবী বলেন ঃ আমি নাবেগাকে একশ দশ বছর বয়সে দেখেছি তার কোন দাঁত ভাঙ্গেনি।

ইবনে আবী উসামা থেকেও এই রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তাতে বলা হয়েছে–দাঁতের ব্যাপারে নাবেগা সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিল। তার কোন দাঁত পড়ে গেলে তদস্থলে নতুন দাঁত গজিয়ে উঠত।

ইবনুস সাকান রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) দোয়ার বরকতে নাবাগার দাঁত শিলার চেয়েও অধিক শুভ্র ছিল।

ছাবেত ইবনে ইয়াযীদের জন্যে দোয়া

ইবনে আয়েয রেওয়ায়েত করেন যে, ছাবেত ইবনে ইয়াযীদ আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার পা খোঁড়া, মাটি স্পর্শ করে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার জন্যে দোয়া করলেন। ফলে তার পা ভাল হয়ে গেল এবং মাটি স্পর্শ করতে লাগল।

মেকদাদের জন্যে দোয়া

মেকদাদ-পত্নী খাবা বিনতে যুবায়র (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একদিন মেকদাদ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে বাকীতে যেয়ে এক জনশূন্য জায়গায় বসে গেলেন। সেখানে একটি ইঁদুর একটি গর্ত থেকে বের হল এবং একটি দীনার এনে তার কাছে রাখল। এরপর আরও একটি দীনার এনে রাখল। এমনিভাবে একের পর এক করে সে সতেরটি দীনার এনে রাখল। মেকদাদ সেই দীনারগুলো নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে এলেন। হুযুর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আপন হাত গর্তে ঢুকিয়েছিলে? মেকদাদ বললেন ঃ না। হুযুর (সাঃ) বললেন ঃ এসব দীনার থেকে খয়রাত করা তোমার উপর ওয়াজেব নয়। আল্লাহ তা'আলা এসব দীনারে তোমাকে বরকত দান করুন। খাবা বলেন ঃ এসব দীনারের শেষ সংখ্যাটি খতম হয় না। আমি মেকদাদের কাছে উৎকৃষ্ট রূপা দেখেছি।

খমরাহ ইবনে ছা'লাবার জন্যে দোয়া

খমরাহ ইবনে ছা'লাবা রেওয়ায়েত করেন ঃ তিনি রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আমার জন্যে শাহাদতের দোয়া করুন। তিনি এই দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحَرِّمُ دَمَ ابْنِ ثَعْلَبَةَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ -

হে আল্লাহ! আমি ইবনে ছালাবার রক্ত মুশরিকদের উপর হারাম করছি। সেমতে তিনি সারা জীবন মুশরিকদের উপর হামলা করে গেছেন। তিনি মুশরিকদের সারি ভেদ করে অগ্রে চলে যেতেন এবং ছহি সালামতে ফিরে আসতেন।

জনৈক ইহুদীর জন্যে দোয়া

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে ঃ জনৈক ইহুদী নবী করীম (সাঃ)-এর নিকটে উপবিষ্ট ছিল। তিনি হাঁচি দিলে ইহুদী يَرْحَمُكَ اللّٰهُ

(আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন।) কলেমাটি পাঠ করল। এর জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) هَدَاكَ اللّٰهُ (আল্লাহ তোমাকে হেদায়াত করুন।) বললেন। ফলশ্রুতিতে সেই ইহুদী মুসলমান হয়ে গেল।

যিনার অনুমতি প্রসঙ্গে

আবূ উমামা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ জনৈক যুবক রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে যিনার অনুমতি দিন। একথা শুনা মাত্রই যা হবার তাই হল। উপস্থিত সাহাবীগণ দ্রুত যুবকটির দিকে ধাবিত হলেন এবং তাকে কঠোর ভাষায় শাসাতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সস্নেহে যুবকটিকে বললেন ঃ আমার কাছে এস। সে ভয়ে ভয়ে নিকটে এল। হুযুর (সাঃ) বললেন ঃ বসে যাও। সে বসে গেল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি তোমার মায়ের সাথে যিনা করা পছন্দ করবে? যুবক বলল ঃ না। হুযুর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি যেমন মায়ের সাথে যিনা করা পছন্দ কর না, তেমনি কোন ব্যক্তিই তার মায়ের সাথে যিনা করা পছন্দ করে না। অতঃপর তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি তোমার কন্যার সাথে যিনা করা পছন্দ করবে কি? সে বলল ঃ না। হুযুর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি যেমন আপন কন্যার সাথে যিনা করা পছন্দ কর না, তেমনি কোন ব্যক্তিই তার কন্যার সাথে যিনা করা পছন্দ করে না। এরপর তিনি প্রশ্ন রাখলেন ঃ তুমি তোমার বোনের সাথে যিনা করা পছন্দ করবে কি? যুবক উত্তর দিল ঃ আমি বোনের সাথে যিনা করা পছন্দ করতে পারি না। হুযুর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি যেমন আপন বোনের সাথে যিনা করা পছন্দ কর না, তেমনি কোন ব্যক্তিই তার বোনের সাথে যিনা করা পছন্দ করতে পারে না। এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি তোমার ফুফুর সাথে যিনা করবে কি? যুবক উত্তর দিল ঃ না। হুযুর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি যেমন আপন ফুফুর সাথে যিনা করা পছন্দ কর না, তেমনি যে-কোন ব্যক্তি তার ফুফুর সাথে যিনা করা পছন্দ করে না। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি তোমার খালার সাথে যিনা করা পছন্দ করবে কি? যুবক বলল ঃ না। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি যেমন তোমার খালার সাথে যিনা করা পছন্দ কর না, তেমনি অন্য লোকেরাও করে না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন পবিত্র হাত যুবকের মাথায় রাখলেন এবং এই দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَاَحْصِنْ فَرْجَهُ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি এর গোনাহ মার্জনা কর, এর অন্তর পবিত্র কর এবং এর যৌনাঙ্গকে পাপমুক্ত রাখ।

এরপর থেকে এই যুবক কোন প্রকার কুকর্মের প্রতি কখনও ভ্রূক্ষেপ করেনি।

হযরত উবাই ইবনে কা'বের জন্যে দোয়া

সোলায়মান ইবনে সরদ রেওয়ায়েত করেন ঃ উবাই ইবনে কা'বের সামনে দু'ব্যক্তি একটি আয়াতের কেরাআত (পঠনপদ্ধতি) নিয়ে মতবিরোধ করছিল। তাদের প্রত্যেকেই বলছিল যে, আমাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আয়াতটি এমনিভাবে পাঠ করিয়েছেন। হযরত উবাই তাদের উভয়কে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নিয়ে গেলেন। হুযূর (সাঃ) উভয়ের পাঠ শুনে বললেন ঃ উভয়েই সঠিক পাঠ করেছে। উবাই বলেন ঃ একথা শুনে আমার মনে মূর্খতা যুগের চাইতেও ভয়ংকর সন্দেহ সৃষ্টি হল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার অবস্থা আঁচ করে আমার বুকে হাত মেরে দোয়া করলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنْهُ الشَّيْطَانَ হে আল্লাহ! তার মন থেকে শয়তান দূরে করে দাও। এর সাথে সাথে আমার সর্বাঙ্গে ঘর্ম প্রবাহিত হতে লাগল। আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি ভীত অবস্থায় আল্লাহ পাককে নিরীক্ষণ করে যাচ্ছি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর জন্যে দোয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার জন্যে এই দোয়া করেন-

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ হে আল্লাহ! তাকে ধর্মে গভীর পাণ্ডিত্য দান কর। অন্য এক রেওয়ায়েতে এর সাথে وَعَلِّمْهُ التَّاوِيْلَ (এবং তাকে সদর্থ শিক্ষা দাও)-ও বলা হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আরও রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার জন্যে প্রজ্ঞার দোয়া করলেন। বলা বাহুল্য, আমার জন্যে তাঁর দোয়া কবুল হয়েছে।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের জন্যে এই দোয়া করেন اللهم بارك فيه وانشر منه হে আল্লাহ, তার মধ্যে বরকত দাও এবং তার তরফ থেকে সম্প্রচার কর।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-এর জন্যে দোয়া

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন! রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার জন্যে এই দোয়া করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ لَهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا رَزَقْتَهُ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তার ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য দান কর এবং তাকে প্রদত্ত রিযিকে বরকত দাও। হযরত আনাস বলেন ঃ এখন আমার কাছে প্রচুর ধন-সম্পদ রয়েছে এবং পুত্র-পৌত্রের সংখ্যা এক শ'। আমার কন্যা আমেনা বলেছে যে, বসরায় হাজ্জাজের আগমন পর্যন্ত আমার ঔরসজাত একশ' উনত্রিশ জনকে দাফন করা হয়েছে।

আবুল আলিয়া থেকে বর্ণিত আছে ঃ হযরত আনাস (রাঃ)-এর একটি বাগান ছিল, যাতে বছরে দু'বার ফল ধরত। এই বাগানে এক প্রকার ফুল ছিল, যা থেকে মেশকের সুগন্ধি ভেসে আসত।

হুমায়দ বর্ণনা করেন যে ঃ হযরত আনাস (রাঃ) নিরানব্বই বছর বয়ঃক্রম পান এবং ৯১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, নবী করীম (সাঃ) আমার জন্যে এই দোয়া করেন اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهٗ وَوَلَدَهٗ وَاَطِلْ عُمْرَهٗ وَاغْفِرْ لَهٗ হে আল্লাহ, তাকে প্রচুর ধনসম্পদ ও সন্তানাদি দান কর, তার আয়ু দীর্ঘ কর এবং তার মাগফেরাত কর। এই দোয়ার বরকত এই যে, আমি আমার ঔরসজাত সন্তানদের মধ্য থেকে একশ জনকে দাফন করেছি। আমার বাগানে বছরে দুবার ফল ধরে। আমি এত দীর্ঘ বয়ঃক্রম পেয়েছি যে, জীবন এখন বিষাদময় হয়ে গেছে। আমি আল্লাহর কাছে মাগফেরাত আশা করি।

হযরত আবূ হুরায়রা ও তাঁর জননীর জন্যে দোয়া

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ ভূপৃষ্ঠে যত মুমিন আছে, আমি তাদের সকলের প্রিয়। রাবী প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি কি কারণে এই দাবী করছেন? তিনি বললেন ঃ আমি আমার জননীকে ইসলামের দাওয়াত দিতাম; কিন্তু তিনি সাড়া দিতেন না। আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে আরয করলাম ঃ আপনি আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করুন, যাতে আমার মায়ের ইসলামের প্রতি হেদায়াত হয়। হুযূর (সাঃ) দোয়া করলেন। এরপর আমি সেখান থেকে ফিরে গৃহে প্রবেশ করতেই মা বলে উঠলেন ঃ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। একথা শুনে আমি মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে পৌঁছলাম। আনন্দের আতিশয্যে আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ ছিল। আমি বললাম, আপনার দোয়া আল্লাহ কবুল করেছেন। আমার মা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এখন আপনি দোয়া করুন, যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আমার মাকে সকল মুমিনের প্রিয় করে দেন এবং তাদেরকে আমাদের প্রিয় করে দেন। হুযূর (সাঃ) এই বলে দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ عَبْدَكَ هٰذَا وَاُمَّهٗ اِلٰى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَحَبِّبْهُمْ اِلَيْهِمَا -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার এই বান্দাকে এবং তার মাকে তোমার মুমিন বান্দাদের প্রিয় করে দাও এবং তাদেরকে এই দু'জনের প্রিয় করে দাও। একারণেই ভূপৃষ্ঠের সকল মুমিন নারী ও পুরুষ আমাকে প্রিয় মনে করে। আমিও তাদেরকে প্রিয় মনে করি।

মোহাম্মদ ইবনে কায়স ইবনে মাখরামা রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ব্যক্তি যায়দ ইবনে ছাবেতের কাছে এসে কিছু জিজ্ঞাসা করল। যায়দ বললেন ঃ তুমি আবূ হুরায়রাকে ছাড়বে না। কেননা, আমি, আবূ হুরায়রা এবং তৃতীয় এক ব্যক্তি মসজিদে দোয়া করছিলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বাইরে এলেন। তৃতীয় ব্যক্তিটির দোয়ার সাথে রসূলুল্লাহ (সাঃ) "আমীন" বলছিলেন। এরপর আবূ হুরায়রা এই দোয়া করলেন ঃ

اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِثْلَ مَاسَئَلَكَ صَاحِبَاىَ وَاَسْئَلُكَ عِلْمًا لَايُنْسٰى

অর্থাৎ, আমি তোমার কাছে তেমনি প্রার্থনা করি, যেমন আমার সঙ্গীদ্বয় করেছে। আমি এমন জ্ঞান চাই, যা বিস্মৃত হয় না। নবী করীম (সা) "আমীন" বললেন। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমিও আল্লাহ তা'আলার কাছে এমন জ্ঞানের দোয়া করি, যা বিস্মৃত হয় না। তিনি বললেন ঃ এই দওসী তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে।

সায়েব (রাঃ)-এর জন্যে দোয়া

জাঈদ ইবনে আবদুর রহমান রেওয়ায়েত করেন, সায়েব ইবনে ইয়াযীদ ৯৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি প্রখর, চালাক এবং সুষম মেযাজের অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেন ঃ আমি জানি যে, নবী করীম (সাঃ)-এর দোয়ার কারণেই আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কার্যকর আছে।

আবদুর রহমান ইবনে আওফের জন্যে দোয়া

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েতে করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) আবদুর রহমান ইবনে আওফকে বললেন بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন।

অন্য এক রেওয়ায়েত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন ঃ

রসূলুল্লাহর (সাঃ) দোয়ার বরকতে আমি আশা করি যে, আমি কোন পাথর তুললে তার নীচ থেকেও স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য বের হবে।

ওরওয়া বারেকীর জন্য দোয়া

ওরওয়া বারেকী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) তাঁর জন্যে ক্রয়-বিক্রয়ে বরকতের দোয়া করেন। তিনি মাটি ক্রয় করলেও তাতে মুনাফা হত।

তিনি আরও রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) আমার জন্যে দোয়া করেন ঃ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْ صَفْقَةِ يَمِيْنِكَ (আল্লাহ তোমার ব্যবসায়ে বরকত দিন।) এই দোয়ার পর আমি কেনাসার বাজারে দাঁড়িয়ে যেতাম এবং ফিরে আসার আগে আগে আমার চল্লিশ হাজার দেরহাম মুনাফা হয়ে যেত।

আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ)-এর জন্যে দোয়া

আমর ইবনে হারীছ রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফরের কাছে চলে গেলেন। তিনি তখন কোন বস্তু বিক্রয় করছিলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهٗ فِيْ تِجَارَتِهٖ হে আল্লাহ, তার ব্যবসায়ে বরকত দাও।

উম্মে সুলায়মের (রাঃ) গর্ভের জন্যে দোয়া

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আবূ তালহা (রাঃ)-এর এক পুত্র অসুস্থ হয়ে মারা গেল। তখন আবী তালহা গৃহে ছিলেন না। তার পত্নী কিছু প্রস্তুত করে গৃহের কোণে রেখে দিলেন। আবী তালহা গৃহে ফিরে পত্নীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ছেলে কেমন? পত্নী বললেন ঃ আরামেই আছে। তিনি পত্নীর কথা সঠিক মনে করে ঘুমিয়ে পড়লেন। প্রত্যুষে উঠে গোসল করে যখন বাইরে যেতে লাগলেন, তখন পত্নী বললেন ঃ ছেলে মারা গেছে। আবী তালহা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে ফজরের নামায পড়লেন এবং তাঁকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উভয়কে আজ রাতে বরকত দিবেন। সুফিয়ান বলেন ঃ আমি তার নয়টি সন্তান দেখেছি, যাদের প্রত্যেকেই কোরআন পাঠ করেছে।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ তালহার ঔরসজাত উম্মে সুলায়েমের এক পুত্র মারা গেলে উম্মে সুলায়ম তাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন।

আবূ তালহা গৃহে এসে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ছেলে কেমন? উম্মে সুলায়ম বললেন ঃ আরামে আছে। অতঃপর আবূ তালহা রাতের খানা খেলেন। উম্মে সুলায়ম স্বামীকে বললেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে কোন জিনিস ধার দেয়, এরপর তা ফিরিয়ে নেয়, তবে এই ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে তুমি দুঃখ করবে? আবূ তালহা বললেন ঃ না। উম্মে সুলায়ম বললেন ঃ আল্লাহ তোমাকে একটি পুত্র ধার দিয়েছিলেন। এখন তা ফিরিয়ে নিয়েছেন। ভোর বেলায় আবূ তালহা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলেন এবং উম্মে সুলায়মের উক্তি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উভয়কে বরকত দিন।

উম্মে সুলায়ম বলেন ঃ এরপর আমার পুত্র আবদুল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করল। রাবীগণ বর্ণনা করেন, এই পুত্র অত্যন্ত সৎকর্মপরায়ণ ছিল। তার সমবয়সীদের মধ্যে কেউ তার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিল না। এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এই শিশুকে নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে আনা হলে তিনি তার তালুতে খোরমা ঘষে দিলেন।

অতঃপর তার কপালে হাত রাখলেন এবং আবদুল্লাহ নাম রাখলেন। পবিত্র হাতের পরশে তার মুখমণ্ডল নূরোজ্জ্বল হয়ে যায়।

আবদুল্লাহ ইবনে হেশামের জন্যে দোয়া

বুখারী আবূ আকীল থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ আকীলকে তাঁর দাদা খাদ্যশস্য কেনার জন্যে বাজারে নিয়ে যেতেন। সেখানে ইবনে যুবায়র ও ইবনে ওমর (রাঃ)-এর সাথে দেখা হলে তারা বলতেন ঃ আমাদেরকে তোমার অংশীদার করে নাও। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমার জন্যে বরকতের দোয়া করেছেন। আবদুল্লাহ তাদেরকে শরীক করে নিতেন এবং প্রায়ই তারা মুনাফায় আস্ত উট পেয়ে যেতেন।

হাকীম (রাঃ) ইবনে হেযামের জন্যে দোয়া

মদীনার জনৈক শায়খ রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোরবানীর জন্তু ক্রয় করার জন্যে হাকীম (রাঃ) ইবনে হেযামকে একটি দীনার দিয়ে বাজারে প্রেরণ করলেন। তিনি একটি জন্তু ক্রয় করলেন, অতঃপর জন্তুটি দু'দীনার বিক্রয় করে দিলেন। এরপর একটি জন্তু ও একটি দীনার নিয়ে ফিরে এলেন। হুযূর (সাঃ) তাকে দোয়া দিলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ হাকীম ইবনে হেযামকে কারবারে বরকত দিন।

ইবনে সা'দ হাকীম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি ব্যবসায়ে অত্যন্ত

ভাগ্যবান ছিলেন। তিনি যেকোন বস্তু বিক্রয় করেছেন, তাতে অবশ্যই মুনাফা হয়েছে।

কোরায়শের জন্যে দোয়া

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কুরায়শের জন্যে এই দোয়া করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ كَمَا اَذَقْتَ اَوَّلَ قُرَيْشٍ نَكَالًا فَاَذِقْ اٰخِرَهَا نَوَالًا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, তুমি যেমন প্রথম কোরায়শকে শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করিয়েছ, তেমনি শেষ কোরায়শকে নেয়ামতের স্বাদ আস্বাদন করাও।

অহংকার প্রসঙ্গে

ইবনে সাদ বলেন ঃ খালিদ ইবনে ওসায়দ ভীষণ অহংকারী ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি মুসলমান হন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে দেখে বললেন ঃ হে আল্লাহ, তার অহংকার বৃদ্ধি কর। সেমতে আজ পর্যন্ত তার বংশধরের মধ্যে অহংকার বিদ্যমান আছে।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) সারগর্ভ দোয়াসমূহ

ইবনে ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ জনৈকা মহিলা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি তোমার স্বামীকে ঘৃণা কর? সে বলল ঃ হ্যাঁ। হুযূর (সাঃ) স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বললেন ঃ তোমরা তোমাদের মাথা কাছাকাছি কর। অতঃপর তিনি স্ত্রীর কপালকে স্বামীর কপালের উপর রাখলেন এবং এই দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَلِّفْ بَيْنَهُمَا وَحَبِّبْ اَحَدَهُمَا اِلٰى صَاحِبِهٖ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তাদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি কর এবং একজনকে অপর জনের প্রিয় করে দাও।' এর কিছুদিন পর মহিলা হুযূর (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর পদচুম্বন করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এবং তোমার স্বামী এখন কেমন? মহিলা বলল ঃ খুব ভাল। জগতের কোন ধনসম্পদ অথবা সন্তান-সন্ততি এখন আমার কাছে আমার স্বামী অপেক্ষা অধিক প্রিয় নয়। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ اَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আমি আল্লাহর রসূল।

আবূ উমামা রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক যুদ্ধে ছিলেন। আমি তাঁর কাছে এসে বললাম ঃ আপনি আমার শাহাদতের দোয়া করুন। তিনি এই দোয়া করলেন ঃ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ হে আল্লাহ, তাদেরকে সালামত রাখ এবং গনীমত দান কর।

সেমতে আমরা জেহাদ করলাম এবং অক্ষত রইলাম। গনীমতও হস্তগত হল। এরপর অন্য এক জেহাদের সময় আমি তাঁর কাছে এসে জেহাদের দোয়া চাইলে তিনি উপরোক্ত দোয়া করলেন। এবারও আমরা সহীহ সালামতে জেহাদ করলাম এবং গনীমত পেলাম।

হযরত যায়দ ইবনে ছাবেত রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার রসূলে করীম (সাঃ) ইয়ামনের দিকে তাকিয়ে এই দোয়া করলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اَقْبِلْ بِقُلُوْبِهِمْ হে আল্লাহ, তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট কর। এরপর সিরিয়ার দিকে তাকিয়ে একই দোয়া করলেন এবং ইরাকের দিকে তাকিয়ে একই দোয়া করলেন।

সালামাহ ইবনে আকওয়া রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহর (সাঃ) উপস্থিতিতে বাম হাতে আহার করছিল। তিনি বললেন ঃ ডান হাতে খাও। সে বলল ঃ আমার ডান হাত উঠে না। হুযুর (সাঃ) বললেন ঃ উঠে। একমাত্র অহংকারই তার উঠার পথে অন্তরায়। রাবী বলেন ঃ এরপর ঐ ব্যক্তির ডান হাত কখনও মুখের দিকে যায়নি।

ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সবিয়া আসলামীকে বাম হাতে খেতে দেখে বললেন ঃ একে গাররা নামক স্থানের রোগে ধরেছে। এরপর সাবিয়া যখন গাররা গেল, তখন প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে জনৈক ইহুদী নিহত হলে তিনি এ ঘটনাকে আপন খেলাফতের জন্যে একটি গুরুতর কলংকজনক ঘটনা মনে করেন। তিনি অস্থির হয়ে মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং বললেন ঃ মানুষকে হত্যা করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা আমাকে খলীফা ও শাসনকর্তা করেননি। এই ইহুদীর হত্যা সম্পর্কে যে ব্যক্তি জানে, আমি তাকে আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করে বলছি, সে আমাকে বলুক। বকর ইবনে শাদ্দাখ খলীফার কাছে যেয়ে বললেন ঃ আমি এই ইহুদীকে হত্যা করেছি। খলীফা বললেন ঃ আল্লাহু আকবার! তুমি এই ইহুদীকে হত্যার কথা স্বীকার করছ? তুমি আপন মুক্তির জন্যে কোন প্রমাণ

উপস্থিত কর। বকর বললেন ঃ প্রমাণ আছে এবং তা এই যে, অমুক ব্যক্তি জেহাদে চলে গেছে। সে তার পরিবার-পরিজনকে আমার দায়িত্বে সোপর্দ করে গেছে। আমি একবার তার গৃহে এসে এই ইহুদীকে সেখানে উপস্থিত পেলাম। সে এই কবিতা আবৃত্তি করছিল ঃ

واشعت غرة الاسلام حتى

خلوت بعرسه ليل التمام

ابيت على ترائبها واسى   على قواء لاحبه الحزام

كان مجامع الربلات منها   قيام ينهضن الى قيام

ইসলামের ধোকায় পতিত এলোকেশী ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে আমি সারারাত নির্জনবাস করেছি। আমি তার স্ত্রীর বক্ষের উপর রাত্রি অতিবাহিত করেছি। আর সে সর্বদা সফরে থাকা উষ্ট্রীর উপর শয়ন করেছে। এই রমণীর স্তনের আশে পাশে স্তরে স্তরে মাংস রয়েছে। সে খুব মোটা।

রাবী বলেন ঃ খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) বকরের বিবৃতি সত্য মনে করলেন এবং নবী করীম (সাঃ)-এর দোয়ার কারণে খুনের বদলে খুন বাতিল করে দিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার বললেন ঃ মোয়াবিয়াকে ডেকে আন। আমি বললাম ঃ সে আহার করছে। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ডেকে আনতে বললেন; কিন্তু প্রত্যেক বারই জওয়াব এল, সে আহার করছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ لَا اَشْبَعَ اللّٰهُ بَطْنَهٗ আল্লাহ তার পেট না ভরুন। এই দোয়ার পর মোয়াবিয়ার পেট কখনও ভরেনি।

ওয়াহ্শী রেওয়ায়েত করেন, একবার মোয়াবিয়া রসূলুল্লাহর (সাঃ) পেছনে উটে সওয়ার ছিলেন। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ মোয়াবিয়া, তোমার শরীরের কোন্ অংশটি আমার শরীরের সাথে মিলিত আছে? মোয়াবিয়া (রাঃ) বললেন ঃ আমার পেট। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ اَللّٰهُمَّ اِمْلَاْهُ حِلْمًا وَّعِلْمًا হে আল্লাহ, তার পেটকে জ্ঞান ও সহনশীলতায় পূর্ণ করে দাও।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর মুক্ত ক্রীতদাস ফরুজ রেওয়ায়েত করেন ঃ হযরত

ওমর (রাঃ)-কে কেউ বলল, অমুক অমুক ব্যক্তি চড়াদামে শস্য বিক্রয় করার জন্যে গুদামজাত করেছে। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি— যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য গুদামজাত করবে, আল্লাহ্ তাকে কষ্ট কিংবা নিঃস্বতার রোগে আক্রান্ত করবেন। হযরত ওমর (রাঃ)-এর গোলাম বলল ঃ আমরা নিজ অর্থ দিয়ে খাদ্যশস্য ক্রয় করি এবং বিক্রয় করি। রাবী বলেন ঃ আমি কিছুদিন পরে এই গোলামকে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত দেখেছি।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে নামাযে চুল মাটি লেগে যাওয়া থেকে বাঁচাতে দেখে বললেন ঃ اَللّٰهُمَّ قَبِّحْ شَعْرَهُ হে আল্লাহ, তার চুলকে কুৎসিত করে দাও। হযরত আনাস বলেন ঃ এরপর লোকটির মাথার চুল পড়ে গেল।

আবদুল মালেক ইবনে হারূন রেওয়ায়েত করেন ঃ আবূ হুরওয়ান ছিল বনী আমরের উটের রাখাল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কোরায়শদের ভয়ে গৃহ থেকে বের হয়ে পড়েন, তখন বনী আমরের উটের পালে এসে আশ্রয় নেন। আবূ হুরওয়ান তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কে? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি এক ব্যক্তি, তোমার উটগুলোর মধ্যে বিশ্রাম নিতে চাই। আবূ হুরওয়ান বলল ঃ আমি বুঝি। আপনি সেই ব্যক্তি, যে নবুওয়ত দাবী করেছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ হাঁ, তাই। রাখাল বলল ঃ তা হলে আপনি এখান থেকে চলে যান। আপনার উপস্থিতির কারণে আমার উটগুলো অলক্ষুণে হয়ে যাবে। হুযূর (সাঃ) তাকে এই বলে বদ দোয়া দিলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اَطِلْ شَقَاءَهُ وَبَقَاءَهُ হে আল্লাহ, তার হতভাগ্যতা ও বেঁচে থাকাকে সুদীর্ঘ কর। রাবী বলেন ঃ আবূ হুরওয়ানের বয়স অনেক বেশী হয়ে গিয়েছিল। সে অহরহ মৃত্যু কামনা করত। লোকেরা তাকে বলত ঃ তুমি তো ধ্বংস হয়ে গেছ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাকে বদ দোয়া দিয়েছেন। আবূ হুরওয়ান বলত ঃ না, তা নয়। ইসলামের বিজয়ের পর আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়েছি। তিনি আমার জন্যে দোয়া করেছেন এবং মাগফেরাত কামনা করেছেন। কিন্তু প্রথম দোয়া প্রথমে কবুল হয়ে গেছে।

মুজাহিদ রেওয়ায়েত করেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি একটি উট ক্রয় করেছি। আপনি আমার জন্যে বরকতের দোয়া করুন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহ, তার জন্যে বরকত

দাও। কিছুদিন পরে উটটি মারা গেল। সে দ্বিতীয় একটি উট ক্রয় করে আবার বরকতের দোয়ার আবেদন করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) পূর্ববৎ দোয়া করলেন। কিছুদিন পরে এ উটও মারা গেল। লোকটি তৃতীয় একটি উট ক্রয় করে সেটি নিয়ে খেদমতে উপস্থিত হল। হুযূর (সাঃ) দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ احْمِلْهُ عَلَيْهِ হে আল্লাহ, তুমি তাকে এই উটে সওয়ার কর।

সেমতে উটটি তার কাছে বিশ বছর রইল। বায়হাকী বলেন ঃ বাহ্যতঃ তৃতীয় বারের দোয়া কবুল হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রথম দুবারও কবুল হয়েছে; কিন্তু আখেরাতের ক্ষেত্রে কবুল হয়েছে।

আবূ উমামা রেওয়ায়েত করেন ঃ ছালাবা ইবনে হাতেব রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি দোয়া করুন, যাতে আমার ধনসম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি নসীব হয়। হুযূর, বললেন ঃ শুন, যে অল্প ধনসম্পদ পেয়ে আল্লাহ তা'আলার শোকর করা হয়, তা সেই বেশী ধনসম্পদের তুলনায় উত্তম, যা পেয়ে আল্লাহর শোকর করা যায় না। কিন্তু ছালাবা এই উপদেশ না মেনে দোয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ হে ছা'লাবা, তোমার মঙ্গল হোক। তুমি কি আমার মত হতে চাও না? আমি চাইলে আমার রব এই পাহাড়গুলোকে আমার জন্যে স্বর্ণে পরিণত করে দেবেন এবং স্বর্ণের পাহাড় আমার সঙ্গে সঙ্গে চলবে। এরপরও ছালাবা অধিক ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির দোয়া চাইতে লাগল এবং বলল ঃ সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন, যদি আল্লাহ আমাকে অর্থসম্পদ দেন, তবে প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করব। অগত্যা হুযূর (সাঃ) ছালাবার জন্যে দোয়া করলেন। সে ছাগল ক্রয় করল। তাতে বরকতের ফলস্বরূপ ভেড়ার অনুরূপ বংশবৃদ্ধি হল। অবশেষে তার ছাগলপালের জন্যে মদীনার চারণভূমি সংকীর্ণ হয়ে গেল। সে ছাগলপাল দূরে নিয়ে গেল। প্রথমে সে দিনে নামাযের জন্যে রসূলুল্লাহর (সাঃ) মসজিদে আসত—রাতে আসত না। এরপর তার ছাগলের সংখ্যা আরও বেড়ে গেল এবং সে আরও দূরে চলে গেল। এ সময় ছা'লাবা কেবল জুমুআর নামাযের জন্যে মসজিদে আসতে লাগল। এরপর ছাগল আরও বেড়ে যাওয়ায় সে আরও দূরে চলে গেল এবং জুমুআয় আসাও বর্জন করল। জানাযার নামাযে যোগদান করাও ছেড়ে দিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মন্তব্য করলেন ঃ

ذبح ثعلبة بن حاطب

ছালাবা ইবনে হাতেব যবেহ হয়ে গেছে।

এরপর যাকাত আদায়ের নির্দেশ অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দু'ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের জন্যে প্রেরণ করলেন এবং উট ও ছাগলের বয়স, যাকাতের পরিমাণ ইত্যাদি লিখে দিলেন। হুযূর (সাঃ) ব্যক্তিদ্বয়কে ছালাবা ইবনে হাতেবের কাছেও যেতে বললেন। তারা ছালাবা ইবনে হাতেবের কাছে পৌঁছে যাকাত দাবী করল। সে বলল ঃ আমাকে যাকাত সম্পর্কিত লিখিত বিবরণ দেখাও। ছা'লাবা গভীর মনোযোগ সহকারে বিবরণ পাঠ করে বলল ঃ এটা তো জিযিয়া বৈ নয়। তোমরা এখন চলে যাও এবং অন্য সবার কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ করার পর আমার কাছে এসো। সেমতে তারা অন্যদের কাছ থেকে যাকাত উসুল করার পর পুনরায় ছালাবার কাছে এল। ছালাবা বলল ঃ আমার মনে হয় এটা জিযিয়া ছাড়া কিছু নয়। তোমরা চলে যাও। আমি এ সম্পর্কে আরও চিন্তাভাবনা করে নিই। তারা উভয়ে মদীনায় ফিরে এল। তাদেরকে আসতে দেখে তাদের বলার পূর্বেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ذبح ثعلبة بن حاطب ছালাবা ইবনে হাতেব যবেহ হয়ে গেছে। এ সময় কোরআন পাকের এই আয়াত নাযিল হল ঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتَانَا مِنْ فَضْلِهٖ الخ

এই আয়াত নাযিল হওয়া সম্পর্কে ছা'লাবা জানতে পারল। সে তার কাছে প্রাপ্য যাকাত নিয়ে স্বয়ং রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে পৌঁছল। কিন্তু তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমার কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। ছালাবা কাঁদতে লাগল এবং আপন মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে লাগল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমার এ কাজ তোমারই। আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমার কথা মেনে বেশী ধনসম্পদের জন্যে দোয়া করতে বলো না।

মোট কথা, হুযূর (সাঃ) ছালাবার যাকাত কবুল করলেন না। এরপর না খলীফা আবূ বকর (রাঃ) কবুল করলেন, না খলীফা ওমর (সাঃ)। অবশেষে ছালাবা হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মৃত্যুবরণ করে।

আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রেওয়ায়েত করেন, এক ব্যক্তি এসে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এখানে এক যুবকের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। লোকেরা তাকে বলছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বল। কিন্তু সে কিছুতেই বলতে পারছে না। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ সে জীবনে কালেমা পাঠ করত না কি? উত্তর হল ঃ পাঠ করত। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তা হলে মৃত্যুর সময় বাধা এল কোত্থেকে? অতঃপর তিনি যুবকের কাছে গেলেন এবং বললেন ঃ হে যুবক, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বল। সে বলল ঃ আমার ক্ষমতা নেই। আমি এ কালেমা

বলতে পারি না। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ কেন বলতে পার না? সে বলল ঃ আমি আমার মায়ের হক আদায় করিনি। তাই বলতে পারি না। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তোমার মা জীবিত আছে কি? উত্তর হল, জি হাঁ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) লোকজনকে বললেন ঃ তার মাকে নিয়ে এস। মা এলে পর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ যদি তোমাকে বলা হয়, তুমি তোমার এই ছেলের জন্যে সুপারিশ না করলে আমরা তাকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করব, তা হলে তুমি তার জন্যে সুপারিশ করবে না? মা বলল ঃ আমি সুপারিশ করব। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি আমাদের সামনে সাক্ষ্য দাও, তুমি তোমার ছেলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছ। মা বলল ঃ আমি আমার পুত্রের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছি। অতঃপর হুযূর (সাঃ) পুত্রকে বললেন ঃ এখন বল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সে অনায়াসে তা বলে ফেলল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْقَذَهُ بِىْ مِنَ النَّارِ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার বদৌলত তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছেন।

যায়দ ইবনে ছাবেত (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাদীস বর্ণনাকারীদের জন্যে এই বলে দোয়া করেছেন ঃ

نضر الله امرأ سمع مقالتى فوعاها فاداها كما سمعها

আল্লাহ সেই ব্যক্তির মুখমণ্ডল সতেজ ও সজীব রাখুন, যে আমার কথা শুনে, অতঃপর তা মনে রাখে, অতঃপর হুবহু অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়। আলেমগণ বলেন, রসূলুল্লাহর (সাঃ) এই দোয়ার কারণেই হাদীসবিদগণের মুখমণ্ডলে সজীবতা ও হৃষ্টপুষ্টতা পরিলক্ষিত হয়।

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, নবী করীম (সাঃ) যার জন্যেই দোয়া করেছেন, তাঁর সেই দোয়া সেই ব্যক্তি পর্যন্তই সীমিত নয়; বরং তার অধস্তন বংশধর পর্যন্তও পৌঁছে।

সাহাবায়ে কেরামকে শিখানো দোয়া

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমার পিতা আমার কাছে এসে বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছ থেকে একটি দোয়া শুনেছি, যার প্রভাব এই যে, তোমার উপর পাহাড়সম ঋণ থাকলেও আল্লাহ তা'আলা তা শোধ করিয়ে দিবেন। দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ وَكَاشِفَ الْغَمِّ مُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ

رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمُهُمَا اَنْتَ تَرْحَمُنِيْ فَارْحَمْنِيْ بِرَحْمَةٍ تُغْنِيْنِيْ بِهَا مِنْ رَحْمَةٍ عَنْ سِوَاكَ -

হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলেন ঃ আমার উপর অনেক ঋণ ছিল, যা আমি অপছন্দ করতাম। অল্প দিনের মধ্যেই আমি এ দোয়ার উপকার পেলাম। আল্লাহ তা'আলা আমার ঋণ শোধ করিয়ে দিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আমার উপর আসমার কর্জ ছিল। তাকে দেখলেই আমার লজ্জা লাগত। তাই তার সাথে দেখা হলেই আমি উপরোক্ত দোয়া পাঠ করতাম। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আমাকে রিযিক দিলেন এবং তা উত্তরাধিকার স্বত্ব অথবা দান নয়। আমি আসমার প্রাপ্য শোধ করে দিলাম।

আবুল আলিয়া রেওয়ায়েত করেন, খালিদ ইবনে ওলীদ আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এক জ্বিন আমাকে হয়রানি করে। এর কোন প্রতিকার আছে কি? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ পাঠ কর~

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْاَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِي السَّمَاءِ وَمَا يَنْزِلُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ اِلَّا طَارِقٌ يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمٰنُ -

খালিদ ইবনে ওলীদ বলেন ঃ আমি এই কালেমাগুলো পাঠ করলাম। আল্লাহ তা'আলা সেই জ্বিনকে প্রতিহত করলেন।

সোহায়ল ইবনে আবী সালেহ রেওয়ায়েত করেন, বনী আসলামের এক ব্যক্তিকে বিচ্ছু দংশন করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ সে রাতে নিম্নোক্ত কালেমাগুলো পাঠ করলে তাকে বিচ্ছু দংশন করত না ঃ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

রাবী বলেন ঃ আমার গৃহের এক মহিলাকে সাপে কাটলে সে এই কালেমাগুলো পাঠ করল। ফলে তার কোন বিপত্তি ঘটল না।

আবূ বকর ইবনে মোহাম্মদ রেওয়ায়েত করেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে সোহায়ল

(রাঃ)-কে হারীরাতুল আফায়ী নামক স্থানে সর্পে দংশন করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তাকে আম্মারা ইবনে হাযমের কাছে নিয়ে যাও, যাতে সে ঝেড়ে দেয়। লোকেরা বলল ঃ আবদুল্লাহ মারা যাবে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা তাকে আম্মারার কাছে নিয়ে যাও। অতঃপর আম্মারার ঝাড়ার ফলে আবদুল্লাহ সুস্থ হয়ে গেল।

সোহায়ল ইবনে আবী খায়ছামা রেওয়ায়েত করেন ঃ আমাদের এক ব্যক্তিকে সাপে দংশন করলে আমর ইবনে হাযমকে ডাকা হল। সে অস্বীকার করল এবং নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এসে অনুমতি চাইল। তিনি বললেন ঃ তুমি কি বলে ঝাড়বে, তা আমাকে শুনাও। আমর শুনালে হুযূর (সাঃ) অনুমতি দিলেন।

আবদুর রহমান ইবনে ছাবেত রেওয়ায়েত করেন, খালিদ ইবনে ওলীদ অনিদ্রার অভিযোগ করল রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমি তোমাকে এমন কালেমা শিখাচ্ছি, যেগুলো পাঠ করলে তোমার নিদ্রা এসে যাবে। কালেমাগুলো এই ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا اَظَلَّتْ وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ وَمَا اَقَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضَلَّتْ كُنْ جَارِىْ مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيْعًا اَنْ يَفْرُطَ عَلَىَّ اَحَدٌ مِنْهُمْ وَاَنْ يَطْغٰى عَزَّ جَارُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ -

আবান ইবনে আইয়াশ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) কুখ্যাত হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সাথে কথা বললে হাজ্জাজ বলল ঃ যদি তুমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে উপস্থিত না হতে এবং তোমার সম্পর্কে আমীরুল মুমিনীন আমাকে না লিখতেন, তবে আমার মধ্যে ও তোমার মধ্যে অভাবনীয় আচরণ হয়ে যেত। হযরত আনাস (রাঃ) বললেন ঃ চুপ কর। যখন আমার নাকের ছিদ্র মোটা হয়ে গেল (আমার কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে গেল), তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে কতকগুলো কালেমা শিখালেন, যার কারণে কোন প্রতাপশালী যালেমের ক্রোধ ও প্রাবল্য আমার কোন ক্ষতি করবে না এবং আমার প্রয়োজন অনায়াসে পূর্ণ হবে। মুমিনগণ গভীর ভালবাসা সহকারে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। হাজ্জাজ বলল ঃ তা হলে সেই কালেমাগুলো তুমি আমাকে শিখিয়ে দাও না! হযরত আনাস (রাঃ) বললেন— না, তুমি এগুলোর যোগ্য নও।

পরবর্তীকালে হাজ্জাজ তার পুত্রদেরকে দু'লাখ দেরহামসহ প্রেরণ করল এবং তাদেরকে বলল ঃ এই বুড়োর সাথে নম্রতা ও প্রীতি সহকারে ব্যবহার করবে। এভাবে সম্ভবতঃ তোমরা তার কাছ থেকে কালেমাগুলো হাছিল করতে পারবে। কিন্তু হাজ্জাজের পুত্ররা সেগুলো হাছিল করতে সক্ষম হল না।

আবান বলেন ঃ হযরত আনাস (রাঃ) ওফাতের তিন দিন পূর্বে আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন ঃ এই কালেমাগুলো শিখে নাও এবং ভবিষ্যতে কোন যোগ্য ব্যক্তিকে শিখাবে। আল্লাহ পাক হযরত আনাসকে যা দান করেছিলেন, তা আমাকেও দান করেছেন। আমি যে বস্তু অনুভব করতাম, তা আমা থেকে দূর হয়েছে। দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَدِيْنِىْ بِسْمِ اللّٰهِ
عَلٰى اَهْلِىْ وَمَالِىْ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ اَعْطَانِىْ بِسْمِ اللّٰهِ
خَيْرُ الْاَسْمَاءِ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْاَرْضِ وَرَبِّ السَّمَاءِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ
لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ دَاءٌ بِسْمِ اللّٰهِ اِفْتَتَحْتُ وَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ اَللّٰهَ
اَللّٰهَ رَبِّىْ لَا اُشْرِكُ بِهٖ اَحَدًا اَسْئَلُكَ اَللّٰهُمَّ بِخَيْرِكَ مِنْ خَيْرِكَ
الَّذِىْ لَا يُعْطِيْهِ غَيْرُكَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَللّٰهُمَّ
اجْعَلْنِىْ فِىْ عِيَافِكَ وَجِوَارِكَ مِنْ كُلِّ سُوْءٍ وَمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَجِيْرُكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْتَ وَاَحْتَرِسُ بِكَ مِنْهُنَّ
وَاَقُوْمُ بَيْنَ يَدَىَّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ
الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ فَوْقِىْ وَمِنْ تَحْتِىْ

بَيْنَ يَدَىَّ থেকে مِنْ تَحْتِىْ পর্যন্ত প্রত্যেক শব্দের পর সূরা এখলাস সম্পূর্ণ পাঠ করতে হবে।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ব্যক্তি আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! দুনিয়ার ধন-সম্পদ আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (আমি নিঃস্ব হয়ে পড়েছি।) হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি ফেরেশতাগণের দুরূদ এবং তসবীহে খালায়েক পাঠ কর না কেন? এগুলোর বরকতে মানুষ রিযিক লাভ করে। সোবহে সাদেক উদিত হওয়ার সময় একবার এই তসবীহ পাঠ কর ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ -

এর বরকতে দুনিয়ার ধনসম্পদ তোমার কাছে লুটিয়ে পড়বে। লোকটি অতঃপর চলে গেল। কিছুদিন পরে এসে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! দুনিয়ার ধনদৌলত আমাকে এমনভাবে ধরা দিয়েছে যে, এগুলো কোথায় রাখব জানি না।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, তিনি জনৈক সাহাবীর সঙ্গে সফররত অবস্থায় এক গোত্রে পৌছেন। সেখানে এক ব্যক্তিকে সাপে দংশন করেছিল। তাদেরই এক ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে দংশিত ব্যক্তিকে ফুঁ দিলে সে সুস্থ হয়ে গেল।

খারেজা ইবনে সল্ত তামীমী (রাঃ)-এর চাচা রেওয়ায়েত করেন ঃ তিনি একদা এক সম্প্রদায়ের কাছে যান। সেখানে শিকল পরিহিত এক পাগল ছিল। সেখানকার লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনার কাছে এই পাগলের কোন ওষুধ আছে কি? আপনাদের নবী তো কল্যাণসহ প্রেরিত হয়েছেন। খারেজার চাচা প্রত্যহ দু'বার করে সূরা ফাতিহা পাঠ করে তিন দিন পাগলকে ফুঁ দিলেন। ফলে পাগল ভাল হয়ে গেল। সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে একশ' ছাগল দিয়ে দিল। তিনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে ঘটনা বর্ণনা করলেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এই ছাগলগুলো তোমার জন্যে হালাল। কেননা বাতিল তন্ত্রমন্ত্র পড়ে উপার্জন করা গেলে সত্য ঝাড়ফুঁক দ্বারা উপার্জন করায় কোন দোষ থাকতে পারে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ এই আয়াত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে চুরি থেকে নিরাপত্তা প্রদান করে। জনৈক সাহাবী রাতে এই আয়াত পাঠ করে শয়ন করলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর গৃহে চোর ঢুকল এবং গৃহের সকল জিনিসপত্র এক জায়গায় একত্রিত করল। সাহাবী নিদ্রিত ছিলেন না। অবশেষে চোর জিনিসপত্রগুলো ঘরের দরজা পর্যন্ত নিয়ে গেল। কিন্তু সে দরজা বন্ধ দেখতে পেল। চুরির মাল রেখে দিয়ে যখন সে ভাবছিল, তখন

দরজা উন্মুক্ত দৃষ্টিগোচর হল। সে তিনবার দেখল, মাল হাতে নিয়ে বের হতে চাইলেই দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং মাল রেখে দিলে দরজা উন্মুক্ত দৃষ্টিগোচর হয়। সাহাবী এই অবস্থা দেখে হেসে উঠলেন এবং বললেন ঃ আমি আমার গৃহকে যথেষ্ট সুরক্ষিত করে নিয়েছি।

নবুওয়তের আমলে সাহাবায়ে কেরামের স্বপ্ন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহর (সাঃ) অনেক সাহাবী তাঁর আমলে স্বপ্ন দেখতেন। তারা এসব স্বপ্ন রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে বর্ণনা করতেন। তিনি তা শুনে "মাশ আল্লাহ" বলতেন। আমি তখন অল্পবয়স্ক ছিলাম। বিবাহের পূর্বে মসজিদই ছিল আমার শয্যাস্থল। আমি মনে মনে বললাম, আমার মধ্যে কোন গুণ গরিমা থাকলে আমিও সাহাবীগণের মত স্বপ্ন দেখতাম। এক রাতে নিদ্রার জন্যে শয়ন করে আমি এই দোয়া করলাম ঃ হে আল্লাহ, যদি তুমি জান আমার মধ্যে কোন কল্যাণ আছে, তবে আমাকে স্বপ্ন দেখাও। আমি এ চিন্তা নিয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম। নিদ্রাবস্থায় আমার কাছে দু'জন ফেরেশতা এল। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল হাতুড়ি। তারা আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাদের সঙ্গে থেকে আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলাম—

হে আল্লাহ, আমি জাহান্নাম থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। এরপর আমাকে দেখানো হল, একজন ফেরেশতার হাতে লোহার একটি হাতুড়ি আছে। সে আমাকে বলল ঃ তুমি ভয় করো না। কেননা, তুমি একজন ভাল মানুষ। তবে প্রচুর নামায পড়বে। সে আমাকে নিয়ে গেল এবং জাহান্নামের কিনারায় খাড়া করে দিল। আমি দেখলাম, জাহান্নামের আবরণ কূপের আবরণের মতই। তার দু'টি খুঁটি কূপের খুঁটির অনুরূপ, যার উপর পানি তোলার যন্ত্র স্থাপন করা হয়। প্রত্যেক খুঁটির সাথে হাতুড়ি হাতে একজন ফেরেশতা রয়েছে। জাহান্নামে অনেক মানুষকে শিকলে ঝুলন্ত দেখলাম। তাদের মধ্যে অনেক কোরায়শকে আমি চিনতে পারলাম। এরপর ফেরেশতা আমাকে ডান দিকে সরিয়ে আনল। আমি এ স্বপ্নটি আমার ভগিনী হাফসাকে বললাম। সে রসূলুল্লাহর (সাঃ) গোচরীভূত করলে তিনি বললেন ঃ আবদুল্লাহ একজন নেক লোক।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আরও রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার হাতে একটি বস্ত্রখণ্ড রয়েছে। আমি জান্নাতের যে গৃহের দিকে যেতে চাই, এই বস্ত্রখণ্ড আমাকে সেখানে নিয়ে যায়। এ স্বপ্নটি আমি হাফসার কাছে বর্ণনা করলে সে তা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলল। তিনি বললেন ঃ তোমার ভাই একজন নেক লোক।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি একটি বাগানে আছি। বাগানের মাঝখানে একটি স্তম্ভ রয়েছে এবং স্তম্ভের উপরিভাগে একটি শলাকা আছে। কেউ আমাকে বলল ঃ এর উপরে উঠে যাও। আমি বললাম ঃ আমি এতে আরোহণ করতে পারব না। এরপর আমার কাছে একজন খাদেম এল। সে আমার কাপড়-চোপড় গুটিয়ে নিল। আমি উপরে উঠে গেলাম এবং শলাকাটি ধরে ফেললাম। শলাকাটি ধরার সাথে সাথে জাগ্রত হয়ে গেলাম। এ স্বপ্নটি আমি নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন ঃ বাগান হচ্ছে ইসলাম, আর স্তম্ভ হচ্ছে ইসলামের স্তম্ভ। যে শলাকাটির কথা বললে সেটি হচ্ছে "ওরওয়াতুল ওছকা" তথা ইসলামের মযবূত রজ্জু। তুমি আমৃত্যু ইসলামের উপর কায়েম থাকবে।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম আরও রেওয়ায়েত করেন, আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) আমলে স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলল ঃ চল। অতঃপর সে আমাকে একটি রাজপথের উপর নিয়ে গেল। এ পথে চলতে চলতে বাম দিকে একটি রাস্তা এল। আমি সেই পথে চলার ইচ্ছা করলে লোকটি বলল ঃ তুমি এ পথের পথিক নও। এরপর ডান দিকে একটি রাস্তা এল। আমি এই পথে চলতে শুরু করলাম। অবশেষে আমি একটি ঢালু পাহাড়ে পৌঁছলাম। লোকটি আমার হাত ধরল এবং আমাকে পাহাড়ের উপর নিক্ষেপ করল। সেখানে আমি একটি শলাকা চেপে ধরলাম। লোকটি আমাকে বলল ঃ এই শলাকা ধরে রাখ। আমি এই স্বপ্ন রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি ভালই দেখেছ। রাজপথ হচ্ছে হাশরের ময়দান। বাম দিকের রাস্তাটি দোযখে যাওয়ার আর ডান দিকের রাস্তাটি জান্নাতে যাওয়ার। ঢালু পাহাড় হচ্ছে শহীদগণের মনযিল। যে শলাকাটি তুমি ধরেছ, সেটি "ওরওয়াতুল ওছকা", তুমি আমৃত্যু এটি ধারণ করে রাখ।

তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ তার গোত্রের দু'ব্যক্তি রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে হাযির হয়ে মুসলমান হয়ে গেল। তাদের এক ব্যক্তি জেহাদে শহীদ হয়ে গেল। অপরজন এক বছর পর ইন্তেকাল করল। তালহা বলেন ঃ আমি স্বপ্নে নিজেকে জান্নাতের দরজায় পেলাম। জান্নাত থেকে এক ব্যক্তি বাইরে এল এবং পরে যে ইন্তেকাল করেছিল, তাকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিল। অতঃপর সে পুনরায় এল এবং শহীদ ব্যক্তিকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিল। অতঃপর সে আমার দিকে এসে বলল ঃ তুমি ফিরে যাও। তোমার জন্যে অনুমতি হয়নি। তালহা সকাল বেলায় এই স্বপ্ন সাহাবীগণকে শুনালেন। শুনে সকলেই বিস্মিত হলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আসলে পরে ইন্তেকালকারী ব্যক্তি অনেক নামায পড়েছে এবং রমযানের রোযা রেখেছে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি সূরা সোয়াদ পাঠ করছি। সেজদার আয়াতে পৌঁছার পর আমি সকল বস্তুকে সেজদা করতে দেখলাম। আমি দোয়াত, লওহ ও কলম দেখলাম। সকালে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এই স্বপ্ন বর্ণনা করলে তিনি সূরা সোয়াদে সেজদার বিধান দিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নে দেখি, আমি একটি বৃক্ষের পেছনে নামায পড়ছি। নামাযে সূরা সোয়াদ তেলাওয়াত করলাম। সেজদার আয়াত পড়ে আমি সেজদা করলাম। বৃক্ষও সেজদা করল। সে এই দোয়া পড়ল ঃ

اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ ذِكْرًا وَاجْعَلْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ ذُخْرًا

وَاَعْظِمْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ اَجْرًا

ইবনে আব্বাস বলেন ঃ নবী করীম (সাঃ) সূরা সোয়াদ তেলাওয়াত করে যখন সেজদার আয়াতে এলেন, তখন সেজদা করলেন এবং উপরোক্ত দোয়াই পাঠ করলেন।

হযরত জাবের (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, তোফায়ল ইবনে আমর হিজরত করলেন। তার সাথে তার সম্প্রদায়ের অন্য এক ব্যক্তিও হিজরত করল। সে গুরুতর অসুস্থ হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল এবং তীরের ফলা দিয়ে অঙ্গুলিসমূহের গ্রন্থি কেটে দিল। ফলে সে মারা গেল। তোফায়ল তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার সাথে কি আচরণ করা হয়েছে? লোকটি বলল ঃ হিজরতের কারণে আমার মাগফেরাত হয়ে গেছে। তোফায়ল প্রশ্ন করলেন ঃ তোমার হাতের অবস্থা কি? সে বলল ঃ আমাকে বলা হয়েছে, যে অঙ্গ তুমি নিজে কর্তন করেছ, সেগুলো ঠিক করা হবে না। তোফায়ল বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এ স্বপ্ন বর্ণনা করলে তিনি লোকটির জন্যে এই দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ —হে আল্লাহ, তার হস্তদ্বয়কে ক্ষমা কর।

নবী করীম (সাঃ)-এর ফযীলত ও অন্যান্য

নবীর ফযীলত

আলেমগণ বলেন ঃ কোন নবী ও রসূলকে যে-কোন মোজেযা ও ফযীলত দান করা হয়েছে, সেই মোজেযা ও ফযীলতের নযীর আমাদের নবী করীম (সাঃ)-কেও অবশ্যই দান করা হয়েছে অথবা তদপেক্ষাও অধিক মহান মোজেযা ও শ্রেষ্ঠতম ফযীলত দান করা হয়েছে।

আদম (আঃ)-কে প্রদত্ত মোজেযার নযীর

হযরত আদম (আঃ)-এর মোজেযা ও বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি এই যে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁকে আপন পবিত্র হাতে সৃষ্টি করেছেন, ফেরেশতাদের দিয়ে তাঁকে সেজদা করিয়েছেন এবং তাঁকে সকল বস্তুর নাম শিখিয়েছেন। হযরত আদম (আঃ) তখন ফেরেশতাগণের প্রতি প্রেরিত নবী ছিলেন। বস্তুনিচয়ের নাম বলা ছিল তাঁর মোজেযা। আল্লাহ তা'আলা প্রথমে তাঁর সাথে কালাম করেন। তিবরানীর রেওয়ায়েতে হযরত আবূ যর (রাঃ) বলেন ঃ আমি নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত আদম নবী ছিলেন? তিনি বললেন ঃ নিঃসন্দেহে নবী ও রসূল ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে প্রথমে কালাম করেছেন। আমাদের রসূল (সাঃ)-কে এসব মোজেযা দান করা হয়েছে। সেমতে মে'রাজে আল্লাহ পাক তাঁর সাথে কালাম করেছেন। দায়লামী আবূ রাফে থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ আমার উম্মত পানি ও কাদার আকারে আমাকে প্রদর্শিত হয়েছে এবং সকল বস্তুর নাম আমাকে শিখানো হয়েছে।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দুরূদ প্রেরণ করেন।

এটি আদম (আঃ)-কে ফেরেশতাদের দিয়ে সেজদা করানোর মোজেযা অপেক্ষা দু'কারণে উত্তম। এক, আদম (আঃ)-কে আল্লাহ পাক যে গৌরব দান করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হওয়ার সাথে সাথে খতম হয়ে গেছে। আর নবী করীম (সাঃ)-এর গৌরব চলমান, অব্যাহত ও চিরন্তন হয়ে বিদ্যমান আছে। দুই, হযরত আদম (আঃ)-কে কেবল ফেরেশতাগণ সেজদা করেছেন। আর নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি দুরূদ যেমন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরণ করা হয়, তেমনি সকল ফেরেশতা এবং বিশ্বের সকল মুমিন মুসলমানও তাঁর প্রতি দুরূদ পাঠ করেন।

হযরত ইদরীস (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের নযীর

আল্লাহ্ পাক হযরত ইদরীস (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ‎.

অর্থাৎ, আমি তাকে সুউচ্চ মর্যাদায় সমুন্নত করেছি।

আর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে قاب قوسين অর্থাৎ দুই ধনুকের মধ্যবর্তী ব্যবধানের মর্যাদা দান করা হয়।

হযরত নূহ (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের নযীর

আবূ নঈম বলেন ঃ হযরত নূহ (আঃ)-এর দোয়াসমূহ কবুল হওয়া তাঁর বৈশিষ্ট্য। আমাদের নবী (সাঃ)-এর পৃষ্ঠদেশে যারা খেজুরের কাঁটা রেখেছিল, তিনি তাদের জন্যে বদদোয়া করেছিলেন, যা কবুল হয়েছে। তিনি দুর্ভিক্ষের সময় বৃষ্টির দোয়া করেন। ফলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে। আবূ নঈম আরও বলেন ঃ হযরত নূহ (আঃ)-এর উপর নবী করীম (সাঃ)-এর একটি ফযীলত এই যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) দাওয়াতে বিশ বছর সময়ের মধ্যে হাজারো মানুষ ঈমান আনে এবং দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। আর হযরত নূহ (আঃ) সাড়ে নয়শ বছর দীন প্রচার করেছেন। কিন্তু একশ জনেরও কম মানুষ তাঁর প্রচারে সাড়া দেয়।

শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন ঃ হযরত নূহ (আঃ)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, সকল প্রকার জন্তু-জানোয়ার তার নৌকায় একত্রিত হয়েছিল। আমাদের নবী করীম (আঃ)-এর জন্যে সকল প্রাণীকে বশীভূত করে দেয়া হয়েছিল। হযরত নূহ (আঃ)-এর কারণে পৃথিবীতে তাপ তথা জ্বর অবতরণ করেছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাপকে মদীনা থেকে জাহ্ফায় স্থানান্তরিত করেন।

হযরত দাঊদ (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের নযীর

আবূ নঈম বলেন ঃ দাঊদ (আঃ)-কে বায়ু দান করা হয়। আর নবী করীম (সাঃ)-কে বায়ুর মাধ্যমে সাহায্য প্রদান করা হয়; যেমন খন্দক যুদ্ধে বায়ুর মাধ্যমেই বিজয় অর্জিত হয়েছিল। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন ঃ বদর যুদ্ধেও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বায়ুর মাধ্যমে সাহায্য প্রদান করা হয়েছিল।

হযরত সালেহ (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের নযীর

আবূ নঈম বলেছেন ঃ হযরত সালেহ (আঃ)-কে উষ্ট্রী দেয়া হয়েছিল। এর নযীর এই যে, আমাদের নবী (সাঃ)-এর সাথে উট কথা বলেছে এবং তাঁর আনুগত্য করেছে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের নযীর

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্যে অগ্নি শীতল হয়ে গিয়েছিল। এর নযীরও আমাদের নবী (সাঃ)-কে দেয়া হয়েছে, যা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে যেমন খলীল (দোস্ত) করেছিলেন, তেমনি আমাকেও খলীল করেছেন। অতএব, আমি এবং ইবরাহীম (আঃ) জান্নাতে সমমর্যাদায় থাকব। আর হযরত আব্বাস আমাদের মধ্যে এমন হবেন, যেমন দুই খলীলের মাঝখানে মুমিন থাকে।

কা'ব ইবনে মালেক রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) ওফাতের পাঁচ দিন পূর্বে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবীকে দোস্ত ও খলীল করেছেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যদি আমি আমার রব ছাড়া অন্য কাউকে খলীল করতাম, তবে আবূ বকরকে খলীল করতাম। কিন্তু আমি আল্লাহর খলীল। আবূ নঈম বলেন ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) নমরূদ থেকে তিন পর্দার অন্তরালে আত্মগোপন করেছিলেন। আর আমাদের নবী কোন পর্দা ছাড়াই সেই লোকদের থেকে আত্মগোপন করেছিলেন, যারা তাঁকে হত্যা করার সংকল্প করেছিল।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

إِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۔

অর্থাৎ, আমি তাদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, ফলে তারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে। আমি তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে অন্তরাল স্থাপন করেছি এবং তাদের দৃষ্টির উপর আবরণ রেখেছি। ফলে তারা দেখতে পায় না।

আল্লাহ পাক আরও বলেন ঃ

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۔

যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার মধ্যে এবং আখেরাতে অবিশ্বাসীদের মধ্যে গোপন আবরণ স্থাপন করে দেই।

শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর নিরাপদ থাকার ব্যাপারে অনেক হাদীস ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

আবূ নঈম বলেন ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) নমরূদের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হন এবং প্রমাণাদির মাধ্যমে তাকে নিরুত্তর করে দেন। কোরআন পাকে বলা হয়েছে فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ —অতঃপর কাফেরকে নিরুত্তর করে দেয়া হল।

আর আমাদের নবী (সাঃ)-এর সামনে আসে উবাই ইবনে খল্ফ। সে পুনরুজ্জীবন অস্বীকার করত। সে একটি পুরাতন পচনযুক্ত হাড্ডি এনে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল এবং বলল ঃ مَنْ يُّحْيِى الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ.

অর্থাৎ, এই পচনযুক্ত হাড্ডিকে কে জীবিত করবে?

জওয়াবে আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করলেন ঃ

قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ.

অর্থাৎ, বলে দিন, এগুলোকে তিনিই জীবিত করবেন, যিনি এগুলো প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন।

বলা বাহুল্য, এটা নবী করীম (সাঃ)-এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর একটি মোজেযা বর্ণনা করেছেন যে, যখন তিনি নমরূদের অগ্নি থেকে রক্ষা পেয়ে কওছী নামক স্থান থেকে রওয়ানা হন, তখন তাঁর ভাষা ছিল সিরয়ানী। কিন্তু ফোরাত অতিক্রম করার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভাষা বদলে দিলেন এবং তাঁর ভাষা হয়ে গেল ইবরানী। নমরূদ তাঁর পেছনে এই বলে সেনাদল প্রেরণ করল যে, যে ব্যক্তি সিরয়ানী ভাষায় কথা বলবে, তাকে ছাড়বে না। আমার কাছে পাকড়াও করে নিয়ে আসবে। সেনাদল হযরত ইবরাহীমের সাথে মিলিত হওয়ার পর তাঁকে ছেড়ে দিল। কেননা, তারা তাঁর ভাষা বুঝল না। এই মোজেযার নযীর রসূলুল্লাহর (সাঃ) সেই ঘটনা, যা দূতদের অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাজন্যবর্গের কাছে দূত প্রেরণ করেন। যে দূত যে সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হয়েছিল, সে সেই সম্প্রদায়ের ভাষায় কথা বলত এবং সেই ভাষা জানত।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর অন্যতম মোজেযা এই যে; তিনি খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে যান; কিন্তু তা পেলেন না। অবশেষে লাল বেলে মাটি থেকে কিছু মাটি নিয়ে গৃহে ফিরে এলেন। পরিবারের লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ এটা কি?

তিনি বললেন ঃ লাল গম। তারা বাস্তবিকই লাল গম দেখতে পেল। এই গম বপন করা হলে তার গুচ্ছ এমন হত যে, গোড়া থেকে শাখা পর্যন্ত স্তরে স্তরে গমের দানা থাকত। এর নযীর রসূলুল্লাহর (সাঃ) সেই ঘটনা, যাতে তিনি সাহাবীগণকে পাথেয় স্বরূপ এক মশক পানি দেন। সাহাবীগণ সেটা খোলার পর তা থেকে দুধ এবং মাখন বের হল।

হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের নযীর

হযরত ইসমাঈল (আঃ) যবেহ হন। রসূলুল্লাহর (সাঃ) বক্ষবিদারণ এর নযীর। বরং এটা তার চেয়েও উঁচু স্তরের। কেননা, বক্ষবিদারণ একটি আক্ষরিক অর্থে বাস্তব ঘটনা। কিন্তু যবেহ আক্ষরিক অর্থে হয়নি; বরং তার ফেদিয়া তথা বিনিময় দেয়া হয়েছে। এমনিভাবে রসূলুল্লাহর (সাঃ) পিতা আবদুল্লাহর বিনিময়ে একশ উট ফেদিয়া দেয়া হয়েছে। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে যমযম দেয়া হয়েছে। নবী করীম (সাঃ)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিবকে যমযম দান করা হয়েছে। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে আরবী ভাষা দান করা হয়েছে। হযরত জাবের (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ হযরত ইসমাঈলকে এলহামের মাধ্যমে আরবী ভাষা দান করা হয়।

হযরত ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি আমাদের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী। এর কারণ কি? আপনি তো আমাদের মধ্যেই বড় হয়েছেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর ভাষার যে শব্দাবলী কালক্রমে মিটে গিয়েছিল, হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

হযরত এয়াকূব (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের নযীর

রবীআ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ হযরত ইয়াকূব (আঃ)-কে বলা হল, ইউসুফকে ব্যাঘ্র খেয়ে ফেলেছে। তিনি ব্যাঘ্রকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুই আমার নয়নের মণিকে খেয়েছিস কি? ব্যাঘ্র বলল ঃ না। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তুই কোত্থেকে এসেছিস এবং কোথায় যাচ্ছিস? সে বলল ঃ মিসর থেকে এসেছি এবং জুরজান যাচ্ছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই সফরের উদ্দেশ্য কি? ব্যাঘ্র বলল ঃ আমি পয়গম্বরগণের মুখ থেকে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি কোন বন্ধু কিংবা আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাৎ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি পদক্ষেপে একটি করে নেকী লিখবেন, এক হাজার গোনাহ মিটিয়ে দেবেন এবং এক হাজার মর্তবা উঁচু করবেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ) পুত্রদেরকে ডেকে বললেন ঃ এ হাদীসটি লিখে নাও। ব্যাঘ্র বলল ঃ আমি তাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করব না। কারণ, তারা গোনাহগার।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, আমাদের নবী করীম (সাঃ)-কেও ব্যাঘ্রের সাথে কথোপকথনের মোজেযা দান করা হয়েছে।

আবূ নঈম বলেন ঃ হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি পুত্রের বিরহে সবর করেছেন; অথচ এত তীব্র ও দুঃসহ যাতনায় ধ্বংস হওয়ারই কথা ছিল। আমাদের নবী (সাঃ)-কে পুত্রের বিরহ–যন্ত্রণা দেয়া হয়েছে। তিনি তাতে সবর করেছেন। তাঁর পুত্র একমাত্র পুত্র ছিল বিধায় তাঁর সবর ইয়াকূব (আঃ)-এর সবরকে ছাড়িয়ে গেছে।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের নযীর

আবূ নঈম বলেন ঃ হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে সকল নবী ও সকল সৃষ্টির চেয়ে অধিক রূপ-সৌন্দর্য দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এর বিপরীতে আমাদের নবী (সাঃ)-কে যে রূপ ও সৌন্দর্য দেয়া হয়, তার তুলনায় ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্য অর্ধেক ছিল। আবূ নঈম আরও বলেন ঃ হযরত ইউসুফ (আঃ) পিতামাতার বিরহ এবং প্রবাস জীবনের সম্মুখীন হয়েছেন। আমাদের নবী (সাঃ)-ও আপন পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করে আল্লাহর দিকে হিজরত করেছেন।

হযরত মূসা (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের নযীর

হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযায় পাথর থেকে পানি নির্গত হয়েছিল। আমাদের নবী (সাঃ)-এর জন্যেও এই একই মোজেযা প্রকাশ পায়, যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। আবূ নঈম বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) অঙ্গুলি মোবারক থেকে পানির ঝরনা প্রবাহিত হয়। এটা অধিকতর আশ্চর্যজনক ঘটনা। কেননা, পাথর থেকে পানি নির্গত হওয়া একটি অভ্যস্ত ও চিরাচরিত ব্যাপার। কিন্তু রক্ত-মাংস ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পানি বের হওয়া সম্পূর্ণরূপে অভ্যাস বিরুদ্ধ ঘটনা।

হযরত মূসা (আঃ)-কে লাঠির মোজেযা দেয়া হয়েছিল। তাঁর উপর মেঘমালা ছায়াপাত করত। আমাদের নবী (সাঃ)-এর মধ্যে এর নযীর হচ্ছে বৃক্ষশাখার ফরিয়াদ করা এবং সেই উট, যাকে আবূ জাহল দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন ঃ হযরত মূসা (আঃ)-কে "ইয়াদে বায়যা" (শুভ্র হাত) দেয়া হয়েছিল। এর নযীর সেই নূর, যা তোফায়লের মুখমণ্ডলে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই নূর মুখমণ্ডলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অনুভূত হওয়ায় তার লাঠিতে এসে যায়। তোফায়লের ইসলাম গ্রহণ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে সবিস্তার বর্ণনা আছে।

হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযায় নীলনদ দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। এর নযীর মে'রাজের ঘটনায় উল্লিখিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে আকাশ ও

পৃথিবী বিদীর্ণ হয়েছিল। হযরত মূসা (আঃ)-কে 'মান্না' ও 'সালওয়া' দেয়া হয়েছিল। আবূ নঈমের বর্ণনায় এর নযীর হচ্ছে গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) হালাল হওয়া এবং সামান্য খাদ্য বিপুল সংখ্যক লোকের পেটভরে আহার করা।

হযরত মূসা (আঃ) আপন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তুফান, উকুন, পঙ্গপাল এবং ব্যাঙের জন্যে দোয়া করেছিলেন। আবূ নঈম বলেন ঃ এর নযীর সেই দোয়া, যা রসূলুল্লাহ (আঃ) কাফের কোরায়শদের বিরুদ্ধে দুর্ভিক্ষের জন্যে করেছিলেন।

হযরত ইউশা' (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের নযীর

হযরত ইউশা' (আঃ)-কে এই মোজেযা দেয়া হয় যে, তিনি যখন "জাব্বারীন" (প্রতাপান্বিত সম্প্রদায়)-এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন, তখন সূর্যকে অস্ত যেতে বাধা দেয়া হয়। এর নযীর এই যে, আমাদের নবী করীম (সাঃ)-এর জন্যে মেরাজ রজনীতে সূর্যকে থামিয়ে দেয়া হয়েছিল। হযরত আলী (রাঃ)-এর আসরের নামায ফওত হয়ে গেলে তাঁর জন্যে সূর্য পশ্চিম দিকে ফিরে এসেছিল।

হযরত দাঊদ (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের নযীর

আবূ নঈম বলেন ঃ হযরত দাঊদ (আঃ)-এর মোজেযা ছিল পাহাড়সমূহের তাসবীহ পাঠ করা। এর নযীর রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে প্রস্তরকণা ও খাদ্যের তাসবীহ পাঠ করা। দাঊদ (আঃ)-এর জন্যে পক্ষীকুলকে বশীভূত করা হয়েছিল। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর জন্যে সকল জীবজন্তু বশীভূত ছিল। দাঊদ (আঃ)-এর হাতে মোজেযা স্বরূপ লোহা নরম হয়ে যেত। পক্ষান্তরে নবী করীম (সাঃ)-এর হাতে ছোট-বড় পাথর নরম হয়েছিল। উহুদ যুদ্ধে মুশরিকদের থেকে আত্মগোপন করার জন্যে তিনি আপন মস্তক পাহাড়ের দিকে ঝুঁকিয়ে দেন। পাহাড় নরম হয়ে গেল এবং তিনি তাতে মস্তক ঢুকিয়ে দিলেন। এই মোজেযার চিহ্ন অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। মক্কার গিরিপথে রসূলুল্লাহ (সাঃ) পাথরের উপর নামায পড়েন। পাথর নরম হয়ে গেল। তাঁর উভয় বাহুর চিহ্ন তাতে খোদিত হয়ে গেল। পাথরে চিহ্ন পড়া নরম হওয়ার তুলনায় অধিক আশ্চর্যজনক। কেননা, লোহা আগুনের তাপে নরম হয়ে যায়। কিন্তু পাথর অগ্নিতাপেও নরম হয় না। দাঊদ (আঃ)-কে মাকড়সার জাল টানার মোজেযা দেয়া হয়েছিল। রসূলুল্লাহর (সাঃ) হিজরতের ঘটনায় এ ঘটনাই সংঘটিত হয়।

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের কথা

আবূ নঈম বলেন ঃ হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে বিশাল সাম্রাজ্য দান করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে আমাদের নবী (সাঃ)-কে ভূপৃষ্ঠের ধনভাণ্ডারের চাবি প্রদান করা হয়েছে। হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর জন্যে বায়ু বশীভূত করা হয়েছিল। এই বায়ু তাঁকে সকালে নিয়ে যেত এবং এক মাসের দূরত্ব অতিক্রম করাত। সন্ধ্যায় নিয়ে যেত এবং এক মাসের দূরত্ব অতিক্রম করাত। আমাদের নবী (সাঃ) রাতের এক-তৃতীয়াংশে বোরাকে সওয়ার হয়ে পঞ্চাশ হাজার বছরের সফরে গেছেন। তিনি প্রতিটি আকাশে গেছেন এবং সেগুলোর আশ্চর্যসমূহ পরিদর্শন করেছেন। তিনি জান্নাত ও দোযখও দেখেছেন। জিন সোলায়মান (আঃ)-এর বশীভূত ছিল। তিনি তাদেরকে শিকলে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন এবং তাদেরকে শাস্তি দিতেন। আমাদের নবী (সাঃ)-এর খেদমতে জিন ঈমান আনার জন্যে উপস্থিত হয়েছে। শয়তান ও অবাধ্য জিন তাঁর পদানত হয়েছে। এমনকি, যে শয়তানকে তিনি পাকড়াও করেছিলেন, তাকে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বেঁধে দেয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। হযরত সোলায়মান (আঃ) পাখীর বুলি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। আমাদের নবী (সাঃ) সকল প্রাণীর কথাবার্তা বুঝতেন এবং তাঁর সাথে বৃক্ষ, লাঠি এবং পাথর কথা বলেছে।

হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের নযীর

আবূ নঈম বলেন ঃ হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-কে শৈশবে প্রজ্ঞা দান করা হয়। তিনি গোনাহ করা ছাড়াই ক্রন্দন করতেন এবং বিরামহীন ভাবে রোযা রাখতেন। নবী করীম (সাঃ)-এর এ ফযীলতটি অধিক পূর্ণাঙ্গ ছিল। কেননা, হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর যুগ মূর্খতা ও পৌত্তলিকতার যুগ ছিল না। কিন্তু আমাদের নবী (সাঃ)-এর যুগ এরূপ ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি শৈশব থেকেই এসব গুণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। শৈশবে তিনি কখনও মূর্তির প্রতি আকৃষ্ট হননি। তিনি কাফেরদের ঈদ উৎসবে হাযির হননি। তিনি কখনও মিথ্যা বলেননি। সাধারণ শিশুদের ন্যায় ক্রীড়া-কৌতুকে অংশগ্রহণ করেননি। তিনি উপর্যুপরি রোযা রাখতেন এবং বলতেন ঃ আমার রব আমাকে আহার করান এবং পান করান। তিনি এত বেশী ক্রন্দন করতেন যে, বক্ষ মোবারক থেকে হাঁড়ির স্ফুটনের ন্যায় আওয়াজ শুনা যেত। আবূ নঈম বলেন ঃ হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) চিরকুমার ছিলেন। কিন্তু আমাদের নবী (সাঃ) সমগ্র সৃষ্টির জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন বিধায় তাঁকে বিয়ে করার আদেশ করা হয়, যাতে তাঁর অনুসরণে মানুষ বিয়ে-শাদী করে। কারণ, এটাই স্বভাবধর্ম।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের নযীর

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ اَنِّىْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا ۢبِاِذْنِ اللّٰهِ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِى الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ ط

অর্থাৎ, আর তাঁকে বনী ইসরাঈলের জন্যে রসূল হিসেবে মনোনীত করবেন। তিনি বলবেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্যে মাটি দ্বারা পাখীর আকৃতির অনুরূপ তৈরী করি, তারপর তাতে ফুৎকার দেই; তখন তা উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে। আর আমি তোমাদেরকে বলে দেই, যা তোমরা খেয়ে থাক এবং যা ঘরে রেখে থাক।

এখানে উল্লিখিত হযরত ঈসা (আঃ)-এর মোজেযাসমূহের নযীর এ পুস্তকের মৃতকে জীবনদান, রোগীকে স্বাস্থ্যদান, বিপদগ্রস্তদের বিপদ দূরীকরণ অধ্যায়ে এবং উহুদ ও বদর যুদ্ধের অধ্যায়ে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। হযরত কাতাদাহ (রাঃ)-এর চক্ষু কোটর থেকে বের হয়ে পড়লে রসূলুল্লাহর (সাঃ) বরকতে পুনরায় স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। খয়বর যুদ্ধে হুযূর (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর চোখে মুখের থুথু দিয়েছিলেন। ফলে, তাঁর চোখ সুস্থ হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) অদেখা বিষয়সমূহের খবর দিয়েছেন। ঈসা (আঃ) মাটি দ্বারা পাখী তৈরী করেন। আবূ নঈমের মতে এর নযীর রসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক বদর যুদ্ধে এক সাহাবীকে খর্জুর-শাখা দান, যা তরবারি হয়ে যায়।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ط

স্মরণ করুন, যখন হাওয়ারীগণ বলল ঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, আপনার পালনকর্তা কি আমাদের জন্যে আকাশ থেকে একটি খাদ্য-ভর্তি খাঞ্চা নাযিল করতে সক্ষম?

এর নযীর একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর (সাঃ)-এর জন্যে আকাশ থেকে খাদ্য এসেছে। কোরআন পাকে উল্লেখ আছে যে, ঈসা (আঃ) দোলনায় মানুষের সাথে কথা বলেছেন (وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ), এর নযীরও জন্ম অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) ভূমিষ্ঠ হলে ভূপৃষ্ঠের সকল মূর্তি উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এর নযীরও রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্ম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উত্তোলন করা হয়েছে। আবূ নঈম বলেন ঃ এ উত্তোলনও নবী করীম (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির হয়েছে– যেমন আমের ইবনে ফুহায়রা, খুবায়ব, এবং আলায়ে হাযরামীকে আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ

আবূ সাঈদ নিশাপুরী তদীয় গ্রন্থ "শরফুল মুস্তফায়" লিখেন ঃ যে সকল ফযীলতের কারণে নবী করীম (সাঃ)-কে অন্য নবীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে, সেগুলোর সংখ্যা ষাট।

শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন ঃ যে সকল আলেম এই ফযীলতের সংখ্যা নির্ণয় করেছেন, আমি তাদের সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নই। তবে আমি স্বয়ং হাদীস গ্রন্থসমূহ তালাশ করে উপরোক্ত সংখ্যা পেয়েছি এবং অতিরিক্ত আরও তিনটি ফযীলত পেয়েছি। এসব ফযীলতকে আমি চার ভাগে ভাগ করছি। প্রথম, সেই সকল ফযীলত, যেগুলো রসূলে করীম (সাঃ)-এর সত্তার সাথে দুনিয়াতে বিশেষ ভাবে সম্পর্কযুক্ত। দ্বিতীয়, যেগুলো তাঁর সত্তার সাথে আখেরাতে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। তৃতীয়, যেগুলো দিয়ে তিনি তাঁর উম্মতের মধ্যে বিশেষভাবে বিশেষিত ছিলেন দুনিয়াতে। চতুর্থ, যেগুলো দিয়ে তিনি উম্মতের মধ্যে আখেরাতে বিশেষিত আছেন। আমি সবগুলো আলাদা আলাদা ভাবে বর্ণনা করব।

নবী করীম (সাঃ) সকল নবীর অগ্রে

হযরত আদম (আঃ) যখন পানি ও মৃত্তিকায় ছিলেন, তখন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে নবী করে দেয়া হয়। আল্লাহ পাক পয়গম্বরগণের কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, তাতে তিনি ছিলেন সর্বাগ্রে। আল্লাহ যখন أَلَسْتُ

بِرَبِّكُمْ (আমি তোমাদের পালনকর্তা নই কি?) বলেন, তখন সর্বপ্রথম সরওয়ারে কায়েনাত (সাঃ) بَلٰى (হ্যাঁ) বলেছিলেন। হযরত আদমসহ সকল সৃষ্টি তাঁরই খাতিরে সৃজিত হয়েছে। তাঁর পবিত্র নাম আরশ, আকাশমণ্ডলী, জান্নাত এবং ঊর্ধ্বজগতের অন্যান্য বস্তুনিচয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়। ফেরেশতাকুল প্রতি মুহূর্তে তাঁর যিকর করে। আদমসহ সকল পয়গম্বরের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয় যে, তাঁরা যেন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনেন এবং তাঁকে সাহায্য করেন। পূর্বেকার ঐশী গ্রন্থসমূহে তাঁর আগমনের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। তাঁর এবং তাঁর সাহাবীগণ, খলীফাগণ ও উম্মতের গুণাবলী এসব গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্মের পর আকাশমণ্ডলে ইবলীসের গমনাগমন নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। তাঁর পবিত্র বক্ষ বিদারণ করা হয়েছে। তাঁর পৃষ্ঠদেশে নবুওয়তের মোহর কলবের বিপরীতে সেই জায়গায় স্থাপিত হয়েছে, যেখান দিয়ে শয়তান মানুষের মনে প্রবেশ লাভ করে।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) এক হাজার নাম আছে। আল্লাহ তা'আলার নাম থেকে তাঁর পবিত্র নাম গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লাহ পাকের নামাবলীর মধ্য থেকে সত্তরটি তাঁরও নাম। সফরে ফেরেশতারা তাঁর উপর ছায়াপাত করে। বিবেক-বুদ্ধিতে তিনি সকল সৃষ্টির সেরা। তাঁকে পরিপূর্ণ রূপ-সৌন্দর্য দান করা হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে দেয়া হয়েছে অর্ধাংশ। ওহীর সূচনায় তাঁকে আবৃত করে নেয়া হত। হুযূর (সাঃ) জিবরাঈলকে তার নিজস্ব আকৃতিতে দেখেছেন। তাঁর আবির্ভাবের পর অতীন্দ্রিয়বাদ খতম হয়ে গেছে। আকাশকে চুরি করে শ্রবণ থেকে সংরক্ষিত করা হয়েছে এবং আকাশ থেকে শয়তানদের উপর অগ্নিগোলা নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে তাঁর পিতামাতাকে জীবিত করা হয়েছে এবং তারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন। যারা ঈমান আনতে পারেননি, তাদের জন্যে তাঁর আযাব হ্রাসের দোয়া কবুল হয়েছে, যেমন আবূ তালিব।

আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার অঙ্গীকার করেছেন। রাত্রিকালীন ভ্রমণের মাধ্যমে তাঁর মেরাজ হয়েছে এবং সপ্ত আকাশ বিদীর্ণ হয়েছে। তিনি দুই ধনুকের ব্যবধান قَابَ قَوْسَيْنِ পর্যন্ত উত্তীর্ণ এমন স্থানে উপনীত হয়েছেন, যেখানে কোন নবী-রসূল ও কোন নৈকট্যশীল ফেরেশতা পৌঁছতে পারেনি।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে সকল পয়গম্বরকে জীবিত করা হয়েছে। তিনি তাঁদেরকে এবং ফেরেশতাগণকে নামায পড়িয়েছেন। তিনি জান্নাত ও দোযখ

Contents

দেখেছেন এবং তাঁর পালনকর্তার বড় বড় নিদর্শনা প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি দু'বার আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করেছেন। তাঁর সাথে কাঁধ মিলিয়ে ফেরেশতারা যুদ্ধ করেছে।

উপরোক্ত চল্লিশটি বৈশিষ্ট্য ইতিপূর্বে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে কোরআনুল করীমের মোজেযা দান করা হয়েছে, যা অক্ষয়, অপরিবর্তনীয়, সারগর্ভ এবং প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু সম্বলিত। কোরআন পাক হিফয করা সহজ। অল্প অল্প করে অবতীর্ণ এই কিতাবে সাতটি কেরাআত (পঠনপদ্ধতি) আছে। অধ্যায়ও সাতটি আছে – 'যজর' (সতর্কবাণী), 'আমর' (আদেশ-নিষেধ), 'হালাল' (বৈধ), 'হারাম' (অবৈধ), 'মুহকাম' (সুস্পষ্ট অকাট্য), 'মুতাশাবিহ' (অস্পষ্ট) এবং 'আমছাল' (দৃষ্টান্ত)। কোরআন আরবের প্রত্যেক আঞ্চলিক ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন–

لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ۔

অর্থাৎ, যদি মানব ও জিন এই কোরআনের অনুরূপ উপস্থাপন করতে সংঘবদ্ধ হয়, তবে তারা একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেও তা করতে পারবে না।

আরও বলেন ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ ۔ وَاِنَّهٗ لَكِتَابٌ عَزِيْزٌ لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ۔

অর্থাৎ, আমিই কোরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী। কোরআন একটি পরাক্রমশালী কিতাব। বাতিল এর কাছ ঘেঁষতে পারে না–না সম্মুখ দিয়ে, না পশ্চাদদিক দিয়ে।

আরও এরশাদ হয়েছে–

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۔

অর্থাৎ, আমি আপনার প্রতি সকল বিষয়বস্তু বর্ণনাকারী কিতাব নাযিল করেছি।

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ أَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ.

অর্থাৎ, নিশ্চয় এই কোরআন বনী ইসরাঈলের কাছে তাদের বিতর্কিত অধিকাংশ বিষয় বর্ণনা করে।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ.

অর্থাৎ, আমি উপদেশের জন্যে কোরআনকে সহজ করে বর্ণনা করেছি। অতএব, কোন উপদেশগ্রাহক আছে কি?

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ.

অর্থাৎ, কোরআনকে খণ্ড খণ্ড করেছি, যাতে আপনি মানুষের কাছে তা থেমে থেমে পাঠ করেন।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ.

অর্থাৎ, কাফেররা বলল ঃ কোরআন তার উপর এক দফায় নাযিল হল না কেন? এমনি ভাবেই নাযিল করেছি, যাতে আপনার হৃদয়কে এতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেই।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন— প্রত্যেক নবীকে একটি ঈমান আনার নিদর্শন দেয়া হয়েছে। আমার প্রতি আল্লাহ ওহী প্রেরণ করেছেন। আমি আশা করি আমার অনুসারী সকল নবীর অনুসারীদের চেয়ে অধিক হবে।

ইয়াহইয়া ইবনে আকছাম রেওয়ায়েত করেন— খলীফা মামুনুর রশীদের কাছে এক ইহুদী আগমন করল। সে চমৎকার কথাবার্তা বললে খলীফা তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু সে কবুল করল না এবং চলে গেল। এক বছর পর সেই ইহুদী মুসলমান অবস্থায় খলীফার দরবারে এল। সে ইসলামী ফেকাহ সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করল। মামুনুর রশীদ জিজ্ঞেস করলেন ঃ এবার ইসলাম গ্রহণের কি কারণ ঘটল? সে বলল ঃ আমি আপনার কাছ থেকে যাওয়ার পর বিভিন্ন ধর্ম পরীক্ষা করেছি। সেমতে আমি তাওরাতের তিনটি কপি পরিবর্তন

সহকারে লিপিবদ্ধ করলাম এবং ইহুদী উপাসনালয়ে নিয়ে গেলাম। তারা সবগুলো কপি ক্রয় করে নিল। এরপর আমি ইনজীলও এমনিভাবে পরিবর্তন সহকারে লিপিবদ্ধ করলাম এবং গির্জায় নিয়ে গেলাম। এ কপিও বিক্রয় হয়ে গেল। অবশেষে আমি কোরআন শরীফও অদলবদল করে লিপিবদ্ধ করলাম এবং তিনটি কপি তৈরী করে মুসলমানদের কাছে নিয়ে গেলাম। কিন্তু তারা এই পরিবর্তন-পরিবর্ধন আঁচ করে নিল এবং কপিগুলো ক্রয় করল না। এ থেকে আমার বুঝতে বাকী রইল না যে, কোরআন সুসংরক্ষিত। এটাই আমার ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে আকছাম বর্ণনা করেন, আমি হজ্জে গমন করে সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়নার সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং এই ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন ঃ তাওরাত ও ইনজীল সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন–

بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ ․

এতে তাওরাত ও ইনজীলের হেফাযত ইহুদী ও খৃষ্টানদের দায়িত্ব বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কোরআনের হেফাযত সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন–

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ ․

অর্থাৎ, কোরআনের হেফাযতকে আল্লাহ নিজ দায়িত্বে রেখেছেন। একারণেই কোরআন সংরক্ষিত। এতে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যায় না।

বায়হাকী হযরত হাসান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আল্লাহ তা'আলা একশ চারটি কিতাব নাযিল করেছেন। এই সবগুলো কিতাবের জ্ঞানা-বিজ্ঞানকে তিনি তাওরাত, ইনজীল, যাবূর ও কোরআন–এই চার কিতাবের মধ্যে গচ্ছিত রেখেছেন। অতঃপর তাওরাত, ইনজীল ও যাবূরের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কোরআনের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা করে, সে যেন কোরআন শরীফ অধ্যয়ন করে। কেননা, এতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল জ্ঞান বিদ্যমান আছে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কোরআন মজীদে প্রতিটি জ্ঞান নাযিল করেছেন এবং প্রতিটি বস্তু বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমাদের জ্ঞান তা বেষ্টন করতে অক্ষম।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, যদি আল্লাহ তা'আলা বিস্মৃত হতেন, তবে ধূলিকণা, রাই ও মাছিকে

বিস্মৃত হতেন। (অর্থাৎ তিনি কোন কিছুকে বিস্মৃত হন না। তাঁর জ্ঞান সকল বস্তুকে পরিবেষ্টনকারী।)

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আগে কিতাব এক অধ্যায় ও এক হরফের উপর নাযিল হত। কিন্তু কোরআন মজীদ সাত অধ্যায় ও সাত হরফের উপর নাযিল হয়েছে। সেমতে কোরআনে একাধারে রয়েছে সতর্কবাণী, আদেশ, হালাল, হারাম, মুহকাম, মুতাশাবিহ ও দৃষ্টান্ত।

ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ প্রথমে জিবরাঈল আমাকে এক হরফের উপর কোরআন পড়াতেন। আমি আরও বেশী চাইলে তিনি হরফ বাড়াতে থাকেন। অবশেষে তিনি সাত হরফের উপর কোরআন পাঠ করালেন।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ কোরআন শরীফে প্রত্যেক ভাষার শব্দ আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ এতে রোমক ভাষার শব্দ কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ فَصُرْهُنَّ রোমক ভাষার শব্দ। এর মূল ধাতুর অর্থ কর্তন করা।

আমাদের নবী (সাঃ)-এর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর মোজেযা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে; অর্থাৎ কোরআনুল করীম। অন্যান্য নবীর মোজেযাসমূহ চিরন্তন ছিল না। শায়খ ইযযুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম নবী করীম (সাঃ)-এর মোজেযাসমূহ গণনা করে বলেছেন যে, তাঁর মোজেযাসমূহ সংখ্যার দিক দিয়ে সকল নবীর মোজেযাকে ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর মোজেযার সংখ্যা এক হাজার, কেউ বলেছেন তিন হাজার।

শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) এক বৈশিষ্ট্য এই যে, সকল পয়গম্বরকে যত মোজেযা দেয়া হয়েছে, সেগুলো সব একা তাঁর সত্তার মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। অন্য কোন নবীর মধ্যে তা হয়নি। শায়খ ইযযুদ্দীন পাথরের সালাম করা এবং খর্জুর শাখার ফরিয়াদ করাকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণ্য করেছেন এবং বলেছেন ঃ কোন নবীই এর অনুরূপ মোজেযা পাননি। রসূলুল্লাহর (সাঃ) অঙ্গুলি মোবারক থেকে পানি প্রবাহিত হওয়াও তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য এবং চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়াকেও তাঁর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণনা করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) এক বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি খাতামুন্নাবিয়্যীন, তথা সর্বশেষ নবী। তিনি সকল নবীর পরে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। এই শরীয়ত অতীত শরীয়তসমূহকে রহিত করে দিয়েছে। যদি সকল নবী তাঁর আমলে থাকতেন, তবে তাঁর অনুসরণ করতেন।

—১৪

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ.

অর্থাৎ, মোহাম্মদ তোমাদের কারও পিতা নন। তিনি আল্লাহর রসূল ও সর্বশেষ নবী।

আরো বলেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا لَّهٗ.

অর্থাৎ, আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী ও সমর্থনকারী।

আরও এরশাদ হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ.

অর্থাৎ, তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সকল ধর্মের উপর প্রবল করে দেন।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) শরীয়ত যে অন্য সকল শরীয়তকে রহিত করে দিয়েছে, তার দলীলস্বরূপ ইবনে সাবা' এই আয়াতগুলো পেশ করেছেন।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন আমার হাতে ছিল জনৈক আহলে কিতাবের দেয়া একটি কিতাব। হুযূর (সাঃ) আমাকে দেখে বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি আজ মূসা (আঃ) জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ ছাড়া তারও কোন গত্যন্তর থাকত না।

কোরআন পাকে 'নাসেখ' (রহিতকারী) এবং 'মনসূখ' (যাকে রহিত করা হয়) আছে। এটা রসূলুল্লাহর (সাঃ) একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন–

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا.

অর্থাৎ, আমি কোন আয়াত রহিত করি না কিংবা ভুলিয়ে দেই না; কিন্তু তার পরিবর্তে তার চেয়ে উত্তম কিংবা তদনুরূপ আয়াত নিয়ে আসি।

অন্যান্য কিতাবে এরূপ করা হয়নি। একারণেই ইহুদীরা নসখ তথা রহিতকরণ অস্বীকার করে : অতীত কিতাবসমূহ এক দফায় নাযিল হয়েছে। তাই সেগুলোতে নাসেখ ও মনসূখ কল্পনা করা যায় না। কেননা, মনসূখের কিছু সময় পরে আসা নাসেখের জন্যে জরুরী।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আরশের ধনভাণ্ডার থেকে অংশ দেয়া হয়েছে। অন্য কোন পয়গম্বর তা পাননি। এটাও তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কিত হাদীস পরে উল্লেখ করা হবে।

রসূলে করীম (সাঃ) সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা অন্য পয়গম্বরের চেয়ে বেশী। তিনি জিনদের প্রতিও প্রেরিত হয়েছেন; এক উক্তি অনুযায়ী ফেরেশতাগণের প্রতিও। তিনি উম্মী ছিলেন।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ٠

অর্থাৎ, আমি আপনাকে সমগ্র মানুষের প্রতিই প্রেরণ করেছি।

আরও এরশাদ হয়েছে ঃ

تَبَارَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا ٠

অর্থাৎ, মহিমান্বিত সেই সত্তা, যিনি তার দাসের উপর কোরআন নাযিল করেছেন, যাতে সে সারা বিশ্বের জন্যে সতর্ককারী হয়ে যায়।

হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ আমাকে পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে-(১) এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত আমার ভীতি ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। (২) ভূপৃষ্ঠ আমার জন্যে পবিত্র ও মসজিদ করা হয়েছে। আমার উম্মতের যে কেউ যে-কোন স্থানে থাকুক, নামাযের সময় এলে সে সেখানেই নামায পড়ে নেবে। (৩) আমার জন্যে গনীমত হালাল করা হয়েছে। পূর্বে এটা হালাল ছিল না। (৪) আমাকে উম্মতের পক্ষে সুপারিশ করার অধিকার দেয়া হয়েছে। (৫) আমি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের পরিবর্তে সমগ্র মানব গোষ্ঠীর প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

আমাকে পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে-যা পূর্ববর্তী নবীগণকে দেয়া হয়নি। সমগ্র ভূপৃষ্ঠ আমার জন্যে পবিত্র ও মসজিদ করা হয়েছে। অতীত পয়গম্বরগণ কেবল আপন আপন মেহরাবে নামায আদায় করতে পারতেন। এক মাসের দূরত্বে আমার ভীতি ছড়িয়ে দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। প্রত্যেক নবী বিশেষ করে আপন সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন। আমি সমগ্র মানব ও জিনের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। পূর্ববর্তী নবীগণ গনীমতের 'খুমুস' (এক-পঞ্চমাংশ) আলাদা করে একদিকে রেখে দিতেন এবং অগ্নি তা ভস্মীভূত করে দিত। আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন এই খুমুস উম্মতের দরিদ্র ও নিঃস্বদের মধ্যে বন্টন করে দেই। প্রত্যেক নবী যে দোয়া করেছেন, তা কবুল হয়েছে। আমি আমার উম্মতের সুপারিশের জন্যে নিজের দোয়া সবশেষে রেখেছি।

হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) গৃহের বাইরে এসে বললেন ঃ জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে এসে বললেন ঃ আপনি বাইরে যান এবং আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত বর্ণনা করুন। তিনি আমাকে দশটি বিষয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন। এই দশটি বিষয় আমার পূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয়নি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে সমগ্র মানব জাতির দিকে প্রেরণ করেছেন। আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেন আমি জিন জাতিকে আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করি। আমি উম্মী ছিলাম। ফেরেশতাগণের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। আল্লাহ আমাকে তাঁর কালাম দান করেছেন। তিনি দাঊদ (আঃ)-কে যাবূর, মূসা (আঃ)-কে তাওরাত এবং ঈসা (আঃ)-কে ইনজীল দান করেছেন। আমার আগে পিছের গোনাহ মাফ করা হয়েছে। আমাকে 'হাওযে কাওছার' দান করা হয়েছে। ফেরেশতাগণের মাধ্যমে সহায়তা করা হয়েছে। শত্রুর মনে আমার ভীতি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আমাকে সুবিস্তৃত হাওয দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বের নবীগণকে দেয়া হয়নি। আযানে আমার আলোচনা উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন আমাকে প্রশংসিত স্থান (মাকামে মাহমূদ) দান করবেন। তখন সমস্ত মানুষ অপমানিত হবে, দৃষ্টি নত রাখবে এবং অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে মানুষের প্রথম দলে উত্থিত করবেন। আমি আমার উম্মতের সত্তর হাজার মানুষকে সুপারিশ করে জান্নাতে দাখিল করব। তাদের কোন হিসাব নেয়া হবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাকে জান্নাতে নাঈমের সর্বোচ্চ কক্ষে আসীন করবেন। কেউ আমার উপরে থাকবে না আরশবাহক ফেরেশতাগণ ছাড়া। আমাকে রাজত্ব ও প্রাবল্য দান করা হয়েছে। আমার এবং আমার উম্মতের জন্যে গনীমত হালাল হয়েছে, যা আমার পূর্বে কারও জন্যে হালাল ছিল না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত

মোহাম্মদ (সাঃ)-কে সকল নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। উপস্থিত লোকেরা প্রশ্ন করল ঃ আকাশবাসীদের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব কি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ পাক আকাশবাসীদেরকে বলেছেন ঃ

مَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّىْ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذَالِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ·

অর্থাৎ, তাদের যে কেউ বলবে যে, সে আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য, আমি তাকে জাহান্নামের শাস্তি দিব।

অপরপক্ষে মোহাম্মদ (সাঃ)-কে আল্লাহ্ বলেছেন–

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ·

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি, যাতে আল্লাহ আপনার আগে-পিছের সকল গোনাহ মাফ করে দেন।

এই উক্তির কারণে রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে নিষ্পাপতা অপরিহার্য হয়ে গেছে। প্রশ্ন করা হল ঃ পয়গম্বরগণের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব কি? হযরত ইবনে আব্বাস বললেন ঃ আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ ·

অর্থাৎ, আমি প্রত্যেক রসূলকে তার সম্প্রদায়ের ভাষায় প্রেরণ করেছি।

অপরপক্ষে মোহাম্মদ (সাঃ)-কে বলেছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ·

অর্থাৎ, আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যেই প্রেরণ করেছি।

সুতরাং তিনি জিন ও মানবের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন।

ইবনে সা'দ হাসান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আমি তাদের রসূল, যাদেরকে আমি জীবিত পেয়েছি এবং যারা আমার পরে আসবে, আমি তাদেরও রসূল।

খালেদ ইবনে মা'দান (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমি সমস্ত মানুষের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। যদি সমস্ত মানুষ আমার দাওয়াত কবুল না করে, তবে আমি আরব জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি। যদি আরব জাতিও আমার দাওয়াত কবুল না করে, তবে আমি কোরায়শ বংশের প্রতি

প্রেরিত হয়েছি। যদি তারাও আমার দাওয়াত কবুল না করে, তবে আমি বনী হাশেমের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। যদি তারাও আমার দাওয়াত কবুল না করে, তবে আমার দাওয়াত একা আমার জন্যেই। আল্লাহ্ যা আদেশ করবেন, আমি তা মেনে চলব।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আমার উম্মত আমার সাথে সেই বন্যার মত আসবে, যা রাতের বেলায় আসে। এটা দেখে ফেরেশতারা বলবে ঃ মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারী অন্য পয়গম্বরগণের চেয়ে বেশী।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কোন নবীর এতটুকু সত্যায়ন করা হয়নি, যতটুকু আমার করা হয়েছে। কেননা, এমন নবীও আছেন, যার সত্যায়ন কেবল এক ব্যক্তি করেছে।

আলেমগণের এ বিষয়ে ইজমা (ঐকমত্য) আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সমগ্র মানব ও জিনের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। ফেরেশতাগণের প্রতি প্রেরিত হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। ইমাম সুবকীর মতে হুযূর (সাঃ) ফেরেশতাগণের প্রতিও প্রেরিত হয়েছেন। ইকরামা থেকে বর্ণিত হাদীস এর দলীল। তাতে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীবাসীদের কাতার আকাশবাসীদের কাতারের অনুরূপ। পৃথিবীর মানুষ যখন "আমীন" বলে এবং তা ফেরেশতাদের আমীনের অনুরূপ হয়, তখন মানুষের মাগফেরাত হয়।

রসূলে আকরাম (সাঃ) রহমাতুল্লিল আলামীন অর্থাৎ সারা বিশ্বের জন্যে রহমতস্বরূপ। তিনি কাফেরদের জন্যেও রহমত। কারণ, তাঁকে মিথ্যারোপ করায় তাদের উপর আযাব নাযিল হয়নি। অথচ অন্য পয়গম্বরগণকে মিথ্যারোপ করার কারণে কাফেরদের উপর আযাব নাযিল হয়েছে।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

আমি আপনাকে রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।

আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ.

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে আপনার উপস্থিতিতে আল্লাহ্ তাদেরকে আযাব দেবেন না।

আবূ উমামা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্

তা'আলা আমাকে বিশ্বের জন্যে রহমত এবং মুত্তাকীদের জন্যে হেদায়াত করে প্রেরণ করেছেন।

আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে ঃ সাহাবায়ে কেরাম বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করবেন না? তিনি বললেন ঃ আমি রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছি-আযাবস্বরূপ নয়।

وَمَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ.

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে,তার জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে রহমত। আর যে ব্যক্তি ঈমান আনেনি, তার জন্যে তাঁর সত্তা দুনিয়াতে রহমত। কারণ, সে দুনিয়াতে আযাব পায়নি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মোহাম্মদ (সাঃ) অপেক্ষা অধিক সম্মানিত কোন প্রাণী সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ পাক তাঁর জীবনের কসম খেয়েছেন এবং বলেছেন ঃ

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ.

অর্থাৎ, আপনার জীবনের কসম, কাফেররা তাদের নেশায় দিশেহারা হয়ে ফিরছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ পয়গম্বরগণের উপর আমাকে দু'টি ফযীলত দেয়া হয়েছে। আমার সহচর শয়তান কাফের ছিল। আল্লাহ তা'আলা তার উপর আমাকে সহায়তা দান করেছেন। ফলে, সে মুসলমান হয়ে গেছে। আবূ হুরায়রা বলেন ঃ অপর ফযীলতটি আমি ভুলে গেছি।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেরই শয়তানদের মধ্য থেকে একজন করে সহচর আছে। ফেরেশতাদের মধ্য থেকেও একজন সহচর আছে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার সহচর কে? তিনি বললেন ঃ আমার সহচরও শয়তানদের মধ্য থেকে আছে। কিন্তু তার উপর আল্লাহ আমাকে সাহায্য দান করেছেন। সে মুসলমান হয়ে গেছে এবং আমাকে সৎকাজের আদেশ করে।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ আদম (আঃ)-এর উপর আমাকে দু'টি ফযীলত দেয়া হয়েছে। (১) আমার শয়তান কাফের ছিল। আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে সে মুসলমান হয়ে গেছে। (২)

আমার পত্নীগণ ভাল কাজে আমার মদদগার। আদম (আঃ)-এর শয়তান কাফের ছিল এবং তাঁর পত্নী ভুল কাজে তার মদদগার ছিল।

আবূ নঈম বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সম্বোধন করার সেই পদ্ধতি বদলে দিয়েছেন, যে পদ্ধতিতে পূর্ববর্তী উম্মত তাদের পয়গম্বরগণকে সম্বোধন করত। তারা তাদের নবীগণকে راعنا, (আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন) বলে সম্বোধন করত। কিন্তু রসূলুল্লাহর (সাঃ) উম্মতকে এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

অর্থাৎ, ঈমানদারগণ! তোমরা "রায়িনা" বলো না; বরং উনযুরনা (আমাদের প্রতি দেখুন) বল। আর তোমরা শ্রবণ কর। কাফেরদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

আলেমগণ বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কোরআন পাকে তাঁকে নাম ধরে সম্বোধন করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে–

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ – হে নবী!

يَاأَيُّهَا الرَّسُوْلُ – হে রসূল!

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ – হে বস্ত্রাচ্ছাদিত!

يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ – হে বস্ত্রাবৃত!

অন্য পয়গম্বরগণ ছিলেন এর বিপরীত। তাঁদেরকে তাঁদের নাম ধরে সম্বোধন করা হয়েছে; যেমন বলা হয়েছে ঃ

يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ – হে আদম! তুমি এবং তোমার পত্নী জান্নাতে বসবাস কর।

يَا نُوْحُ اهْبِطْ – হে নূহ! অবতরণ কর।

يَا اِبْرَاهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا – হে ইবরাহীম! এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।

يَا مُوْسَى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ - হে মূসা! আমি তোমাকে মনোনীত করেছি।

يَا عِيْسَى اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ - হে ঈসা! তোমার প্রতি আমার নেয়ামত স্মরণ কর।

يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ - হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা করেছি।

يَا زَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ - হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি।

يَا يَحْيٰى خُذِ الْكِتَابَ - হে ইয়াহইয়া! কিতাব ধারণ কর।

আবূ নঈম বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ)-এর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁকে নাম ধরে ডাকা উম্মতের উপর হারাম করা হয়েছে। অন্য উম্মতগণের অবস্থা এরূপ নয়। তারা তাদের নবীগণকে সরাসরি নাম ধরে ডাক দিত। কোরআন পাকে আছে- قَالُوْا يَا مُوْسَى اجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ.

অর্থাৎ, বনী ইসরাঈল বলল ঃ হে মূসা, আমাদের জন্যে একটি উপাস্য ঠিক কর, যেমন তাদের উপাস্য রয়েছে।

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ.

অর্থাৎ, যখন হাওয়ারীরা বলল ঃ হে মরিয়ম তনয় ঈসা!

কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে কোরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ

لَاتَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا.

অর্থাৎ, তোমরা একে অপরকে যেভাবে ডাক দাও, রসূলকে তেমন করে ডাক দিয়ো না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ সাহাবীগণ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে يَا مُحَمَّدُ - يَا اَبَا الْقَاسِمُ 'হে মোহাম্মদ!' 'হে আবুল কাসেম!' বলে ডাক দিত। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীর মাহাত্ম্যের খাতিরে এভাবে

ডাক দিতে নিষেধ করেছেন। এরপর তাঁকে يا نبي الله 'ইয়া নবীয়াল্লাহ

يا رسول لله, 'ইয়া রসূলাল্লাহ' বলে ডাকা হত।

বায়হাকী আলকামা ও আসওয়াদ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, 'ইয়া মোহাম্মদ!' বলো না; বরং 'ইয়া রসূলাল্লাহ' ও 'ইয়া নবীয়াল্লাহ' বল।

কাতাদাহ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে—নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করতে হবে এবং সর্বত্র তাঁকে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করতে হবে—এটা আল্লাহর হুকুম।

রসূলে আকরাম (রাঃ)-এর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কবরে মৃতকে তাঁর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কবরে মৃতকে আমার সম্পর্কে পরীক্ষা করা হয়। সৎকর্মপরায়ণ মৃতকে কবরে বসিয়ে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে—ইনি মোহাম্মদ, আল্লাহর রসূল।

হযরত হাকীম তিরমিযী (রহঃ) বলেন ঃ কবরের সওয়াল এই উম্মতেরই বিশেষ ব্যাপার।

রসূলে করীম (সাঃ)-এর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, মালাকুল মওত তাঁর অনুমতিক্রমে তাঁর কাছে এসেছিল। এ সম্পর্কিত হাদীস ওফাত অধ্যায়ে উল্লেখ করা হবে। জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন ঃ আমি কিতাবুল বরযখে সেই সব রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছি, যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা ও হযরত দাঊদ (আঃ)-এর কাছে মালাকুল মওত বিনানুমতিতে এসেছিল।

নবী করীম (সাঃ)-এর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর পরে তাঁর পত্নীগণকে বিয়ে করা হারাম। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ٠

অর্থাৎ, তোমাদের কারও সংগত নয় যে, আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেবে এবং তাঁর পর তাঁর পত্নীগণকে বিয়ে করবে। আল্লাহর কাছে এটা ঘোরতর অপরাধ।

কোন নবীর জন্যে এ বিষয়টি প্রমাণিত নেই। তবে হযরত ইবরাহীম (আঃ) হযরত সারা সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর বোন। তিনি সারাকে তালাক দিয়ে জাব্বারের বিবাহে দেয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। এ থেকে প্রমাণ করা হয় যে, নবীপত্নীকে বিবাহ না করার বিধান অন্যান্য নবীর বেলায় ছিল না।

বর্ণিত আছে যে, হযরত হুযায়ফা (রাঃ) তাঁর পত্নীকে বলেছিলেন, যদি তুমি জান্নাতেও আমার বিবি থাকতে চাও, তবে আমার পরে কাউকে বিয়ে করো না। কারণ, জান্নাতের নারী তারই বিবি হবে, যে দুনিয়াতে তার সর্বশেষ স্বামী হবে। তাই নবী করীম (সাঃ)-এর পত্নীগণের উপর তাঁর পরে অন্য কোন পুরুষকে বিয়ে করা হারাম। কারণ, তাঁরা জান্নাতে তাঁর পত্নী হবেন।

এ বিধানের এক কারণ এই যে, নবী করীম (সাঃ)-এর পত্নীগণ "উম্মাহাতুল মুমিনীন" অর্থাৎ মুমিনদের মা। তাই তাদের বিবাহ কোনক্রমেই সংগত নয়। আরও এক কারণ এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বীয় কবর মোবারকে জীবদ্দশায় আছেন। এ কারণেই তাঁর ওফাতের পর পত্নীগণের উপর ইদ্দত ওয়াজেব নয়।

তবে যে সকল মহিলাকে নবী করীম (সাঃ) জীবদ্দশায় ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাদের সম্পর্কে আলেমগণের একাধিক উক্তি আছে। এক উক্তি এই যে, তাদের বিয়েও হারাম। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন ঃ আয়াতের বিধান ব্যাপক। আয়াতে "পরে" অর্থ কেবল মৃত্যুর পরে নয়; বরং বিবাহের পরে-ও। ইমাম রাফেঈ বলেন ঃ যে পত্নীর সাথে বিয়ের পর সহবাস হয়েছে, কেবল তার বিবাহই হারাম। কেননা, রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে আশআছ ইবনে কায়স (রাঃ) রসূলুল্লাহর (সাঃ) এক বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করেন। হযরত ওমর (রাঃ) তার উপর রজমের বিধান প্রয়োগ করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তাকে বলা হয় যে, এই মহিলা রসূলুল্লাহর (সাঃ) "সহবাস করা" (মদখুল বিহা) পত্নী নয়। সেমতে হযরত ওমর (রাঃ) রজম করা থেকে বিরত থাকেন।

যে মহিলা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছ থেকে নিজে বিচ্ছেদ বেছে নিয়েছেন, তার সম্পর্কেও আলেমগণের মতভেদ আছে। এ সম্পর্কে বিশুদ্ধ উক্তি হচ্ছে ইমামুল হারামাইন ও ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর উক্তি। তা এই যে, এরূপ মহিলার বিবাহ হালাল।

"মদখুল বিহা" বাঁদী সম্পর্কে উপরোক্ত উক্তি ছাড়া এক উক্তি এই যে, যদি ওফাতের মাধ্যমে বিচ্ছেদ হয়ে থাকে, তবে তার বিবাহ হারাম; যেমন ছিলেন হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ)। আর যদি রসূলুল্লাহ (সাঃ) জীবদ্দশাতেই এরূপ বাঁদীকে বিক্রয় করে দিয়ে থাকেন, তবে তার বিবাহ হালাল।

আবূ নঈম বলেন, অতীত পয়গম্বরগণ তাদের উপর শত্রুপক্ষের অভিযোগ নিজেরা খণ্ডন করতেন; যেমন নূহ (আঃ) বলেন ঃ

يَا قَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلَالَةٌ.

অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোন পথভ্রষ্টাতা নেই।

হযরত হূদ (আঃ) বলেন ঃ

يَا قَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ ·

অর্থাৎ, হে আমার কওম! আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা নেই। কিন্তু আমাদের নবী (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য এই যে, শত্রুরা যে সকল ভ্রান্ত অপবাদ তাঁর প্রতি আরোপ করেছে, তার জওয়াব আল্লাহ জাল্লা শানুহু স্বয়ং দিয়েছেন। উদাহরণত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ·

অর্থাৎ, আপনি আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহে উন্মাদ নন।

আরও বলেন ঃ

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى

তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত হননি এবং বিপথগামী হননি।

আরও বলেন ঃ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ ·

অর্থাৎ, আমি তাকে কাব্যচর্চা শিক্ষা দেইনি।

আবূ নঈম বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) এক বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রেসালতের কসম খেয়েছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

يٰسٓ- وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ -اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ·

অর্থাৎ, ইয়াসীন! প্রজ্ঞাময় কোরআনের কসম, নিশ্চয় আপনি রসূলগণের একজন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি দুই কেবলা ও দুই হিজরত একত্রিত করেছেন এবং শরীয়ত ও তরীকতও একত্রিত করেছেন। অতীত পয়গম্বরগণ এরূপ করেননি। এর প্রমাণ হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত খিযির (আঃ)-এর ঘটনা। হযরত খিযির (আঃ) বললেন ঃ আমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছি। এতে দখল দেয়া আপনার জন্যে সমীচীন নয়। আর আপনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক জ্ঞান লাভ করেছেন, যাতে দখল দেয়া আমার জন্যে সংগত নয়।

শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন ঃ বদর ইবনে সাহেব (রাঃ) রসূলুল্লাহর (সাঃ) শরীয়ত ও তরীকত একত্রিত করার প্রমাণস্বরূপ সেই হাদীস উল্লেখ

করেছেন, যাতে তিনি চোরকে হত্যা করার আদেশ দেন এবং সেই হাদীস উল্লেখ করেছেন, যাতে তিনি একজন নামাযী ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড দেন। এগুলো গায়েবী ব্যাপার বৈ নয়।

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা

শরীয়ত হচ্ছে বাহ্যিক বিধানাবলী এবং হাকীকত হচ্ছে বাতেনী তথা অভ্যন্তরীণ বিধানাবলী। অধিকাংশ পয়গম্বর বাহ্যিক বিধানাবলী অর্থাৎ শরীয়তসহ প্রেরিত হয়েছেন। বাতেনী বিধান দেয়া তাদের জন্যে নিষিদ্ধ। হযরত খিযির (আঃ)-কে হাকীকত অর্থাৎ বাতেনী বিষয়াদি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করা হয়েছিল। পয়গম্বরগণ বাতেনী বিধান দেয়ার জন্যে প্রেরিত হননি—এ কারণেই বালক হত্যার কারণে হযরত মূসা (আঃ) খিযিরের বিরুদ্ধে এই বলে আপত্তি তুললেন ঃ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا —আপনি একটি গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন। কেননা, প্রাণহত্যা বাহ্যিক শরীয়তের খেলাফ। হযরত খিযির (আঃ) জওয়াবে বললেন ঃ আমি আমার নিজস্ব মতানুযায়ী তাকে হত্যা করিনি; বরং আমাকে এভাবেই আদেশ করা হয়েছে। আমি এক জ্ঞান পেয়েছি—খিযির (আঃ)-এর এ কথার অর্থ তাই।

শায়খ সিরাজুদ্দীন বলকিনী (রহঃ) বুখারী শরীফের টীকায় বলেন ঃ এখানে 'জ্ঞান' অর্থ বিধান প্রয়োগ করা। উদ্দেশ্য এই, হে মূসা! এই জ্ঞান জানার পর তদনুযায়ী আমল করা আপনার জন্যে সংগত নয়। কেননা, এই আমল শরীয়তের খেলাফ। আর আমার জন্যে সমীচীন নয় যে, আমি আপনার জ্ঞান অনুযায়ী আমল করি। কেননা, এটা হাকীকতের খেলাফ। সিরাজুদ্দীন বলকিনী আরও বলেন ঃ যে ওলী হাকীকত সম্পর্কে অবগত হয়ে যায়, তার জন্যে হাকীকত অনুযায়ী ফয়সালা করা জায়েয নয়; বরং তাকেও শরীয়ত অনুযায়ী আমল করা উচিত। আবূ হাব্বান স্বীয় তাফসীরে বলেন ঃ অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে একমত যে, খিযির (আঃ) নবী। তাঁর জ্ঞান ছিল সেই সব অভ্যন্তরীণ বিষয়কে জানা, যেগুলোর ওহী তার প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে মূসা (আঃ)-এর জ্ঞান ছিল যাহির তথা বাহ্যিক। শায়খ তকীউদ্দীন সুবকী (রহঃ) বলেন ঃ হযরত খিযির যে বিধানসহ প্রেরিত হন, সেটা তাঁর সামগ্রিক শরীয়ত। আমাদের নবী (সাঃ)-কে প্রথমে বাহ্যিক শরীয়ত অনুযায়ী আমল করার আদেশ করা হয় যদিও তিনি অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি তথা হাকীকত সম্পর্কে অবগত ছিলেন। একারণেই তিনি বলেন ঃ আমি বাহ্যিক বিষয়ের ফয়সালা করি। অভ্যন্তরীণ বিষয় আল্লাহ তা'আলা জানেন। আমি যে বিধান শুনি, তদনুযায়ী আমল করি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন ঃ তোমার বাহ্যিক অবস্থা আমার দায়িত্বে। তোমার অন্তরের গোপন ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলা জানেন। তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণে যারা ব্যর্থ হয়েছিল, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের ওযর কবুল করেছিলেন এবং তাদের আন্তরিক নিয়ত আল্লাহর কাছে সোপর্দ করেছিলেন। যে মহিলাকে তিনি বলেছিলেন, যদি আমি সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতিরেকে কাউকে রজম করতাম, তবে এই মহিলাকে অবশ্যই করতাম। তিনি আরও বলেছিলেন, কোরআন করীম না থাকলে আমার ও এই মহিলার আচরণ আশ্চর্য ধরনের হত। এসব বিষয় এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বাহ্যিক শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করতেন। হাকীকত সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তদনুযায়ী ফয়সালা করতেন না। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁকে হাকীকত অনুযায়ী ফয়সালা করার অনুমতি দিয়েছেন। এভাবে শরীয়ত ও হাকীকতকে তাঁর মধ্যে একত্রিত করে দেয়া হয় এবং একে তাঁর বৈশিষ্ট্য করে দেয়া হয়।

কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে বলেন ঃ নিজস্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে কাউকে প্রাণদণ্ড দেয়ার অনুমতি কোন বিচারককে দেয়া হয়নি; কিন্তু নবী করীম (সাঃ)-কে এই অনুমতি দেয়া হয়েছিল। নামাযী ব্যক্তি ও চোরকে হত্যার হাদীস এর প্রমাণ। কেননা, তিনি জানতেন যে, এরা হত্যাকাণ্ড করেছে।

কোন কোন পূর্ববর্তী আলেম উল্লেখ করেছেন যে, খিযির (আঃ) এখন পর্যন্ত হাকীকতের বিধান প্রয়োগ করে থাকেন। যে সব মানুষ হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, খিযির (আঃ)-ই তাদেরকে হত্যা করেন। এটা শুদ্ধ হলে খিযির (আঃ) এই উম্মতের মধ্যে নবী করীম (সাঃ)-এর নায়েব ও তাঁর অনুসারী হবেন; যেমন হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে অবতরণ করে রসূলুল্লাহর (সাঃ) শরীয়তের অনুসারী ও তাঁর উম্মত হবেন।

শায়খ ইযযুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) এক বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে তূর পাহাড়ে পবিত্র উপত্যকায় বাক্যালাপ করেছেন। আর আমাদের নবী (সাঃ)-এর সঙ্গে সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে বাক্যালাপ করেছেন এবং তাঁর জন্যে রেওয়ায়েত ও কালাম এবং মহব্বত ও খুল্লত একত্রিত করেছেন।

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমার রব আমাকে বলেছেন ঃ আমি ইবরাহীমকে খুল্লত দান করেছি। আমি মূসার সাথে বাক্যালাপ করেছি। হে মোহাম্মাদ! আমি আপনাকে খুল্লত ও মহব্বত দিয়েছি এবং সামনা-সামনি বাক্যালাপ করেছি।

ইবনে আসাকির সালমান (রহঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ কেউ

রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে আরয করল ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছেন, ঈসা (আঃ)-কে রূহুল কুদ্দুস (জিবরাঈল) দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, ইবরাহীম (আঃ)-কে খলীল করেছেন এবং আদম (আঃ)-কে মনোনীত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কি ফযীলত দিলেন? ইতিমধ্যে জিবরাঈল (আঃ) অবতরণ করলেন। তিনি বললেন ঃ আপনার রব বলছেন-আমি ইবরাহীমকে খলীল করেছি, আর আপনাকে করেছি হাবীব। মূসার সাথে মর্ত্যে বাক্যালাপ করেছি, আর আপনার সাথে স্বর্গে কথা বলেছি। ঈসাকে রূহুল কুদ্দুস দ্বারা সৃষ্টি করেছি, আর আপনার নাম সবকিছু সৃষ্টি করার দু'হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছি। আপনি আকাশে সেই স্থানে পদার্পণ করেছেন, যেখানে আজ পর্যন্ত কেউ যায়নি। আমি আদমকে মনোনীত করেছি, আর আপনাকে করেছি শেষ নবী। আপনার চেয়ে অধিক সম্মানিত কাউকে সৃষ্টি করিনি। আপনাকে আমি 'হাওযে কাওছার', 'শাফায়াত', উপবাস, তরবারি, মুকুট, লাঠি, হজ্জ, ওমরা ও রমযান মাস দান করেছি। কিয়ামতে আরশের ছায়া আপনার উপর লম্বমান হবে। আপনার মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বর্ণনা করার জন্যে আমি দুনিয়াবাসীকে সৃষ্টি করেছি। আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি কোন কিছুই সৃষ্টি করতাম না। আপনার মাথায় মুকুট রাখা হবে। আমি আমার নামের সাথে আপনার নাম সংযুক্ত করে দিয়েছি। এখন যেখানে আমার নাম উচ্চারিত হবে, সেখানে আপনার নাম অবশ্যই উচ্চারিত হবে।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছেন। আমাকে দীদার দান করেছেন এবং আমাকে মকামে মাহমূদ (প্রশংসিত স্থান) এবং হাওযে কাওছার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মে'রাজ রজনীতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে দুই ধনুকের দূরত্বের অনুরূপ নিকটবর্তী করলেন এবং বললেন ঃ আপনার উম্মতকে কেন শেষ উম্মত করা হল, এ সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে কি? আমি বললাম, না। আমার রব বললেন ঃ আপনার উম্মতকে বলে দিন যে, আমি তাদেরকে শেষ উম্মত করেছি, যাতে তারা অন্য উম্মতদের সামনে লজ্জিত না হয়।

শায়খ ইযযুদ্দীন বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) এক ফযীলত এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে বিভিন্ন প্রকার ওহীর মাধ্যমে বাক্যালাপ করেছেন। ওহী তিন প্রকার ঃ (১) সত্য স্বপ্ন, (২) প্রত্যক্ষভাবে কালাম করা এবং (৩) হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর মধ্যস্থতায় ওহী।

Contents

এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত নবী করীম (সাঃ)-কে ভীতির সাহায্য দেয়া হয়েছে। তাঁকে সারগর্ভ কামাল (جوامع الكلم) দান করা হয়েছে। ভূপৃষ্ঠের ধনভাণ্ডারসমূহের চাবি দেয়া হয়েছে। পাঁচটি বিষয় ছাড়া সকল বস্তুর জ্ঞান দেয়া হয়েছে। রূহের জ্ঞান দেয়া হয়েছে এবং দাজ্জাল সম্পর্কে জ্ঞাত করা হয়েছে। তাঁর নাম 'আহমদ' রাখা হয়েছে। ইসরাফীল (আঃ) তাঁর কাছে অবতরণ করেন। তাঁর জন্যে নবুওয়ত ও সুলতানাত (রাজত্ব) একত্রিত করা হয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমাকে এমন বস্তু দেয়া হয়েছে, যা কোন নবীকে দেয়া হয়নি। আমাকে ভীতি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। আমাকে ভূপৃষ্ঠের চাবি প্রদান করা হয়েছে। আমার নাম 'আহমদ' রাখা হয়েছে। আমার জন্যে ভূপৃষ্ঠ প্রকাশ করা হয়েছে এবং আমার উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত সাব্যস্ত হয়েছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমাকে নবীগণের উপর ছয়টি বিষয়ে ফযীলত দেয়া হয়েছে। (১) আমাকে সারগর্ভ কালাম দেয়া হয়েছে। (২) ভীতি দ্বারা সাহায্য দান করা হয়েছে। (৩) গনীমত হালাল করা হয়েছে। (৪) ভূপৃষ্ঠ আমার জন্যে প্রকাশ এবং মসজিদ করা হয়েছে। (৫) আমি সমগ্র সৃষ্টির প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (৬) আমার সাথে নবুওয়তের অবসান ঘটেছে।

ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) গৃহের বাইরে এসে বললেন ঃ জিবরাঈল (আঃ) এসে আমাকে সুসংবাদ দিয়ে গেলেন যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের দ্বারা আমাকে সাহায্য করেছেন। আমার ভীতি সঞ্চার করা হয়েছে। আমাকে প্রাবল্য, ক্ষমতা ও রাজত্ব দান করা হয়েছে। আমার এবং আমার উম্মতের জন্যে গনীমত হালাল করা হয়েছে।

ইমাম গাযযালী এহইয়াউল উলুমে বলেন ঃ আমাদের নবী (সাঃ)-কে নবুওয়ত, রাজত্ব ও প্রাবল্য দেয়া হয়েছে। তাঁর মাধ্যমে দীন ও দুনিয়ার সংস্কার হয়েছে এবং তাঁকে তরবারি ও রাজত্বের অধিকারী করা হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও জিবরাঈল (আঃ) সাফা পাহাড়ে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ জিবরাঈল, মোহাম্মদ-পরিবারের জন্যে না এক মুষ্টি গমের আটা আছে, না এক তালুভরা ছাতু। একথাটি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে আকাশ থেকে প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ার মত ভীষণ শব্দ কানে এল। তাঁর কাছে হযরত ইসরাফীল চলে এলেন এবং বললেন ঃ আপনি যা বলেছেন, আল্লাহ পাক তা শুনেছেন। তিনি আমাকে পৃথিবীস্থ সকল ধনভাণ্ডারের চাবি দিয়ে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন। আমাকে

আদেশ করা হয়েছে যে, মক্কার পাহাড়সমূহকে ইয়াকূত, জমররদ, সোনা ও রূপায় রূপান্তরিত করে আপনার সঙ্গে চালাই। আপনি যেখানে যান, এই পাহাড়গুলোও যেন আপনার সঙ্গে যায়। আপনি ইচ্ছা করলে নবী বাদশাহ হয়ে থাকতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে নবী-দাস হয়ে থাকতে পারেন। জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহর (সাঃ) দিকে ইশারা করলেন, যাতে তিনি দীনতা ও হীনতা অবলম্বন করেন। সেমতে তিনি তিনবার বললেন ঃ আমি নবী দাস হয়ে থাকতে চাই।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি–আমার কাছে আসমান থেকে সেই ফেরেশতা অবতরণ করেছে, যে এ যাবত কোন নবীর কাছে আসেননি। তিনি হলেন ইসরাফীল (আঃ)। তিনি বলেছেন ঃ আমি আপনার রব-প্রেরিত। আপনাকে এই ক্ষমতা দিতে এসেছি যে, আপনি ইচ্ছা করলে নবী-বান্দা হয়ে থাকুন এবং ইচ্ছা করলে নবী-বাদশাহ হয়ে থাকুন। নবী (সাঃ) বলেন ঃ আমি জিবরাঈলের দিকে তাকালাম। তিনি আমাকে দীনতা-হীনতা অবলম্বন করতে ইশারা করলেন। যদি আমি বলতাম যে, নবী-বাদশাহ হয়ে থাকতে চাই, তবে স্বর্ণের পাহাড় আমার সঙ্গে চলত।

আবূ উমামা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমার রব আমার জন্যে মক্কার কংকরময় ভূমিকে স্বর্ণ করে দিতে চাইলেন। আমি বললাম ঃ পরওয়ারদেগার, এরূপ করবেন না। আমি চাই একদিন আহার করব এবং একদিন ভুখা থাকব। যখন ভুখা থাকব, তখন তোমার সামনে কাকুতি-মিনতি করব এবং তোমাকে স্মরণ করব। আর যখন উদরপূর্তি করব, তখন তোমার হামদ ও শোকর করব।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ জনৈকা আনসারী মহিলা আমার কাছে এল। সে রসূলুল্লাহর (সাঃ) বিছানা দেখল, যা ভাঁজ করা একটি চাদর ছিল। সে দেখে চলে গেল এবং একটি পশমভর্তি বিছানা পাঠিয়ে দিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এসে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আয়েশা, এটি কি? আমি বললাম ঃ অমুক আনসারী মহিলা এসেছিল। সে আপনার বিছানা দেখে ফিরে গিয়ে এটি পাঠিয়ে দিয়েছে। হুযূর (সাঃ) তিনবার আমাকে বললেন ঃ আয়েশা এটি ফিরিয়ে দাও। কিন্তু আমার মন চাইছিল যে, বিছানাটি আমার গৃহে থাকুক তিনি আবার বললেন ঃ আয়েশা, এই বিছানা ফিরিয়ে দাও। আল্লাহর কসম, আমি চাইলে আল্লাহ তা'আলা আমার সঙ্গে স্বর্ণ ও রূপার পাহাড় চলমান করে দিতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, একবার মুশরিকরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ধিক্কার দিয়ে বলল ঃ এ কেমন রসূল, খাদ্যও খায় এবং বাজারেও ঘুরাফেরা করে! একথা শুনে হুযূর (সাঃ) মনে মনে খুব বিষণ্ণ হলেন।

অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) এসে বললেন ঃ আপনার রব আপনাকে সালাম বলেছেন। আরও বলেছেন–

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اَنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ ٠

অর্থাৎ, আপনার পূর্বে আমি যত রসূল প্রেরণ করেছি, তারা সকলেই খাদ্য খেত এবং বাজারে হাঁটাহাঁটি করত।

এরপর রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে জান্নাতের রক্ষী রিযওয়ান এলেন। তার সঙ্গে ছিল নূরের একটি থলে। তিনি বললেন ঃ এগুলো দুনিয়ার ধনভাণ্ডারসমূহের চাবি। নবী করীম (সাঃ) জিজ্ঞাসু নেত্রে জিবরাঈল (আঃ)-এর প্রতি তাকালে তিনি উভয় হাতে মাটির দিকে ইশারা করলেন। উদ্দেশ্য, আপনি দীনতা-হীনতা অবলম্বন করুন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ হে রিযওয়ান, এসব চাবির আমার কোন প্রয়োজন নেই। অতঃপর ডাক এল, উপরে তাকান। হুযূর (সাঃ) দেখলেন আকাশের দরজাসমূহ আরশ পর্যন্ত খুলে দেয়া হয়েছে এবং জান্নাতে আদন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হুযূর (সাঃ) নবীগণের মনযিল ও তাদের কক্ষ দেখলেন। এরপর নিজের মনীযলকে সবার উপরে দেখতে পেলেন। তিনি বললেন ঃ আমি সন্তুষ্ট আছি।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক বস্তুর চাবি আমাকে দেয়া হয়েছে পাঁচটি বিষয় ছাড়া, যা এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَّمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ٠

অর্থাৎ, কখন কিয়ামত হবে, তার জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন যা জরায়ূতে আছে। কেউ জানে না. আগামী কল্য সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ দেশে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে অবহিত।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক

নবী আপন উম্মতকে দাজ্জালের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। আমাকে দাজ্জাল সম্পর্কে যা যা বলা হয়েছে, তা কোন নবীকে বলা হয়নি। দাজ্জাল কানা। তোমাদের প্রভু কানা নন।

কোন কোন আলেম বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞানও দেয়া হয়েছিল। তাঁকে কিয়ামতের সময়কাল এবং রূহের স্বরূপ সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছিল। কিন্তু সাথে সাথে এগুলো গোপন রাখার নির্দেশও দেয়া হয়েছিল।

ইবনে সাবা বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) বৈশিষ্ট্যসমূহ এই যে, তিনি ক্ষুধার্ত অবস্থায় নিদ্রা যেতেন কিন্তু ভরা পেটে জাগ্রত হতেন। শক্তিতে কোন মহাবীরও তাঁর উপর প্রবল হত না। তিনি যখন উযূ করতে চাইতেন এবং পানি থাকত না, তখন অঙ্গুলি ছড়িয়ে দিতেন। তা থেকে পানি প্রবাহিত হয়ে যেত। আল্লাহ পাক তাঁর সাথে এমন স্থানে বাক্যালাপ করেন, যেখানে কোন নৈকট্যশীল ফেরেশতা এবং নবী যাননি। তিনি যখন হাঁটতেন, তখন মাটি সংকুচিত হয়ে যেত।

রসূলে করীম (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে আরও এই যে, তাঁর বক্ষ প্রশস্ত হয়েছে। তাঁর গোনাহ মার্জিত হয়েছে। জীবদ্দশায়ই তাঁর মাগফেরাতের ওয়াদা হয়েছে। তিনি আল্লাহর হাবীব ও আদম সন্তানদের নেতা। তাঁর সামনে তাঁর উম্মতকে পেশ করা হয়েছে। তাঁকে বিসমিল্লাহ, সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার খাওয়াতিম (শেষাংশ), মুফাসসাল এবং সাবয়ে তিওয়াল দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন–

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ–

অর্থাৎ, আমি কি আপনার বক্ষ প্রশস্ত করে দেইনি? আমি লাঘব করে দিয়েছি আপনার বোঝা, যা আপনার পৃষ্ঠদেশ ভেঙ্গে দিচ্ছিল। আমি আপনার স্মৃতিকে উচ্চে তুলে ধরেছি।

আরও বলেন ঃ

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ ·

অর্থাৎ, যাতে আল্লাহ আপনার করা ও না করা গোনাহ মাফ করে দেন।

শায়খ ইযযুদ্দীন বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) এক বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মাগফেরাতের খবর দিয়েছেন। অন্য কোন নবীর ক্ষেত্রে এরূপ বর্ণিত নেই। বরং বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন নবীগণও 'নফসী' 'নফসী' বলবেন। ইবনে কাছির সূরা ফাতহের উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ এটা রসূলুল্লাহর (সাঃ) বৈশিষ্ট্য— যাতে অন্য কেউ শরীক নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমি আমার রবকে প্রশ্ন করেছি। আমি মনে করি, এ প্রশ্ন না করলেই ভাল হত। আমি আরয করলাম, হে রব! আমার পূর্বে অনেক রসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন। তাদের কেউ এমন ছিলেন, যিনি মৃতকে জীবিত করে দিতেন। কেউ এমন ছিলেন, বায়ু যার তাবেদার ছিল। আল্লাহ পাক বললেন ঃ আমি কি আপনাকে এতীম পেয়ে আশ্রয় দেইনি? আমি কি আপনাকে পথহারা পেয়ে পথের দিশা দেইনি? আমি কি আপনাকে নিঃস্ব পেয়ে অভাবমুক্ত করিনি? আমি কি আপনার বক্ষ প্রশস্ত করে দেইনি? আমি আপনার বোঝা লাঘব করেছি। আমি কি আপনার যিকির উচ্চে তুলে ধরিনি? আমি আরয করলাম ঃ প্রভু হে, অবশ্যই আপনি এরূপ করেছেন।

মজমা ইবনে জারিয়া (রাঃ) বলেন ঃ আমরা সানজানে ছিলাম। লোকেরা বলল ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে যাও। আমি আমার সওয়ারীর উট তাদের সাথে হাঁকালাম এবং তাঁর কাছে পৌঁছে গেলাম। তিনি তখন إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।) তেলাওয়াত করছিলেন। জিবরাঈল (আঃ) তখনই এ সূরাটি নিয়ে অবতরণ করেছিলেন। জিবরাঈল তাঁকে মোবারকবাদ দিলেন এবং সকল মুসলমানও তাঁকে মোবারকবাদ দিলেন।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন যে, জিবরাঈল আমাকে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন যে, যখন আমার যিকির করা হয়, তখন আপনারও যিকির করা হয়।

কাতাদাহ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহর (সাঃ) যিকিরকে দুনিয়া ও আখেরাতে উঁচু করেছেন। এমন কোন খতীব, কলেমা পাঠক এবং নামাযী নেই, যে 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ' না বলে।

হযরত বুরায়দা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আমার উপর সেই আয়াত নাযিল করা হয়েছে, যা হযরত সোলায়মান (আঃ) ছাড়া কারও উপর নাযিল করা হয়নি। সেই আয়াতখানি হচ্ছে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।"

হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, আয়াতুল কুরসী আরশের নিম্নবর্তী ভাণ্ডার থেকে নবী করীম (সাঃ)-এর উপর নাযিল করা হয়েছে। এই আয়াত অন্য কোন নবীর উপর নাযিল করা হয়নি।

কা'ব (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ মোহাম্মদ (সাঃ)-কে চারটি আয়াত দান করা হয়েছে, যা মূসা (সাঃ)-কে দেয়া হয়নি। এগুলো হচ্ছে-

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ·

থেকে সূরা বাকারার শেষ পর্যন্ত তিন আয়াত এবং আয়াতুল কুরসী।

আবদুর রহমান ইবনে গনম (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমরা মসজিদে বসা ছিলাম। একটি মেঘখণ্ড এল। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ আমার কাছে এক ফেরেশতা এসেছে। সে বলল ঃ আপনার কাছে আসার জন্যে আমি সব সময় আল্লাহর অনুমতির অপেক্ষায় ছিলাম। এখন আল্লাহ্ অনুমতি দিয়েছেন। আমি আপনাকে এই সুসংবাদ দেই যে, আপনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সৃষ্টির সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তিত্ব।

আবূ নঈম বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁকে এবং অপরাপর পয়গম্বরগণকে সম্বোধন করার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ (আঃ)-কে এই বলে সম্বোধন করেছেন ঃ

فَلَاتَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ الْهُدٰى ·

অর্থাৎ, অতএব তুমি খেয়ালখুশীর অনুসরণ করবে না। তা তোমাকে হেদায়াতের পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।

আমাদের নবী (সাঃ)-কে বলেছেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى ·

অর্থাৎ, তিনি খেয়ালখুশী তাড়িত হয়ে কথা বলেন না। তিনি যা বলেন, তা ওহী বৈ নয়।

হযরত মূসা (আঃ)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ঃ

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ .

অর্থাৎ, তোমাদের ভয় যখন মনে ঢুকল, তখন আমি তোমাদের কাছ থেকে পলায়ন করলাম।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) পক্ষ থেকে বলা হয়েছে—

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا .

অর্থাৎ, যখন কাফেররা আপনার বিষয়ে চক্রান্ত করছিল।

এ আয়াতে রসূলুল্লাহর (সাঃ) মক্কা থেকে বের হওয়া এবং হিজরত করার বিষয়টিকে সুন্দর ভঙ্গিমায় উল্লেখ করা হয়েছে। বহিষ্কারকে তাঁর শত্রুদের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। সেমতে বলা হয়েছে ঃ

اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا .

অর্থাৎ, যখন তাকে কাফেররা (মক্কা থেকে) বহিষ্কার করল।

মোটকথা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) পলায়ন করেছেন ও বের হয়ে গেছেন—একথা বলা হয়নি।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি এই ঃ যে ব্যক্তি তাঁর সাথে একান্তে কথা বলবে, তাকে নযরানা পেশ করতে হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً .

অর্থাৎ, মুমিনগণ, তোমরা যখন রসূলের সাথে একান্তে আলোচনা কর, তখন আলোচনার পূর্বে নযরানা পেশ কর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ মুসলমানরা বিভিন্ন বিষয়ে অতিমাত্রায় প্রশ্ন করতে থাকে। ফলে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিরক্তিবোধ করতে থাকেন। প্রশ্নের এই হিড়িক বন্ধ করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন। এরপর যখন সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করা থেকে বিরত হয়ে গেলেন, তখন বাকী আয়াত اَشْفَقْتُمْ পর্যন্ত নাযিল হয় এবং আদেশটি কার্যত প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।

Contents

মুজাহিদ রেওয়ায়েত করেন ঃ যে ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে কথা বলার জন্যে সর্বপ্রথম এক দীনার পেশ করেন তিনি হলেন হযরত আলী (রাঃ)। এরপর আদেশটি প্রত্যাহৃত হয়।

আবু নঈম বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) অপর একটি বিশেষত্ব এই যে, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের উপর তাঁর আনুগত্য সর্বাবস্থায় ফরয করেছেন। এতে কোন শর্ত ও ব্যতিক্রম নেই। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ·

অর্থাৎ, রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে বিরত থাকতে বলেন, তা থেকে বিরত থাক।

আরও এরশাদ হয়েছে ঃ

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ·

অর্থাৎ, যে রসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহর আনুগত্য করে।

কথা ও কর্ম প্রতিটি বিষয়ে হুযূর (সাঃ)-এর আনুগত্য ওয়াজেব। কোন ব্যতিক্রম নেই।

আরও বলা হয়েছে ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ·

অর্থাৎ, তোমাদের জন্যে আল্লাহর রসূলের মধ্যে সুন্দর আদর্শিক নমুনা রয়েছে।

কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرَاهِيْمَ ·

অর্থাৎ, তোমাদের জন্যে ইবরাহীমের মধ্যে সুন্দর আদর্শিক নমুনা রয়েছে। কিন্তু এতে ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে–

اِلَّا قَوْلَ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ ·

'কিন্তু ইবরাহীমের ওয়াদা তাঁর পিতার মুক্তির জন্যে।' অর্থাৎ এটা আদর্শ নয়।

Contents

রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আনুগত্য, অবাধ্যতা এবং ওয়াদা ও শাস্তিবাণী উল্লেখ করার সময় নিজের সাথে রসূল (সাঃ)-এর কথাও বলেছেন। এরশাদ হয়েছে—

أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর।

أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং রসূলের যদি সত্যিকার মুমিন হয়ে থাক।

وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ.

অর্থাৎ, তারা আনুগত্য করে আল্লাহর এবং তাঁর রসূলের।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ.

অর্থাৎ, মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে।

اِسْتَجِيْبُوا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ.

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের ডাকে সাড়া দাও।

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ.

অর্থাৎ, যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে।

ইবনে সাবা' বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা কোরআন পাকে তাঁর এক একটি অঙ্গের উল্লেখ করেছেন। মুখমণ্ডল সম্পর্কে বলেছেন—

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ.

অর্থাৎ, আমি আপনার মুখমণ্ডলকে আকাশের দিকে বারবার উত্থিত হতে দেখেছি।

চক্ষু সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে ঃ

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا ۔

অর্থাৎ, আমি যে ভোগ সামগ্রী দিয়েছি, আপনি সেদিকে চক্ষু প্রসারিত করবেন না।

মুখ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ ۔

অর্থাৎ, আমি কোরআন আপনার মুখে সহজ করে দিয়েছি।

হাত ও গ্রীবা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ ۔

অর্থাৎ, আপনি আপনার হাতকে গ্রীবার সাথে বেঁধে রাখবেন না।

বুক ও পিঠ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىْ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۔

অর্থাৎ, আমি কি আপনার বক্ষ খুলে দেইনি? আমি আপনার সেই বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, যা আপনার পিঠ ভেঙ্গে দিচ্ছিল।

কল্‌ব সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে ঃ

نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ ۔

অর্থাৎ, তিনি এটা আপনার কল্‌বে নাযিল করেছেন।

চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۔

অর্থাৎ, নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে চারজন মন্ত্রণাদাতা (উযীর) দিয়েছেন। দু'জন আকাশবাসী হযরত জিবরাঈল ও হযরত মীকাঈল (আঃ) এবং দু'জন পৃথিবীবাসী আবূ বকর ও ওমর (রাঃ)।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন পথ চলতেন, সাহাবায়ে কেরাম তাঁর অগ্রে চলতেন, আর পিছনে চলতেন ফেরেশতাগণ।

হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (আঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক নবীকে সাতজন সহচর দেয়া হয়েছে, কিন্তু আমাকে দেয়া হয়েছে চৌদ্দজন। কেউ হযরত আলী (রাঃ)-কে এই চৌদ্দজন কে, প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ আমি, হামযা, আমার দুই পুত্র, জাফর, আকীল, আবূ বকর, ওমর, ওছমান, মেকদাদ, সালমান, আম্মার, তালহা ও যুবায়র (রাঃ)।

জা'ফর ইবনে মোহাম্মদ বর্ণনা করেন, প্রত্যেক নবী আপন পরিবারের জন্যে একটি মুস্তাজাব (কবুলযোগ্য) দোয়া ছেড়ে গেছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজ পরিবারবর্গের মধ্যে দুটি দোয়া রেখে গেছেন—একটি দুর্দিনের, অপরটি আমাদের অভাব অনটনের জন্যে। সংকট মুহূর্তের দোয়া এই ঃ

يَا دَائِمُ لَمْ يَزَلْ يَا اِلٰهِىْ وَاِلٰهَ اٰبَائِىْ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ.

অভাব-অনটনের দোয়াটি এই–

يَا مَنْ يَّكْفِىْ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ وَلَا يَكْفِىْ مِنْهُ شَيْئٌ يَا اَللّٰهُ يَا رَبَّ مُحَمَّدٍ اِقْضِ عَنِّى الدَّيْنَ

রসূলুল্লাহর (সাঃ) কুনিয়ত রাখা

আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (আঃ) বলেন ঃ আমার কুনিয়ত (আবযুক্ত নাম) ও নাম একত্রিত করো না। কারণ, আমি আবূল কাসেম, আর আল্লাহ হলেন দাতা। আল্লাহ দান করেন, আর আমি বন্টন করি। আহমদ (রহঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে— আমার নাম ও আমার কুনিয়ত একত্রিত করো না।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, রসূলে করীম (আঃ) বাকী গোরস্তানে ছিলেন। কেউ ডাক দিল, ইয়া আবাল কাসেম! হুযূর (সাঃ) ঘুরে পেছনে তাকালেন। লোকটি বলল ঃ আমি আপনাকে ডাকিনি। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখ; কিন্তু আমার কুনিয়ত রেখো না।

জাবের (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, জনৈক আনসারীর গৃহে পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে তার নাম রাখল মোহাম্মদ। এতে অন্যান্য আনসারীগণ ক্রুদ্ধ

হলেন এবং বললেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এ বিষয়ে নালিশ করব। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমার নামে নাম রাখ, আমার কুনিয়ত রেখো না। কেননা, আমি বন্টনকারী। তোমাদের মধ্যে বন্টন করি।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন ঃ আবুল কাসেম কুনিয়ত রাখা সমীচীন নয়–নাম মোহাম্মদ হোক বা না হোক। ইমাম রাফেঈ (রহঃ) বলেন ঃ আলেমগণ কুনিয়ত ও নাম উভয়টি একত্রিত করে রাখতে মানা করেছেন। কেবল নাম কিংবা কেবল কুনিয়ত রাখার মধ্যে কোন দোষ নেই।

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) জীবদ্দশা পর্যন্ত কুনিয়ত রাখা নিষিদ্ধ ছিল। তাঁর ওফাতের পর কুনিয়ত রাখা জায়েয। এর কারণ এই যে, এখন কেউ কাউকে আবুল কাসেম বলে ডাক দিলে রসূলুল্লাহর (সাঃ) সেদিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকানোর সম্ভাবনা নেই, যা তাঁকে কষ্ট দেয়ারই নামান্তর ছিল। শায়খ সিরাজুদ্দীন (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ অন্য আলেমগণ বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) নামে নাম রাখাও জায়েয নয়।

শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন ঃ ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) যে সকল যুবকের নাম মোহাম্মদ রাখা হয়েছিল, তাদের সকলকে একত্রিত করলেন, যাতে তাদের নাম পরিবর্তিত করে দেন। কিন্তু যুবকদের পিতারা এসে সাক্ষ্য দিল যে, নবী করীম (সাঃ) খোদ এ সকল যুবকের নাম নিজের নামে রেখেছেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। আবূ বকর বলেন ঃ এই যুবকদের মধ্যে আমার পিতাও ছিলেন।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) নামে নাম রাখা

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন– তোমরা তোমাদের শিশুদের নাম মোহাম্মদ রাখ, আর তাদেরকে গালমন্দ কর। (এটা ঠিক নয়)

আবূ রাফে' (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে–যে ব্যক্তির তিনটি পুত্র হয় এবং সে তাদের একজনের নামও "মোহাম্মদ" রাখে না, সে মূর্খই থেকে যায়।

আবু রাফে' বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি–তোমরা যখন কারও নাম মোহাম্মদ রাখ, তখন তাকে প্রহার করো না এবং বঞ্চিত রেখো না।

ইবনে আবী আসেমের রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে–যে ব্যক্তি আমার নামে নাম রাখবে, সে যেন এমন বরকতের আশা রাখে, যা সে অব্যাহত ভাবে পেতে থাকবে এবং কখনও নিঃশেষ হবে না।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) কন্যা ও পত্নীগণের ফযীলত

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ

অর্থাৎ, হে নবী পত্নীগণ! তোমরা সাধারণ মহিলাদের মত নও।

আরও এরশাদ হয়েছে- يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّأْتِ مِنْكُنَّ

হে নবী পত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে যে করবে---।

হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ রমণীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা হলেন হযরত মরিয়ম (আঃ) ও ফাতেমাতুয যাহরা।

হযরত ওরওয়া (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে ঃ হযরত মরিয়ম (আঃ) তাঁর যুগের মহিলাগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ফাতেমা এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ ফাতেমা জান্নাতী রমণীগণের সরদার।

হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে-রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ হে ফাতেমা ঃ তোমার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হন এবং তোমার খুশীতে আল্লাহ্ খুশী হন।

ইবনে হাজর বলেন ঃ নবী কন্যাগণ নবীপত্নীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ— এর দলীল একটি হাদীস, যা ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ হাফসা ওছমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বিয়ে করেছে এবং ওছমান হাফসার চেয়ে উত্তম মহিলার পাণি গ্রহণ করেছে।

আবূ উমামা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন-চার দল লোক পুনরায় পুরস্কৃত হবে। তাদের একদল হচ্ছে নবীপত্নীগণ।

আলেমগণ বলেন ঃ উভয় পুরস্কার আখেরাতে দেয়া হবে। কেউ বলেন ঃ এক পুরস্কার দুনিয়াতে এবং এক পুরস্কার আখেরাতে দেয়া হবে। আলেম গণ আযাব দ্বিগুণ হওয়ার ব্যাপারেও মতভেদ করেছেন। কেউ বলেন ঃ এক আযাব দুনিয়াতে এবং এক আযাব আখেরাতে হবে। নবীপত্নীগণ ছাড়া যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শাস্তি পেয়ে যাবে, তার আখেরাতে শাস্তি হবে না। কেননা, "হুদূদ" (শাস্তি) গোনাহের কাফফারা হয়ে থাকে।

সাঈদ ইবনে জুবায়র (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নবীপত্নীগণের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করবে, দুনিয়াতে তার দ্বিগুণ শাস্তি হবে। হদস্বরূপ

তাকে ১৬০টি দুররা মারা হবে। শিফা গ্রন্থে আছে, অপবাদের এই শাস্তি হযরত আয়েশা (রাঃ) ছাড়া অন্য বিবিগণের বেলায়। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অপবাদকারীকে হত্যা করা হবে।

সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার সাহাবীগণকে নবী-রসূলগণ ছাড়া সকল মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তাদের মধ্যে আবূ বকর, ওমর, ওছমান ও আলীকে মনোনীত করেছেন ও সকলের সেরা করেছেন। আমার সাহাবী সকলেই উত্তম এবং আমার উম্মত মনোনীত উম্মত।

অধিকাংশ আলেম বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের প্রত্যেকেই পরবর্তী লোকদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যদিও পরবর্তীদের কেউ কেউ জ্ঞান ও কর্মে অসাধারণ উন্নতি করে।

রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর উভয় শহর মক্কা ও মদীনা অবশিষ্ট সকল শহরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। দাজ্জাল ও প্লেগ এসব শহরে প্রবেশ করবে না।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) মসজিদের ফযীলত সকল মসজিদের উপর প্রমাণিত এবং তাঁর কবর মোবারকের স্থান কা'বা ও আরশ অপেক্ষা উত্তম।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমার মসজিদে নামায অন্য কোথাও নামায অপেক্ষা এক হাজার গুণ বেশী উত্তম–মসজিদে হারাম ছাড়া। মসজিদে হারামে নামায আমার মসজিদে নামায অপেক্ষা একশ' গুণ বেশী উত্তম।

আবদুল্লাহ ইবনে আদী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে ঃ মক্কা, তুই সকল শহরের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম শহর। তোর ভূখণ্ড আল্লাহ তা'আলার প্রিয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ মক্কা ও মদীনা উভয় শহরকে ফেরেশতারা ঢেকে রেখেছে এবং এগুলোর প্রতিটি সড়কে ফেরেশতা নিয়োজিত আছে। সেমতে এই শহরদ্বয়ে প্লেগ ও দাজ্জাল প্রবেশ করবে না।

আলেমগণ বলেন ঃ মদীনা ও মক্কার শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে মতভেদ আছে। কবর মোবারক সর্বসম্মতিক্রমে উৎকৃষ্টতম স্থান; বরং মক্কা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইবনে ওকায়ল হাম্বলী বর্ণনা করেন—রসূলুল্লাহর (সাঃ) কবর শরীফ আরশ অপেক্ষাও উত্তম।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে— প্রত্যেক নামাযে উযূ করা আমার উম্মতের উপর ফরয করা হয়েছে, যেমন পয়গম্বরগণের উপর ফরয করা হয়েছিল। বর্ণিত আছে—রসূলে করীম (সাঃ) উযূর পানি চাইলেন, অতঃপর উযূর প্রত্যেক অঙ্গ

একবার করে ধৌত করে বললেন ঃ এই উযূ ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলা নামায কবুল করেন না। অতঃপর তিনি প্রত্যেক অঙ্গ দুবার করে ধৌত করলেন এবং বললেন ঃ এটা অতীত উম্মতসমূহের উযূ। অবশেষে তিনি প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধৌত করলেন এবং বললেন ঃ এটা আমার এবং অতীত পয়গম্বরগণের উযূ। এই হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে উযূ ছিল; কিন্তু প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধৌত করা উম্মতে মোহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ যখন আদম (আঃ)–এর তওবা কবুল হয়, তখন ছিল সকাল বেলা। আদম (আঃ) তখন দু'রাকআত নামায পড়লেন। এতে যোহরের নামায হয়ে গেল। ওযায়র (আঃ)–কে ওফাতের পর আকাশে উত্থিত করা হয় এবং জিজ্ঞেস করা হয় ঃ كَمْ لَبِثْتَ পৃথিবীতে কত দিন রইলে? তিনি বললেন ঃ একদিন। অতঃপর সূর্যের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ বরং দিনের কিছু অংশ। অতঃপর ওযায়র (আঃ) চার রাকআত নামায পড়লেন। এতে আসরের নামায হয়ে গেল। দাউদ (আঃ)-এর মাগফেরাত মাগরিবের সময় করা হয়। তিনি চার রাকআত পড়তে শুরু করলেন। কিন্তু ক্লান্তির কারণে তৃতীয় রাকআতেই বসে গেলেন। এ কারণে মাগরিবের নামায তিন রাকআত হয়ে গেল। সর্বপ্রথম নামাযটি আমাদের নবী করীম (সাঃ) পড়েন।

হযরত আবূ মূসা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) একরাতে এশার নামাযে বিলম্ব করলেন। অবশেষে অর্ধরাত হয়ে গেল। এরপর তিনি গৃহ থেকে বের হলেন। নামায আদায় করার পর তিনি বললেন ঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত এই যে, এ সময়ে তোমাদের ছাড়া পৃথিবীর কেউ নামায পড়েনি।

হযরত মুয়ায ইবনে জাবল (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একরাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এশার নামাযে বিলম্ব করেন। অবশেষে মনে হল যেন তিনি নামায পড়ে ফেলেছেন। এরপর তিনি বাইরে এলেন এবং বললেন ঃ তোমরা এনামাযটি বিলম্বে পড়। কারণ, এ নামাযের কারণে তোমাদেরকে সকল উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। তোমাদের পূর্বে এই নামায কোন উম্মত পড়েনি।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের পূর্ববর্তী কোন উম্মতকে জুমআ দিয়ে গৌরবান্বিত করেননি। সেমতে ইহুদীদের জন্যে শনিবার এবং খৃষ্টানদের জন্যে রবিবার নির্ধারিত হয়। কিন্তু আমরা যখন দুনিয়াতে এলাম, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে (অগ্রবর্তী দিন) জুমআর নামাযের নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ্

তা'আলাই জুমআ, শনিবার এবং রবিবার সৃষ্টি করেছেন। এমনিভাবে এ সকল উম্মত কিয়ামতের দিন আমাদের অনুগামী হবে। আমরা দুনিয়াতে সর্বশেষ; কিন্তু কিয়ামতে সকল সৃষ্টির অগ্রে থাকব।

রবী' ইবনে আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ সাহাবায়ে কেরাম বনী ইসরাঈলের আলেমদের কাছে যে সব কথা শুনেছিলেন, তন্মধ্যে এগুলোও ছিল— ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (আঃ)-কে পাঁচটি কলেমা দান করা হয়েছিল। কেউ মৃত্যুর সময় এসব কলেমা অনুযায়ী আমল করলে তার জন্যে ওয়াদা ছিল কিয়ামতের দিন তার কোন হিসাব হবে না। কলেমাগুলো এই ঃ (১) আল্লাহর এবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, (২) নামায পড়, (৩) সদকা দাও, (৪) রোযা রাখ, এবং (৫) আল্লাহর যিকর কর। আল্লাহ্ তা'আলা মোহাম্মদ (সাঃ)-কে এই পাঁচটি দান করেছেন এবং এর সাথে আরও পাঁচটি দিয়েছেন–এক. জুমুআ, দুই. ক্ষমা, তিন. আনুগত্য, চার. হিজরত এবং পাঁচ. জেহাদ।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন—ইহুদী ও খৃস্টানরা জুমআর মত অন্য কোন কারণে আমাদের প্রতি হিংসা রাখে না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে জুমআ দিয়ে গৌরবান্বিত করেছেন। তারা বঞ্চিত রয়ে গেছে। আমরা ইমামের পেছনে "আমীন" বলি। একারণেও তারা ঈর্ষা করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ ইহুদীরা সালাম ও আমীনের কারণে তোমাদের প্রতি যে হিংসা করেছে, অন্য কিছুর কারণে তা করেনি।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমাকে তিনটি বিষয় দান করা হয়েছে–এক. সারিবদ্ধ আকারে নামায, দুই. সালাম ও তিন. "আমীন"। তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতকে আমীন দেয়া হয়নি। তবে হারূন (আঃ)-কে দেয়া হয়েছিল। কেননা, মূসা (আঃ) দোয়া করতেন এবং হারুন (আঃ) আমীন বলতেন।

আবু ওমায়র ইবনে আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে সকলকে সমবেত করার জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইলেন। কেউ পরামর্শ দিল নামাযের সময় একটি পতাকা উত্তোলন করা হোক। হুযুর (সাঃ) এটা পছন্দ করলেন না। কেউ বলল ঃ শঙ্খ বাজানো হোক। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এটা ইহুদীদের পদ্ধতি। কেউ ঘণ্টা বাজানোর কথা বলল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এটা খৃস্টানদের তরীকা। অবশেষে আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রাঃ) এলেন। তাকে স্বপ্নযোগে আযানের নিয়ম শিখানো হয়েছিল। এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, আযান ও একামত রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য।

وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ (তোমরা রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর)—

এ আয়াতের তাফসীরে তাফসীরকারকগণ বলেন ঃ রুকূ এ উম্মতের বিশেষত্ব। বনী ইসরাঈলের নামাযে রুকু নেই। তাই বনী ইসরাঈলকে এই উম্মতের রুকূকারীদের সাথে রুকূ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) বলেন ঃ রুকূ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসও দলীল হতে পারে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আসরের নামাযেই আমরা সর্বপ্রথম রুকূ করি। আমি প্রশ্ন করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এটা কি? তিনি বললেন ঃ আমাকে এই আদেশ করা হয়েছে। এর আগে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যোহরের নামায পড়েছেন এবং তাহাজ্জুদ পড়েছেন; কিন্তু এসব নামাযে রুকূ ছিল না। এতেও প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী উম্মতের নামাযে রুকূ ছিল না।

ইবনে ফেরেশতা বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের নামায পড়বে এবং আমাদের কেবলার দিকে মুখ করবে, সে আমাদের দলভুক্ত। এ হাদীসের অর্থ হচ্ছে জামাতের নামায। কেননা, একাকী নামায অতীত উম্মতের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল—জামাতে নামায ছিল না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমার উম্মতকে এমন বস্তু দেয়া হয়েছে, যা অতীত কোন উম্মতকে দেয়া হয়নি। তা হল বিপদ-মুহূর্তে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" বলা।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে—এ উম্মত ছাড়া কাউকে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" দেয়া হয়নি। হযরত ইয়াকুব (আঃ) يَا أَسَفَا عَلٰى يُوْسُفَ (হায়, ইউসুফের জন্যে আফসোস!) বলেছিলেন।

মুয়াম্মার (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ এ উম্মত ছাড়া কাউকে "তাকবীর" (আল্লাহু আকবার বলা) দেয়া হয়নি।

এ উম্মতের গুনাহ মার্জনা

রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর উম্মতের গোনাহ্ "এস্তেগফার" (ক্ষমা প্রার্থনা) দ্বারা মাফ করা হবে। তাদের গোনাহের তওবা হচ্ছে নাদামত তথা অনুতাপ। তারা দান-খয়রাত খাবে এবং এজন্যে ছওয়াব পাবে। দুনিয়া ও আখেরাতে তারা ছওয়াব পাবে এবং তাদের দোয়া কবুল হবে।

হযরত কা'ব (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ এ উম্মতকে তিনটি স্বভাব দান করা হয়েছে, যা পয়গম্বরগণকে দেয়া হয়েছিল। সেমতে নবী করীম (সাঃ)-কে বলা হয়েছে ঃ

بلغ ولاحرج وانت شهيد على قولك وادع اجبك .

অর্থাৎ, নির্বিঘ্নে প্রচার করুন, আপনি আপনার কথার জন্যে সাক্ষী এবং দোয়া করুন, আমি কবুল করব।

এ উম্মতকে বলা হয়েছে ঃ

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ . لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ . اُدْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ .

অর্থাৎ, ধর্মের কাজে তোমাদের কোন অসুবিধা রাখেননি। যাতে তোমরা সকল মানুষের জন্যে সাক্ষী হও। তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব।

ইমাম নববী (রহঃ) "শরহে মুহাযযাবে" বলেন ঃ লায়লাতুল কদর এ উম্মতেরই বৈশিষ্ট্য। পূর্ববর্তী কোন উম্মতকে লায়লাতুল কদর দেয়া হয়নি। ইমাম মালেক 'মুয়াত্তায়' বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের বয়ঃক্রম দেখানো হয় এবং তাঁর উম্মতের বয়ঃক্রম দেখানো হয়। অতীত উম্মতসমূহের আমল সুদীর্ঘ বয়ঃক্রমের কারণে বেশী হয়ে গেলে এ উম্মতকে লায়লাতুল কদর দেয়া হল, যা হাজার মাসের চাইতেও উত্তম।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ....الخ এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইবনে জারীর আতা থেকে বর্ণনা করেন ঃ প্রথমে প্রতি মাসে তিন দিন রোযা ফরয ছিল। এরপর রমযানের রোযা ফরয করা হয়।

ইবনে জারীর সুদ্দী থেকে উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ খৃষ্টানদের উপর রমযানের রোযা ফরয করা হয়। তাদের জন্যে অপরিহার্য ছিল নিদ্রার পর পানাহার না করা এবং এ মাসে স্ত্রী-সহবাস না করা। ফলে রোযা তাদের জন্যে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে গেল। তারা গ্রীষ্ম ও শীতের মাঝামাঝি রোযার একটি সময় ঠিক করে নিল। এর কাফ্ফারা স্বরূপ আরও বিশ দিন রোযা বাড়িয়ে নিল। মুসলমানদের জন্যেও এমনি ধরনের আদেশ ছিল। কিন্তু যখন আবূ কায়স ইবনে সরমা ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর ঘটনা ঘটে গেল, তখন আল্লাহ্ পাক মুসলমানদেরকে রমযানে ফজর পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সহবাসের অনুমতি দিয়ে দিলেন।

ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে ঈদুল আযহা পালনের আদেশ করেছেন। এ ঈদটি তিনি এই উম্মতের জন্যে সৃষ্টি করেছেন।

আবূ কাতাদাহ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-কে কেউ আশূরা দিবসের রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ এটা বিগত বছরের গোনাহসমূহের কাফ্ফারা। আবার কেউ আরাফা দিবসের রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ এটা বিগত এবং সামনের বছরের গোনাহসমূহের কাফ্ফারা।

আলেমগণ বলেন ঃ আরাফা দিবসের রোযা এমনিই। এজন্য এটা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সুন্নত। আশূরা দিবসের রোযা হযরত মূসা (আঃ)-এর সুন্নত। সুতরাং আমাদের নবীর সুন্নতের ছওয়াব বাড়ানো হয়েছে।

সালমান (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি প্রশ্ন করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি তাওরাতে পড়েছি যে, খাদ্যের বরকত সেই হাত ধোয়া, যা খাওয়ার আগে ধোয়া হয়। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ খাদ্যের বরকত সেই হাত ধোয়া, যা খাওয়ার আগে ও খাওয়ার পরে ধোয়া হয়।

অতীত উম্মতসমূহের মধ্যে নামাযে কথা বলার অনুমতি ছিল এবং রোযায় কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু উম্মতে মোহাম্মদীর অবস্থা এর বিপরীত।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরযী রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) যখন মদীনায় আসেন, তখন মুসলমানরা আহলে কিতাবের অনুরূপ নামাযে কথাবার্তা বলত। অবশেষে এই আয়াত নাযিল হল ঃ

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ ـ

অর্থাৎ, তোমরা (নামাযে) আল্লাহর জন্যে বিনয়ী হও।

ইবনুল আরাবী তিরমিযীর টীকায় বলেন ঃ অতীত উম্মতসমূহের রোযায় কথাবার্তা এবং পানাহার থেকে বিরত থাকা ছিল। ফলে, তারা খুব অসুবিধার মধ্যে ছিল।

উম্মতে মোহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ـ

অর্থাৎ, ধর্মের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের উপর কোন অসুবিধা রাখেননি।

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের সাথে সহজ আচরণ করতে চান— কঠোর আচরণ করতে চান না।

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا .

অর্থাৎ, পরওয়ারদেগার আমাদেরকে পাকড়াও করো না যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি। হে প্রভু! আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না, যেমন তুমি চাপিয়েছ আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর।

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ .

অর্থাৎ, তিনি তাদের উপর থেকে বোঝা নামিয়ে দেন এবং সেইসব বেড়ী, যা তাদের উপর ছিল।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ .

অর্থাৎ, আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে প্রশ্ন করে, তখন (আপনি বলে দিন) আমি নিকটেই আছি। দোয়াকারী যখন আমার কাছে দোয়া করে, তখন আমি তার দোয়ায় সাড়া দেই।

ইবনে সীরীন বর্ণনা করেন ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন ঃ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ .

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের উপর ধর্মের ব্যাপারে কোন কঠোরতা রাখেননি।

কিন্তু যিনা ও চুরির শাস্তির মধ্যে কঠোরতা নয় কি? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ অবশ্যই কঠোরতা আছে; কিন্তু গোনাহের সেই বোঝা নেই, যা বনী ইসরাঈলের উপর ছিল।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব রেওয়ায়েত করেন ঃ প্রত্যেক নবী ও রসূলের উপর এ আয়াত নাযিল হয়েছে—

إِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ .

অর্থাৎ, তোমাদের মনের মধ্যে যে কথা আনাগোনা করে, তা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তজ্জন্যে পাকড়াও করবেন।

কোন নবীর উপর এই আয়াত নাযিল হলে উম্মতরা নবীর কাছে এসে আপত্তি উত্থাপন করে বলত ঃ যে কাজ আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত হয় না, তা কেবল মনের কল্পনায় আনাগোনা করলেই পাকড়াও করা হবে– এ কেমন কথা! ফলে, তারা কাফের ও গোমরাহ হয়ে যেত। কিন্তু এ আয়াত যখন আমাদের নবী করীম (সাঃ)-এর উপর নাযিল হল, তখন মুসলমানরাও সংকীর্ণতা অনুভব করল। তারা রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে হাযির হয়ে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! যে সব কথা আমাদের মনের মধ্যে আসে; কিন্তু আমরা তা বাস্তবায়ন করি না, সেগুলোর জন্যেও পাকড়াও করা হবে কি?

হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ অবশ্যই হবে। তবে তোমরা শুন এবং আনুগত্য কর।

এরপর اٰمَنَ الرَّسُوْلُ...الخ আয়াতখানি শেষ পর্যন্ত নাযিল হল। এতে আল্লাহ তা'আলা মনের মধ্যে আনাগোনাকারী বিষয়সমূহ মাফ করে দিলেন। ফলে, ভাল কাজ সম্পাদন করলে উপকার হবে এবং মন্দকাজ করলে ক্ষতি হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের ভুলক্রমে কাজ, ভুলে যাওয়া এবং জোর-জবরে কৃত গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন।

একবার হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সামনে বনী ইসরাঈল ও তাদের ফযীলতের আলোচনা উঠলো। তিনি বললেন ঃ বনী ইসরাঈলের কোন ব্যক্তি যখন কোন গোনাহ্ করত, তখন প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে সে আপন দরজায় তার কাফ্ফারা লিখিত দেখতে পেত। আর তোমাদের গোনাহের কাফ্ফারা হচ্ছে একটি কথা, যা তোমরা বলে থাক। তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি ক্ষমা করে দেন। সেই আল্লাহর কসম, যার কবযায় আমার প্রাণ—আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে একটি আয়াত দান করেছেন, যা আমার কাছে পৃথিবী ও পৃথিবীস্থিত সবকিছুর চেয়ে উত্তম। আয়াতটি এই–

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً....الخ

অর্থাৎ, হযরত আবুল আলিয়া বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমাদের কাফফারা বনী ইসরাঈলের কাফ্ফারার অনুরূপ হলে ভাল হত। নবী (সাঃ) বললেন ঃ তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তাতেই তোমাদের কল্যাণ রয়েছে। বনী ইসরাঈলের কেউ কোন গোনাহ্ করলে সেই গোনাহ্ ও তার কায্ফার দরজায় লিখিত দেখতে পেত। যদি সে কাফ্ফারা আদায় করত, তবে লোকলজ্জার গ্লানি ভোগ করতে হত। পক্ষান্তরে কাফ্ফারা না দিলে আখেরাতে অপমানের সম্মুখীন হত। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তদপেক্ষা উত্তম বিষয় দান করেছেন ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ....الخ

অর্থাৎ, বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা গো-বৎস পূজা করেছিল, তাদের সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা হযরত মূসা (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ আমাদের এই গোনাহের তওবা কি? মূসা (আঃ) বললেন ঃ তোমরা একে অপরকে হত্যা কর। এটাই তোমাদের তওবা। তারা ছুরি হাতে নিল এবং প্রত্যেকেই আপন পিতা, ভাই ও মাতাকে হত্যা করতে লাগল।

আবূ মূসা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ বনী ইসরাঈলের কোন ব্যক্তির শরীরে পেশাব লেগে গেলে সে সেই স্থানটি কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলত।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ এক ইহুদী মহিলা আমার কাছে এল। সে বলল ঃ পেশাবের কারণে কবরের আযাব হয়। আমি বললাম ঃ তোমার কথা ঠিক নয়। সে বলল ঃ অবশ্যই আযাব হয়। পেশাব লেগে যাওয়ার পর ত্বক কেটে ফেলতে হয়। নবী (সাঃ) বললেন ঃ তুমি ঠিকই বলছ। (তোমাদের বিধান তাই।)

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ ইহুদীদের মধ্যে কোন মহিলার ঋতুস্রাব হলে তাকে গৃহে আহার করতে দিত না এবং তার সাথে সহবাসও করত না। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এসম্পর্কে وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ (তারা আপনাকে ঋতুবতী নারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।) আয়াত নাযিল করেছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ হায়েয অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস ছাড়া সবকিছু কর। ইহুদীরা একথা শুনে মন্তব্য করল ঃ লোকটি সকল ব্যাপারেই আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে। তাফসীর গ্রন্থসমূহে আছে— খৃষ্টানরা ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করত এবং ইহুদীরা তাদের থেকে অনেক দূরে সরে থাকত। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্যে উভয় বিষয়ের মধ্যবর্তী পন্থা নির্ধারণ করেছেন।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) উছমান ইবনে মাযউনকে বললেন ঃ আমাদের উপর বৈরাগ্য ফরয করা হয়নি। আমার উম্মতের বৈরাগ্য মসজিদে নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকা, হজ্জ করা এবং ওমরা করা।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক নবীর বৈরাগ্য আল্লাহর পথে জেহাদ করা।

আবূ উমামা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ব্যক্তি আরয করল, ইয়া

রসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে পর্যটনের অনুমতি দিন। তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের পর্যটন হচ্ছে আল্লাহর পথে জেহাদ করা।

আম্মার ইবনে গযিয়্যা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) সামনে পর্যটন সম্পর্কে আলোচনা শুরু হলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্যে পর্যটনকে ফী সাবীলিল্লাহ জেহাদ এবং সেই তাকবীরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন, যা প্রত্যেক উচ্চভূমিতে বলা হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে "কিসাস" নিহতদের মধ্যে ছিল; অর্থাৎ খুনের বদলে খুন করা হত। তাদের মধ্যে "দিয়ত" তথা মুক্তিপণ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে বলেছেন–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ أَخِيْهِ شَىْءٌ

অর্থাৎ, (তোমাদের উপর নিহতদের ব্যাপারে কিসাস ফরয করা হল। অতঃপর যাকে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে মাফ করে দেয়া হয়---- ।)

"মাফ" হচ্ছে ইচ্ছাকৃত হত্যায় মুক্তিপণ নিতে সম্মত হওয়া। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ উম্মতের জন্যে "তাখফীফ" অর্থাৎ সহজীকরণ। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ.

অর্থাৎ, এটা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সহজীকরণ তথা কৃপা প্রদর্শন।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ রেওয়ায়েত করেন ঃ যখন আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-কে কথা বলার জন্যে নিকটে ডাকলেন, তখন মূসা (আঃ) আরয করলেন ঃ পরওয়ারদেগার! আমি তাওরাতে এক উম্মতের উল্লেখ দেখেছি, যারা শ্রেষ্ঠ উম্মত। তাদের আবির্ভাব মানুষের জন্যে রহমতস্বরূপ হবে। তারা ভাল কাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজে বাধা দিবে। আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে। আপনি তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন ঃ তারা তো উম্মতে মোহাম্মদী, অর্থাৎ মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত।

মূসা (আঃ) আবার আরয করলেন ঃ হে রব, আমি তাওরাতে এক উম্মতের কথা পাই, যাদের ইনজীল (ধর্মগ্রন্থ) তাদের বক্ষে সংরক্ষিত থাকবে। তারা সেই ইনজীল মুখস্থ পাঠ করবে। অথচ তাদের আগেকার উম্মতরা দেখে দেখে তাদের

ইনজীল পাঠ করত। আপনি তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ তারা আহমদের উম্মত।

মূসা (আঃ) পুনঃ আবেদন করলেন ঃ প্রভু হে, আমি তাওরাতে এক উম্মত দেখতে পাই, যারা সদকা তথা দান-খয়রাত খাবে। অথচ আগেকার লোকদের সদকা অগ্নি খেয়ে ফেলত। আর সদকা কবুল না হলে অগ্নি খেত না। আপনি তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ্ পাক বললেন ঃ তারা আহমদের উম্মত।

মূসা (আঃ) আবার নিবেদন করলেন ঃ পাক পরওয়ারদেগার! আমি তাওরাতে এক উম্মত পাই, যাদের মধ্যে কেউ মন্দকাজের কেবল ইচ্ছা করলে তার মন্দ কাজ আমলনামায় লেখা হবে না। আর সেই মন্দকাজটি সম্পাদন করলে মাত্র একটি মন্দকাজ লিখা হবে। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি সৎকাজের ইচ্ছা করে, তবে তার জন্যে একটি পুণ্য লেখা হবে। আর যদি সৎ কাজটি সম্পাদন করে, তবে দশ থেকে সাত শ' পর্যন্ত পুণ্য লেখা হবে। হে আল্লাহ্, আপনি তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ তারা আহমদের উম্মত।

হযরত দাঊদ (আঃ)-এর কাহিনীতে ওয়াহ্‌ব ইবনে মুনাব্বেহ উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ওহী পাঠালেন ঃ হে দাঊদ! তোমার পরে একজন নবী আসবে, যার নাম আহমদ ও মোহাম্মদ হবে। সে সত্যবাদী হবে। আমি কখনও তার প্রতি নাখোশ হব না এবং সে কখনও আমার অবাধ্যতা করবে না। আমি তার অগ্রপশ্চাৎ গোনাহ মাফ করে দিয়েছি। তার উম্মত রহমতপ্রাপ্ত। নফল এবাদতের জন্যে আমি তাদেরকে এমন পুরস্কার দিয়েছি, যা নবীগণকে দিয়েছি। আমি তাদের উপর নবীগণের দায়িত্ব অর্পণ করেছি। তারা কিয়ামতের দিন পয়গম্বরগণের অনুরূপ নূর নিয়ে উত্থিত হবে। কারণ, তারা প্রত্যেক নামাযের জন্যে পবিত্রতা অর্জন করবে। আমি তাদেরকে জানাবতের গোসল করার নির্দেশ দিয়েছি, যেমন পূর্ববর্তী নবীগণকে দিয়েছিলাম। তাদেরকে হজ্জ করার আদেশ দিয়েছি, যেমন পূর্ববর্তী নবীগণকে দিয়েছিলাম। এছাড়া আমি তাদেরকে জেহাদ করতে বলেছি, যেমন পূর্ববর্তী রসূলগণকে বলেছিলাম। হে দাঊদ! আমি মোহাম্মদকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। অনুরূপভাবে তার উম্মতকে সকল উম্মতের উপর ফযীলত দিয়েছি। আমি উম্মতে মোহাম্মদীকে এমন সব স্বভাব দান করেছি, যা অন্য কোন উম্মতকে দান করিনি। ভুল-ভ্রান্তি ও বিস্মৃতিজনিত অপরাধের জন্যে তাদেরকে পাকড়াও করব না। অনিচ্ছাকৃত গোনাহের জন্যেও ধরপাকড় করব না। তারা যখন আমার কাছে গোনাহের মাগফেরাত চাইবে, আমি ক্ষমা করে দেব। তারা যে আমল মনের খুশীতে আখেরাতের জন্যে করবে, আমি তার পুরস্কার দ্বিগুণ করে দেব এবং তাদের জন্যে আমার কাছে বহুগুণ পুরস্কার থাকবে। তারা

যখন বিপদাপদের সম্মুখীন হয়ে “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন” পড়বে, তখন আমি দুরূদ, রহমত ও হেদায়েত দান করব, যা জান্নাতের দিক-নির্দেশনা দিবে। তারা আমার কাছে দোয়া করবে। আমি কবুল করব। তারা এই দোয়া কবুলের সুফল হয় দুনিয়াতেই দেখতে পাবে, না হয় এর বরকতে তাদের দিকে অগ্রসরমান আপদ-বিপদ দূর হয়ে যাবে, না হয় এই দোয়া তাদের পরকালের জন্যে ভাণ্ডার হয়ে থাকবে।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) উম্মতের বৈশিষ্ট্য এ যে, এ উম্মত ক্ষুধা, সলিল সমাধি ও আযাব দ্বারা ধ্বংস হবে না। এ উম্মত পথভ্রষ্টতায় একমত হবে না। একারণেই এ উম্মতের ইজমা তথা ঐকমত্য শরীয়তের অন্যতম প্রমাণ এবং মতভেদ রহমত।

সা'দ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ আমি পরওয়ারদেগারের কাছে প্রার্থনা করেছি— আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত করে ধ্বংস করবেন না। আল্লাহ তা'আলা এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। আমি প্রার্থনা করেছি-আমার উম্মতকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করবেন না। এ দোয়াও তিনি কবুল করেছেন। আমি আরও দোয়া করেছি—আমার উম্মতের মধ্যে যেন পরস্পরে যুদ্ধ-বিগ্রহ না হয়। আমার এ দোয়াটি কবুল করা হয়নি।

ইসমাঈল ইবনে মুজাহিদ রেওয়ায়েত করেন ঃ খলীফা হারুনুর রশীদ মালেক ইবনে আনাসকে বললেন ঃ কিছু পুস্তক রচনা করে মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দিন। মালেক ইবনে আনাস বললেন ঃ আলেমগণের মতভেদ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এই উম্মতের উপর রহমত। প্রত্যেক আলেম তারই অনুসরণ করে, যা তার মতে সঠিক। প্রত্যেক আলেমই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ অতীত উম্মতসমূহের এক শ' ব্যক্তি কারও জন্যে কল্যাণের সাক্ষ্য দিলে তার জন্যে জান্নাত ওয়াজেব হয়ে যেত। আর আমার উম্মতের পঞ্চাশ ব্যক্তি কারও জন্যে কল্যাণের সাক্ষ্য দিলে তার জন্যে জান্নাত অপরিহার্য হয়ে যায়।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ যে মুসলমান সম্পর্কে চার ব্যক্তি ভাল হওয়ার সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ যদি তিন ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ সে-ও জান্নাতী। আমি প্রশ্ন করলাম ঃ যদি দু'ব্যক্তি দেয়? তিনি বললেন ঃ সেও জান্নাতী। এরপর আমি একজনের সম্পর্কে প্রশ্ন করিনি।

হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ এ উম্মতে ত্রিশজন আবদাল থাকবে। তাদের কেউ মারা গেলে অন্যজন তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। আবুয যিনাদ বলেন ঃ নবীগণ সমগ্র ভূপৃষ্ঠের আওতাদ ছিলেন। নবুওয়ত খতম হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাদের স্থলে

উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্য থেকে চল্লিশ জনকে খলীফা মনোনীত করেছেন। তাদেরকে আবদাল বলা হয়। তাদের কেউ মারা গেলে আল্লাহ্ তা'আলা তার স্থলে অন্যজন সৃষ্টি করেন।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) বৈশিষ্ট্য

কিয়ামত দিবসে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কবর মোবারক সর্বপ্রথম উন্মোচিত হবে। তিনি সত্তর হাজার ফেরেশতার মাঝখানে বোরাকে দেদীপ্যমান হয়ে হাশরের ময়দানে আগমন করবেন। হাশরের ময়দানে তাঁকে তাঁর নাম ধরে ডাকা হবে এবং জান্নাতের বস্ত্রজোড়া পরানো হবে। তিনি আরশের ডানদিকে দণ্ডায়মান হবেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামত দিবসে আমি সকল আদম সন্তানের সরদার হব। সর্বপ্রথম আমার উপর থেকেই মৃত্তিকা বিদীর্ণ হবে। আমি সর্ব প্রথম শাফায়াতকারী এবং সর্বপ্রথম আমার শাফায়াত কবুল করা হবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে বলেন ঃ সেদিন সকল মানুষ বেহুশ হয়ে যাবে এবং সর্বপ্রথম আমার হুশ পুনর্বহাল হবে।

কা'ব (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ প্রত্যহ ভোরে সত্তর হাজার ফেরেশতা কবর মোবারকে অবতরণ করে এবং তাকে ঢেকে নেয়। তারা রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করে এবং দুরূদ প্রেরণ করে। রাত হয়ে গেলে এই ফেরেশতারা আকাশে চলে যায় এবং অন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা অবতরণ করে। তারা ভোর পর্যন্ত অবস্থান করে। ফেরেশতাদের আগমন ও গমনের ধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। অবশেষে কিয়ামত দিবসে তিনি সত্তর হাজার ফেরেশতার মাঝখানে পুনরুত্থিত হবেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ নবীগণকে চতুষ্পদ জন্তুর উপর সওয়ার করিয়ে হাশরে আনা হবে। আর আমার হাশর হবে বোরাকের উপর। বেলালকে জান্নাতের একটি উষ্ট্রীর উপর হাশর করানো হবে। সে আযান ও শাহাদতের ধ্বনি দিবে। সে যখন " আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" বলবে, তখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মুমিন এই সাক্ষ্য দেবে। কারও শাহাদত কবুল হবে এবং কারও প্রত্যাখ্যাত হবে।

কাছির ইবনে মুররা হাযরামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ ছামূদ গোত্রের উষ্ট্রী সালেহ (আঃ)-এর জন্যে উত্থিত হবে। তিনি তাঁর কবরের কাছ থেকে তাতে সওয়ার হবেন। অতঃপর উষ্ট্রী তাঁকে হাশরে পৌঁছিয়ে দেবে। হযরত মুয়ায (রাঃ) প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আপনার উষ্ট্রী আযবায় সওয়ার হবেন কি? তিনি বললেন ঃ না; বরং আমার কন্যা তাতে সওয়ার হবে। আমি বোরাকে সওয়ার হব। সেদিন এই বোরাক হবে আমার বৈশিষ্ট্য।

বেলাল জান্নাতের এক উষ্ট্রীর উপর উত্থিত হবে এবং তাতে আযান দেবে, যা শুনে সকল পয়গম্বর ও তাদের উম্মতগণ বলবে—আমরাও এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেই।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আমাকে জান্নাতের মূল্যবান বস্ত্রজোড়া দেয়া হবে এবং আমি আরশের ডানদিকে দণ্ডায়মান হব, সেখানে দণ্ডায়মান হওয়ার সাধ্য অন্য কারও থাকবে না।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন— সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে পোশাক পরানো হবে। তিনি আরশের দিকে মুখ করে বসবেন। এরপর আমার পোশাক আনা হবে। আমি তা পরিধান করব। আমি আরশের ডানদিকে এমন জায়গায় দণ্ডায়মান হব, যেখানে আমি ছাড়া কেউ দন্ডায়মান হবে না। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই আমার এই মর্যাদা দেখে ঈর্ষান্বিত হবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমি কিয়ামতের দিন সমস্ত আদম সন্তানের সরদার হব। তোমরা এর কারণ জান কি? আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিকে ডাক দেবেন এবং একজন ঘোষক ঘোষণা করবে। সূর্য অত্যন্ত নিকটবর্তী হবে। মানুষ অসহনীয় দুঃখ-কষ্টে নিপতিত থাকবে। তখন কিছু লোক অন্যদেরকে বলবে ঃ তোমরা ঘোর বিপদ ও কষ্টের মধ্যে আছ। তোমরা এমন এক ব্যক্তির খোঁজ কর, যে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সুপারিশ করবে। সেমতে তারা হযরত আদম (আঃ)-এর কাছে এসে বলবে ঃ আপনি "আবুল বাশার" (মানব পিতা)। আল্লাহ্ আপনাকে স্বীয় কুদরতে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মধ্যে আপন আত্মা ফুঁকে দিয়েছেন। আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা আপনাকে সেজদা করেছে। অতএব, আপনি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্যে সুপারিশ করুন, যাতে আমাদের কষ্ট লাঘব হয়ে যায়। হযরত আদম (আঃ) বলবেন ঃ আমার পরওয়ারদেগার অদ্য যারপর নেই ক্রুদ্ধ আছেন। তিনি ইতিপূর্বে কখনও এত ক্রুদ্ধ হননি এবং ভবিষ্যতেও হবেন না। আমার রব আমাকে গন্দম খেতে মানা করেছিলেন। আমি অবাধ্যতা করেছি। এরপর হযরত আদম (আঃ) "নফসী' 'নফসী" উচ্চারণ করে বলবেন—আমাকে বাদ দিয়ে তোমরা অন্য কারও কাছে যাও। মানুষ হযরত নূহ (আঃ)-এর কাছে যাবে এবং বলবে ঃ আপনি মর্ত্যে প্রেরিত সর্বপ্রথম রসূল। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে "আবদে শাকূর" (কৃতজ্ঞ বান্দা) আখ্যা দিয়েছেন। আপনি পরওয়ারদেগারের কাছে সুপারিশ করুন। নূহ (আঃ) বলবেন ঃ আমার প্রভু আজ অভূতপূর্ব ক্রোধান্বিত আছেন। আমাকে একটি অব্যর্থ দোয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল, যা আমি আমার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে ফেলেছি। ফলে, তারা নিশ্চিহ্ন

হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি 'নফসী' 'নফসী' উচ্চারণ করে বলবেন ঃ তোমরা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে যাও। সেমতে মানুষ তাঁর কাছে যাবে এবং আরয করবে ঃ আপনি পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার খলীল। আপনি আমাদের জন্যে সুপারিশ করুন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলবেন ঃ আমার প্রভু অদ্য অপরিসীম ক্রুদ্ধ ও রাগান্বিত আছেন। ইতিপূর্বে কখনও এমন রাগান্বিত হননি। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) তাঁর কতক মিথ্যাচার উল্লেখ করবেন এবং 'নফসী' 'নফসী' বলবেন। অবশেষে বলবেন ঃ তোমরা মূসা (আঃ)-এর কাছে যাও। সেমতে সকলেই মূসা (আঃ)-এর কাছে যেয়ে আরয করবে ঃ হে মূসা! আপনি আল্লাহর রসূল। আপনি তাঁর সাথে বাক্যালাপ করেছেন। আপনি আমাদের জন্যে সুপারিশ করুন। হযরত মূসা (আঃ) বলবেন ঃ আমার প্রভু আজ ভয়ানক ক্রুদ্ধ। ইতিপূর্বে কখনও এরূপ ক্রুদ্ধ হননি। আমি তাঁর আদেশ ছাড়াই এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলাম। এরপর তিনিও 'নফসী' 'নফসী' উচ্চারণ করে বলবেন ঃ তোমরা ঈসা (আঃ)-এর কাছে যাও। লোকজন তাঁর কাছে পৌঁছে বলবে ঃ হে ঈসা! আপনি আল্লাহর রসূল এবং তাঁর কলেমা, যা মরিয়ম (আঃ)-এর প্রতি নিক্ষেপ করা হয়। আপনি রসূলুল্লাহ। আপনি দোলনায় কথা বলেছেন। আপনি আমাদের জন্যে সুপারিশ করুন। হযরত ঈসা (আঃ) বলবেন ঃ আমার প্রভু আজ অত্যন্ত গোসসার মধ্যে আছেন। তিনি ইতিপূর্বে কখনও এমন গোসসা করেননি। ঈসা (আঃ) নিজের কোন গোনাহ উল্লেখ না করেই বলবেন ঃ তোমরা মোহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে যাও। লোকজন তাঁর কাছে আসবে এবং আরয করবে ঃ হে মোহাম্মদ, আপনি আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ তা'আলা আপনার অগ্র-পশ্চাৎ সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্যে সুপারিশ করুন। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমি জনগণের মুসীবত দেখে গমনোদ্যত হয়ে আরশের নীচে আসব এবং পরওয়ারদেগারের উদ্দেশ্যে সেজদা করব। আল্লাহ তা'আলা আমার সামনে তাঁর সমস্ত প্রশংসা উন্মুক্ত করে দেবেন। আমাকে বলা হবে-হে মোহাম্মদ! মাথা তুলুন, সওয়াল করুন। পূর্ণ করা হবে। শাফায়াত করুন,কবুল করা হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলবেন ঃ ইয়া রব, উম্মতী উম্মতী, ইয়া রব, উম্মতী, উম্মতী। উত্তরে বলা হবে-হে মোহাম্মদ! আপনার উম্মতের মধ্যে যাদের কোন হিসাব নেই, তাদেরকে জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে দাখিল করে দিন। আপনার উম্মত এই দরজা ছাড়াও অন্য দরজা দিয়ে অন্য লোকদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ সেই সত্তার কসম, যার কবযায় আমার প্রাণ, জান্নাতের দরজার দু'কপাটের মাঝখানের দূরত্ব মক্কা ও হিজরের মধ্যবর্তী অথবা মক্কা ও বসরার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

আবদুল মুত্তালিব ইবনে রবীআ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ সদকা মানুষের ময়লা। এটা মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ পরিবারের জন্যে হালাল নয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ হুযূর (সাঃ) হাদিয়া তথা উপহার কবুল করতেন—সদ্‌কা কবুল করতেন না।

হাসান (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার উপর এবং আমার পরিবারের উপর সদকা হারাম করে দিয়েছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে কারও কাছ থেকে আহার্য এলে তিনি সেটা হাদিয়া, না সদকা, তা জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতেন। হাদিয়া হলে খেতেন, সদকা হলে খেতেন না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) আরকাম যুহরীকে সদকা ও যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করলেন। তিনি রসূলুল্লাহ (আঃ)-এর মুক্ত করা ক্রীতদাস আবূ রাফেকে নিজের সঙ্গে রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আবূ রাফে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এলেন। তিনি বললেন ঃ আবূ রাফে, সদকা মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ পরিবারের জন্যে হারাম।

জাবের ইবনে সামুরাহ্ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ হুযূর (সাঃ) আবূ আইউব (রাঃ)-এর গৃহে অবস্থান করেন। আহারের পর তিনি অবশিষ্ট খাদ্য আবূ আইউবের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আবূ আইউব (রাঃ) সেই খাদ্যে হুযূর (সাঃ)-এর হাতের চিহ্ন দেখতেন যে, তিনি কোন্ জায়গা থেকে খেয়েছেন। একদিন আবূ আইউব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আজ খাদ্যের মধ্যে আপনার অঙ্গুলির চিহ্ন নেই। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এই খাদ্যের মধ্যে রসুন ছিল। তাই আমি খাইনি। আবূ আইউব প্রশ্ন করলেন ঃ রসুন কি হারাম? তিনি বললেন ঃ না, হারাম নয়। কিন্তু তুমি আমার মত নও। আমার কাছে ফেরেশতা আসে।

জাবের (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে পাকানো শাক-সবজীর একটি পাতিল আনা হল। তিনি তাতে গন্ধ অনুভব করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কিসের শাক? শাকের নাম বলা হলে তিনি বললেন ঃ এটি অমুক সাহাবীর কাছে নিয়ে যাও।

আবদুল মুত্তালিব ইবনে রবীআ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি এবং ফযল্ল ইবনে আব্বাস রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে বললাম ঃ আপনি আমাদেরকে যাকাত ও সদকার কর্মকর্তা নিয়োগ করুন। এই আবেদন নিয়েই আমরা

এসেছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একথা শুনে চুপ হয়ে গেলেন এবং ছাদের দিকে মাথা তুলে তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে আমরা কথা বলতে চাইলে হযরত যয়নব (রাঃ) পর্দার পেছন থেকে ইশারায় আমাদেরকে কথা বলতে মানা করলেন। এরপর হুযূর (সাঃ) নিজেই আমাদের প্রতি মনোযোগ দিলেন এবং বললেন ঃ সদকা মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ পরিবারের জন্যে হালাল নয়। কেননা, সদকা মানুষের ময়লা।

আলেমগণ বলেন ঃ সদকা মানুষের ময়লা। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর বংশধরকে সদকা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। এছাড়া সদকা করুণাবশত দান করা হয়। এতে গ্রহীতার হীনতা ফুটে উঠে। তাই এর পরিবর্তে তাদের জন্যে গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে, যা সম্মানহানি ছাড়াই গ্রহণ করা হয়।

সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না বলেন ঃ সদকা নিষিদ্ধ হওয়া পয়গম্বরগণের মধ্যে কেবল রসূলুল্লাহর (সাঃ) বৈশিষ্ট্য। তাঁর জন্যে যাকাত ও নফল সদকা উভয়ই নিষিদ্ধ করা হয়েছে; কিন্তু তাঁর বংশধরের জন্যে নফল সদকা হালাল। ইমাম মালেকের মযহাব অনুযায়ী মোহাম্মদ পরিবারের জন্যে নফল সদকাও নিষিদ্ধ।

আবূ জুহায়ফা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমি বালিশে হেলান দিয়ে আহার করি না।

ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কখনও হেলান দিয়ে খেতে দেখা যায়নি।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ হুযূর (সাঃ) কখনও হেলান দিয়ে বসে আহার করেননি। তিনি বলতেন, আমি দাসের মত খাই এবং দাসের মত বসি।

মুজাহিদ রেওয়ায়েত করেন ঃ কিতাবধারীরা তাদের কিতাবে এই বিষয়বস্তু পেত যে, মোহাম্মদ (সাঃ) আপন হাতে লিখবেন না এবং কোন গ্রন্থ পাঠ করবেন না। বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, তিনি লেখাপড়া জানতেন না। কোন কোন আলেম বলেন ঃ জানতেন। কেননা, এক হাদীসে বলা হয়েছে-

هٰذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ ٠

অর্থাৎ, এই বিষয়ের উপর মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে এই বাক্য লিপিবদ্ধ করেন। জওয়াব এই যে, তিনি নিজে লিখেননি; বরং লেখার আদেশ দেন।

আওফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ ওফাতের পূর্বে রসূলুল্লাহ (সাঃ) লেখাপড়া শিখেছিলেন। এই হাদীসের সনদ দুর্বল। আমর ইবনে শায়বা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ হুদায়বিয়া সন্ধির সময় তিনি আপন

হাতে লিখেছিলেন। এর আগে তিনি লেখা জানতেন না এবং এটা ছিল তাঁর অন্যতম মোজেযা। হাদীসবিদগণ একে মোজেযা গণ্য করেছেন।

লৌহবর্ম পরিধান করার পর যুদ্ধ না করে তা খুলে ফেলা রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। এ প্রসঙ্গে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ উহুদ যুদ্ধের সময় হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি একটি মযবুত লৌহবর্ম পরিধান করেছি। এরপর একটি যবেহ করা গাভী দেখেছি। এর ব্যাখ্যা এই যে, লৌহবর্ম হচ্ছে মদীনা শহর এবং গাভী হচ্ছে যুদ্ধ। এখন তোমরা ইচ্ছা করলে শহরে অবস্থান নিতে পার। যদি মুশরিকরা হামলা করে, তবে এখানে থেকেই আমরা তাদের মোকাবিলা করব। সাহাবীগণ আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! মূর্খতা যুগে শত্রুপক্ষ কখনও আমাদের উপর চড়াও হতে পারেনি। এখন ইসলাম যুগে তারা আমাদের বাড়ীতে এসে আক্রমণ করবে, এ কেমন কথা! রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এখন তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর।

সাহাবীগণ সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যুদ্ধের পোশাক লৌহবর্ম পরিধান করলেন। এরপর সাহাবীগণ পুনরায় তাঁর কাছে এসে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি যা উপযুক্ত মনে করেন, তাই করুন। তিনি বললেন ঃ কোন নবীর জন্যে যুদ্ধের পোশাক পরিধান করার পর যুদ্ধ না করে তা খুলে ফেলা সমীচীন হয় না।

অনুগ্রহের বিনিময়ে অধিক অনুগ্রহ কামনা করা রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ .

অর্থাৎ, অধিক পাওয়ার আশায় অনুগ্রহ করো না।

এ আয়াতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ বিধান বিশেষভাবে রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে।

আহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান) নারীকে বিবাহ করা রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ .

অর্থাৎ, এরপর নারী আপনার জন্যে হালাল নয়।

এ আয়াত সম্পর্কে মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, এখানে নারী অর্থ আহলে কিতাব নারী। রসূলুল্লাহর (সাঃ) পত্নীগণ মুমিনদের জননী। তাই মুজাহিদ বলেন ঃ ইহুদী ও খৃষ্টান রমণীদের মুমিনদের জননী হওয়া উপযুক্ত নয়।

এছাড়া রসূলুল্লাহর (সাঃ) পত্নী হওয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলা হিজরতের শর্ত রেখেছেন। কোরআন পাকে বলা হয়েছে— اَلّٰتِىْ هَاجَرْنَ مَعَكَ . যে সকল রমণী আপনার সাথে হিজরত করে। সুতরাং মুহাজির নয়— এমন মুসলমান নারীই যখন নিষিদ্ধ, তখন কাফের নারী সন্দেহাতীত রূপে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে যে সকল বিষয় মোবাহ ছিল

আসরের পর নামায পড়া রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্যে মোবাহ ছিল। রওযা কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার তাঁর যোহরের পরবর্তী দু'রাকআত ফওত হয়ে গেলে তিনি আসরের পর এই দু'রাকআতের কাযা করেন। এরপর এ নিয়ম অব্যাহত রাখেন। বলা বাহুল্য, এটা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য।

আবূ সালামা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ তিনি আসর পরবর্তী দু'রাকআত নামায সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই দু'রাকআত আসরের পূর্বে পড়তেন। একবার কাযা হয়ে গেলে তিনি আসরের পরে পড়ে নেন। এরপর এর পাবন্দী করতে থাকেন।

উম্মে সালামা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আসরের নামায পড়ে আমার গৃহে আগমন করলেন এবং দু'রাকআত নামায পড়লেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ নামায তো আপনি পূর্বে পড়তেন না। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে খালেদ এসে যাওয়ায় আমি আসরের পূর্বেকার দু'রাকআত পড়তে পারিনি। তাই এখন পড়লাম। আমি প্রশ্ন করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এ নামায আমাদের কাযা হয়ে গেলে আমরাও কাযা পড়ব কি? তিনি বললেন ঃ না, তোমরা কাযা পড়বে না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফজরের পূর্বেকার দু'রাকআত এবং আসরের পরবর্তী দু'রাকআত তরক করতেন না।

নামাযে শিশুকে কোলে নেয়া রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে মোবাহ্ ছিল। আবূ কাতাদাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একবার নবী করীম (সাঃ) তাঁর পৌত্রী উমামা বিনতে যয়নবকে কোলে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। সেজদা করার সময় তিনি তাকে বসিয়ে দিতেন এবং দাঁড়ানোর সময় আবার কোলে তুলে নিতেন।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন ঃ গায়েবানা জানাযার নামায বিশেষভাবে রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে মোবাহ ছিল। তিনি আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর গায়েবানা জানাযা নামায পড়েছিলেন। অন্য কারও জন্যে গায়েবানা নামাযে জানাযা পড়া জায়েয নয়।

নামাযে বসে ইমামতি করা রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে মোবাহ ছিল। শা'বী রেওয়ায়েত করেন ঃ হুযূর (আঃ) বলেছেন ঃ আমার পরে কেউ যেন বসে ইমামতি না করে।

রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্যে লাগাতার রোযা রাখা (صــوم وصــال) মোবাহ ছিল। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ তোমরা লাগাতার রোযা থেকে বেঁচে থাক। সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি তো লাগাতার রোযা রাখেন। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের মত নই। আমি যখন রাত্রি যাপন করি, তখন আমার প্রভু আমাকে আহার করান এবং পান করান।

কোন কোন আলেম বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আক্ষরিক অর্থেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে রাত্রিকালে খাওয়াতেন এবং পান করাতেন এবং তাঁর জন্যে জান্নাত থেকে খানাপিনা আসত। আবার কেউ কেউ একে রূপক অর্থে মনে করেন।

মক্কা শরীফে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা এবং এহরাম ছাড়া প্রবেশ করা রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে মোবাহ ছিল। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۔

অর্থাৎ, শপথ এই নগরীর, যেহেতু আপনি এই নগরের অধিবাসী

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (সাঃ) লৌহবর্ম পরিধান করে শহরে প্রবেশ করেন। অতঃপর লৌহবর্ম খুলে ফেললে এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ ইবনে খতল কা'বার পর্দা ধারণ করে আছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তাকে হত্যা কর।

আবূ শুরায়হ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মক্কা বিজয়ের সময় বলতে শুনেছি–মক্কা নগরীকে আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত করেছেন—কোন মানুষে করেনি। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তার জন্যে এই নগরীতে রক্তপাত করা এবং বৃক্ষ কর্তন করা জায়েয নয়। অতএব, কেউ যদি রসূলুল্লাহর (সাঃ) দেখাদেখি যুদ্ধের অনুমতি দেয়, তবে তাকে বলে দাও–আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রসূলকে অনুমতি দিয়েছেন–তোমাকে নয়।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) কাল পাগড়ী পরিহিত হয়ে এহরাম ছাড়াই শহরে প্রবেশ করেন। ইবনুল কাস বলেন ঃ কাউকে অভয় দেয়ার পর হত্যা করা রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে জায়েয ছিল। কিন্তু কোন কোন আলেম বলেন ঃ যে নবীর জন্যে চোখের

ইশারায় হত্যার আদেশ দেয়া নিষিদ্ধ ছিল, কাউকে অভয় দেয়ার পর হত্যা করা তার জন্যে কিরূপে বৈধ হতে পারে?

রসূলুল্লাহ (সাঃ) চারের অধিক বিবাহ করতে পারতেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ.

অর্থাৎ, নবীর কোন দোষ হবে না আল্লাহর নির্ধারণ করা কাজে। পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছেন, তাদের ব্যাপারে এটা আল্লাহর সুন্নত।

এ আয়াত সম্পর্কে মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরসী থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যতজন মহিলাকে চান, বিবাহ করতে পারেন। কারণ, এটা অতীত পয়গম্বরগণের সুন্নত। হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর এক হাজার এবং হযরত দাঊদ (আঃ)-এর এক শ' পত্নী ছিল।

কুরতুবী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বলেন ঃ আমাদের নবী (সাঃ)-এর জন্যে ৯৯জন মহিলা হালাল ছিল। এই বহু বিবাহের অনেক উপকারিতা আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, অনেক পত্নী থাকার কারণে রসূলুল্লাহর (সাঃ) অভ্যন্তরীণ গুণাবলী উম্মতের মধ্যে স্থানান্তরিত হবে। দ্বিতীয় এই যে, শরীয়তের যে সব বিষয় সম্বন্ধে পুরুষরা অবগত হতে পারে না, পত্নীগণের মাধ্যমে সেগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে। তৃতীয়ত, তাঁর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে আরবের গোত্রসমূহ ধন্য ও গৌরবান্বিত হতে পারবে।

আসলে বহু বিবাহ দ্বারা রসূলুল্লাহর (সাঃ) পারিবারিক মোজেযা ও উৎকর্ষ জনগণের মধ্যে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল, যেমন বাইরের বিষয়াবলী পুরুষদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) বৈশিষ্ট্যাবলী

রসূলুল্লাহর (সাঃ) একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন হয়নি। হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ আমার ত্যাজ্য সম্পত্তি কেউ পাবে না। এটা সদকা, যা মোহাম্মদ-পরিবার ভোগ করবে। আমি (আবু বকর) তাঁর সদকায় কোন পরিবর্তন করব না। বরং তিনি যা বলেছেন, তাই করব।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমার পরে আমার উত্তরাধিকারীরা কোন দিরহাম ও দীনার বন্টন করবে না।

আমার ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তি থেকে আমার পত্নী ও কর্মচারীদের জন্যে ব্যয় করা হবে। কারণ, আমার ত্যাজ্য সম্পত্তি সদকা।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেন ঃ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট যে, তুমি আমার জন্যে এমন, যেমন মূসা (আঃ)-এর জন্যে হযরত হারূন (আঃ) ছিলেন? তবে আমার পরে না নবুওয়ত আছে, না আছে ত্যাজ্য সম্পত্তি।

কাযী আয়ায হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, ত্যাজ্য সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার না থাকা আমাদের নবী (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য নবী ও রসূলগণের ত্যাজ্য সম্পত্তি তাদের ওয়ারিসরা পেতেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَ وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ٠

অর্থাৎ, সোলায়মান পিতা দাঊদের ওয়ারিস হলেন।

হযরত যাকারিয়া (আঃ) দোয়ায় বলেন ঃ

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ٠

অর্থাৎ, হে পরওয়ারদেগার , আমার এবং ইয়াকূব-পরিবারের ওয়ারিস হয়-এমন একজন কামেল পুরুষ আমাকে দান কর।

কিন্তু আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, উত্তরাধিকার না থাকার বিধানটি সকল পয়গম্বরের জন্যে প্রযোজ্য। এতে রসূলুল্লাহর (সাঃ) বিশেষত্ব নেই। কেননা, এক রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমরা যারা আল্লাহর পয়গম্বর রয়েছি, তাদের কোন ওয়ারিসী স্বত্ব নেই। উপরোক্ত আয়াতসমূহের জওয়াবে আলেমগণ বলেন ঃ এসব আয়াতে নবুওয়ত ও শিক্ষার উত্তরাধিকার বুঝানো হয়েছে— বৈষয়িক উত্তরাধিকার নয়।

ইবনে মাজাহ বর্ণিত আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ ان العلماء هم ورثة الانبياء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আলেমগণ পয়গম্বরগণের ওয়ারিস।

পয়গম্বরগণ ওয়ারিসীর জন্যে দিরহাম ও দীনার ছেড়ে যাননি, বরং ইলম ও শিক্ষা ছেড়ে গেছেন।

পয়গম্বরগণের ত্যাজ্য সম্পত্তিতে কোন ওয়ারিস না থাকার একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, যাতে পয়গম্বরের আত্মীয়রা তাঁর মৃত্যু কামনা না করে। এরূপ করলে তারা নিশ্চিতই ধ্বংস হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, পয়গম্বরগণ সম্পর্কে যেন এই

ধারণা সৃষ্টি না হয় যে, দুনিয়ার ধনৈশ্বর্যের প্রতি তাদের মোহ আছে এবং তারা ওয়ারিসদের জন্যে ধন সঞ্চয় করেছেন। তৃতীয়ত, পয়গম্বরগণ জীবদ্দশায় আছেন। ইমামুল হারামাইন বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) সম্পত্তির উপর ওফাতের পরও তাঁর মালিকানা অব্যাহত আছে এবং এই মালিকানা থেকেই তাঁর পরিবারবর্গের ভরণপোষণে ব্যয় করা হবে। হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাই করতেন।

রসূলে করীম (সাঃ)-এর আরেক বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর পত্নীগণ মুমিনদের জননী (উম্মাহাতুল মুমিনীন)। তাঁদেরকে বিয়ে করা হারাম। তাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করা মুমিনদের উপর ওয়াজেব। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهَاتُهُمْ .

অর্থাৎ, নবী মুমিনদের অধিক নিকটবর্তী তাদের স্বজনদের চেয়ে। তাঁর পত্নীগণ তাদের জননী।

বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে এক মহিলা মা বললে তিনি বললেন ঃ আমি পুরুষদের মা—মহিলাদের নয়।

হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন ঃ আমি তোমাদের পুরুষ ও নারীদের মা। আলেমগণ বলেন ঃ মুমিন পুরুষ হোক কিংবা নারী, নবীপত্নীগণ তাদের সকলের মা। কেননা, সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন নারীদের জন্যেও জরুরী।

ইমাম বগভী (রহঃ) বলেন ঃ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুমিনের পিতা।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) বিবিগণের কাছে সামনা-সামনি কিছু চাওয়া জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ .

অর্থাৎ, যখন তাদের কাছে কোন সামগ্রী প্রার্থনা কর, তখন পর্দার অন্তরাল থেকে প্রার্থনা কর।

ইমাম রাফেঈ ও ইমাম বগবী বলেন ঃ পবিত্রা বিবিগণের সঙ্গে পর্দার অন্তরাল ছাড়া অন্য কোন ভাবে কথা বলা কোন ব্যক্তির জন্যে জায়েয নয়।

কাযী আয়ায ও ইমাম নববী (রহঃ) বর্ণনা করেন—পবিত্রা বিবিগণের প্রতি মুখমণ্ডল ও হাত আবৃত করার নির্দেশ ছিল। তাদের উপর যে পর্দা ফরয ছিল, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। তারা যখন কথাবার্তা বলার জন্যে আসতেন, তখন পর্দার পিছনে বসতেন। হযরত যয়নব (রাঃ)-এর ওফাত হলে তাঁর দেহ আবৃত করার জন্যে শবাধারের উপর চাদর টেনে দেয়া হয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ হযরত সওদা (রাঃ) কোন এক প্রয়োজনে বাইরে গেলেন। তিনি স্থূলাঙ্গিনী ছিলেন এবং পরিচিত জনের দৃষ্টি থেকে অন্ধকারেও গোপন থাকতে পারতেন না। হযরত ওমর (রাঃ) তাকে দেখে বললেন ঃ সওদা, আপনি বাইরে যান, অথচ আমার দৃষ্টি থেকে গোপন থাকতে পারেন না। অতঃপর সওদা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে অভিযোগ করলেন। তিনি তখন রাত্রিকালীন আহারে রত ছিলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি হাড্ডি। সওদা বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি এক প্রয়োজনে বাইরে গেলে ওমর আমাকে এমন বলেছে। অতঃপর হাতের হাড্ডি বাসনে রাখার পূর্বেই রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে ওহী এসে গেল। তিনি বললেন ঃ তোমাকে প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

উম্মে মা'বাদ রেওয়ায়েত করেন ঃ হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে হযরত ওছমান ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) রসূলুল্লাহর (সাঃ) পত্নীগণকে হজ্জের জন্যে নিয়ে যান। তাদের গদীর উপর সবুজ চাদর টেনে দেয়া হয়েছিল এবং তাদের উট অন্যান্য মহিলার উটের বেষ্টনীতে ছিল। অগ্রে হযরত ওছমান এবং পশ্চাতে আবদুর রহমান চলছিলেন। কেউ কাছে এলে তারা উভয়েই তাকে দূরে সরিয়ে দিতেন।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ .

অর্থাৎ, নবী পত্নীগণ, তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর।

সেমতে আলেমগণের এক উক্তি অনুযায়ী নবী-পত্নীগণ হজ্জ ও ওমরার জন্যেও বের হতে পারেন না।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ বিদায় হজ্জের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) পত্নীগণকে বললেন ঃ এটাই হজ্জ। এরপর সফর নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।

কথিত আছে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাতের পর হযরত সওদা ও হযরত যয়নব (রাঃ) হজ্জের জন্যেও বাইরে যেতেন না।

ইবনে সীরীনের রেওয়ায়েতে হযরত সওদা বলেন ঃ আমি হজ্জও করেছি, ওমরাও করেছি। এখন আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক গৃহে বসে থাকব। হযরত সওদা (রাঃ) রসূলুল্লাহর (সাঃ) উপরোক্ত উক্তিও মেনে চলতেন। তাই আমৃত্যু হজ্জ করেননি।

আতা ইবনে ইয়াসার রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) পত্নীগণকে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহকে ভয় করবে, কুকর্ম থেকে বিরত থাকবে এবং নিজের মাদুরে বসে থাকবে, সে আখেরাতে আমার পত্নী হবে।

রবীআ ইবনে আবূ আবদুর রহমান (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ হযরত ওমর (রাঃ) নবী–পত্নীগণকে হজ্জ ও ওমরা করতে নিষেধ করেছিলেন। ইবনে সা'দের

রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) নবী-পত্নীগণকে হজ্জ ও ওমরা করতে মানা করেছিলেন এবং শেষ বছরে তিনি তাঁদের সাথে হজ্জ করেন। হযরত ওছমান (রাঃ) খলীফা হলে নবীপত্নীগণ তাঁর কাছে হজ্জের অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন ঃ আপনারা যা ভাল মনে করেন, তাই করেন। এরপর তিনি তাদেরকে হজ্জ করান; কিন্তু হযরত যয়নব ও সওদা (রাঃ) হজ্জে গেলেন না। তাঁরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাতের পর গৃহ থেকে বের হননি। নবীপত্নীগণ সকলেই পর্দা করতেন।

রসূলে আকরাম (আঃ)-এর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর পেশাব, পায়খানা ও রক্ত পবিত্র। সালমান ফারেসী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ তিনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে দেখলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়রের কাছে পিয়ালায় কিছু রাখা আছে এবং তিনি তা পান করছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন ঃ তুমি রক্ত পান করেছ। আবদুল্লাহ বললেন ঃ আমার বাসনা হল যে, আপনার রক্ত আমার পেটে থাকুক। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি দোযখের অগ্নি থেকে বেঁচে গেলে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ জনৈক কোরায়শ যুবক রসূলুল্লাহর (সাঃ) দেহে শিঙ্গা প্রয়োগ করে বদ রক্ত বের করে নেয়। রক্ত বের করার পর সে তা পান করে ফেলে। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি রক্ত কি করলে? সে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! রক্ত আমার পেটে চলে গেছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি নিজেকে দোযখের অগ্নি থেকে বাঁচিয়ে নিলে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ উহুদ যুদ্ধে রসূলুল্লাহর (সাঃ) মস্তক ক্ষত-বিক্ষত হলে আমার পিতা মালেক ইবনে সিনান অগ্রসর হয়ে তাঁর রক্ত চুষে পান করে নেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ কেউ যদি এরূপ কাউকে দেখতে চায়, যার পেটে আমার রক্ত মিশে গেছে, সে যেন মালেক ইবনে সিনানকে দেখে নেয়। দোযখের অগ্নি তাকে স্পর্শ করবে না।

উম্মে আয়মন (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) এক রাতে একটি মৃৎপাত্রে প্রস্রাব করলেন। আমার পিপাসা লাগল এবং আমি উঠে সেই পেশাব পান করে নিলাম। সকালে উঠে তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করলে তিনি বললেন ঃ তোমার পেটে কখনও ব্যথা হবে না।

হাকীম বিনতে ওসায়মার জননী বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি কাঠের পিয়ালায় প্রস্রাব করতেন এবং সেটি খাটের নীচে রেখে দিতেন। এক রাতে তিনি গাত্রোত্থান করে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ পিয়ালা কোথায়? বলা হল ঃ আবিসিনিয়া থেকে আগত উম্মে সালামার পরিচারিকা বাররাহ সেটি পান করে নিয়েছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ দোযখের অগ্নি তার জন্যে হারাম হয়ে গেছে।

আবূ রাফের পত্নী সালামাহ রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) গোসল করলেন। আমি তাঁর গোসলের পানি পান করলাম। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমার জন্যে দোযখের অগ্নি হারাম হয়ে গেছে।

আলেমগণ এবিষয়ে একমত যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) কেশ পবিত্র। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ হজ্জে কোরবানীর দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন কেশ মুণ্ডন করালেন। অতঃপর বললেন ঃ এই কেশ বন্টন করে দাও। আবূ তালহা (রাঃ) ত্বরিত সেখান থেকে আপন অংশ নিয়ে নিলেন।

ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন ঃ যদি রসূলুল্লাহর (সাঃ) একটি পবিত্র কেশ আমার কাছে থাকত, তবে তা আমার কাছে সমগ্র বিশ্ব অপেক্ষা অধিক প্রিয় হত।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) আমল তাঁর জন্যে নফল। হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ কেউ তাঁকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ তাঁর আমলের কোন নযীর নেই। তাঁর সমস্ত গোনাহ্ মাফ করা হয়েছিল। তাঁর আমল (নামায, রোযা ইত্যাদি) ছিল তাঁর জন্যে নফল।

আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নফল রসূলুল্লাহর (সাঃ) বৈশিষ্ট্য।

মুজাহিদ বলেন ঃ নফল রসূলুল্লাহর (সাঃ) বিশেষত্ব। কারণ, তাঁর সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হয়েছে। তিনি কারণ ছাড়া যত আমল করেছেন, সেগুলো গোনাহের কাফফারা স্বরূপ আদায় করা হয়নি। অথচ অন্যরা ফরয ছাড়া নফল গোনার কাফ্ফারা স্বরূপ আদায় করে।

তাফসীরবিদগণ বলেন ঃ ফরয আমলের ছওয়াবের উপর নফল অতিরিক্ত, যাতে ফরযের ত্রুটি পূরণ হয়ে যায়। কিন্তু রসূলে করীম (সাঃ)-এর ফরয আমলে ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা নেই। কেননা, তিনি নিষ্পাপ।

মুগীরা ইবনে শো'বার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমার ব্যাপারে মিথ্যা বলা অন্য যে-কোন ব্যক্তির ব্যাপারে মিথ্যা বলার অনুরূপ নয়। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ব্যাপারে মিথ্যা বলে, সে যেন আপন ঠিকানা জাহান্নামে তৈরী করে নেয়।

ইমাম নববী বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) ব্যাপারে মিথ্যা বলা কবীরা গোনাহ্।

রসূলে করীম (সাঃ)-এর অগ্রে যাওয়া, তাঁকে উঁচু স্বরে ডাকা, দূর থেকে ডাকা এবং কক্ষে অবস্থানকালে ডাকাডাকি করা জায়েয নয়। আল্লাহপাক বলেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ

لَا تَشْعُرُوْنَ. اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ
عَظِيْمٌ. اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاۤءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْقِلُوْنَ. وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا
لَّهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থাৎ, মুমিনগণ, তোমরা (কোন বিষয়ে) আল্লাহ্ ও রসূলের অগ্রে যেয়ো না। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

বিশ্বাসীগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তার সাথে এমন উচ্চস্বরে কথা বলো না, যেমন নিজেদের মধ্যে বলে থাক। এতে তোমাদের আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতে।

যারা আল্লাহর রসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে পরিশোধিত করেছেন যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

হে রসূল! যারা গৃহের পশ্চাৎ থেকে আপনাকে ডাকাডাকি করে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।

আপনার বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত যদি তারা অপেক্ষা করত, তবে তাই তাদের জন্যে উত্তম হত। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে 'ইয়া আবাল কাসেম' বলে ডাক দেয়া নিষেধ এবং তাঁর কবর মোবারকেও উচুস্বরে কথা বলা নিষিদ্ধ।

ইবনে হুমায়দ রেওয়ায়েত করেন ঃ আবূ জাফর মনসুর ইমাম মালেকের সাথে মসজিদে নববী সম্পর্কে কথা বললেন। তখন তার সামনে পাঁচশ' সিপাহী তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান ছিল। ইমাম মালেক বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, এই মসজিদে কণ্ঠস্বর উঁচু করবেন না। কেননা, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ الخ.

অর্থাৎ, রসূলুল্লাহর (সাঃ) সম্মান ও মহত্ত্ব ওফাতের পরেও জীবদ্দশার অনুরূপ।

রসূলে করীম (সাঃ)-এর অবমাননাকারী কাফের এবং যে তাঁর কুৎসা রটনা করে, তাকে হত্যা করা ওয়াজেব। হযরত আবূ বুরযাহ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ জনৈক ব্যক্তি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে মন্দ বললে আমি আরয করলাম ঃ হে রসূলের খলীফা! আমি এই ব্যক্তিকে হত্যা করব? তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর এটা কারও জন্যে জায়েয নয়। আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ হুযূর (সাঃ)-কে গালি দেবে, তাকে হত্যা করা হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) আমলে জনৈক অন্ধ ব্যক্তির এক বাঁদী ছিল উম্মে ওয়ালাদ। সে রসূলুল্লাহর (সাঃ) দরবারে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলে অন্ধ ব্যক্তি তাকে হত্যা করল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করল। তিনি এরশাদ করলেন ঃ এই বাঁদীর খুন মাফ।

হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ জনৈকা ইহুদী মহিলা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কুৎসা রটনা করত। এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার খুন বাতিল ক'রে দিলেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ), তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে মহব্বত করা ওয়াজেব। হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ মুসলমান হতে পারে না, যে পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতা, পুত্র ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় না হই।

হযরত আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি একদল কোরায়শের সাথে দেখা করতাম। তারা আমাকে দেখে সম্মানার্থে তাদের কথাবার্তা বন্ধ করে দিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন ঃ মানুষ আমার পরিবারের লোকজনকে দেখে তাদের কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়। আসলে কেউ মুমিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াস্তে আমার পরিবারবর্গকে মহব্বত না করে।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আনসার ঈমানী মহব্বতের প্রতীক। আনসারের প্রতি শত্রুতা মুনাফেকীর চিহ্ন।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) কন্যার সন্তানগণ তাঁর বংশগত। হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে হুযূর (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ প্রত্যেক মায়ের পুত্রদের আসাবা থাকে। কিন্তু ফাতেমার পুত্রদের আমি আসাবা তথা ওলী।

ইমাম বায়হাকী বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) হযরত হাসান সম্পর্কে বলেছেন ঃ আমার এই সন্তান সাইয়িদ। হাসান ভূমিষ্ঠ হলে তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেন ঃ হে আলী! তুমি আমার সন্তানের কি নাম রেখেছ? হযরত হুসায়নের জন্মের পরও তিনি হযরত আলীকে একই প্রশ্ন করেন।

রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর কন্যা বিবাহে থাকা অবস্থায় অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ। মিসওয়ার ইবনে মাখরামার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ

(সাঃ) বলেন ঃ বনী হেশাম ইবনে মুগীরা তাদের কন্যাকে আলীর বিবাহে দিতে চায়। তারা আমার কাছে এ বিষয়ের অনুমতি চেয়েছে। কিন্তু আমি অনুমতি দেব না, দেব না-দেব না যে পর্যন্ত আলী আমার কন্যাকে তালাক না দেয়। আমার কন্যা আমার কলিজার টুকরা। সে যা পছন্দ করে না, আমিও তা পছন্দ করি না। যে বিষয় তার জন্যে কষ্টদায়ক, তা আমার জন্যেও পীড়াদায়ক। ইবনে হাজর (রহঃ) বলেন ঃ খুব সম্ভব এটা রসূলুল্লাহর (সাঃ) বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ কেবল তাঁর কন্যা বর্তমান থাকতে অন্য মহিলাকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ।

আলী ইবনে হুসায়ন (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ হযরত আলী (রাঃ) আবূ জাহলের কন্যাকে বিয়ে করতে চাইলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহর রসূলের কন্যা বর্তমান থাকতে আল্লাহর শত্রুর কন্যাকে বিয়ে করা জায়েয নয়।

আবূ হানযালা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে—হযরত আলী (রাঃ) আবূ জাহলের কন্যাকে বিয়ে করতে চাইলে রসূলে করীম (সাঃ) সংবাদ পেয়ে বললেন ঃ ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা। যে ফাতেমাকে কষ্ট দিবে, সে আমাকে কষ্ট দেবে।

ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবূ রাফে রেওয়ায়েত করেন ঃ হাসান ইবনে হাসান মিসওয়ারের কন্যাকে বিয়ে করার পয়গাম পাঠালেন। মিসওয়ার (রাঃ) বললেন ঃ আমার জন্যে আপনার চেয়ে উত্তম কোন জামাতা নেই। কিন্তু রসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত ফাতেমা সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ ফাতেমা আমার কালিজার টুকরা। যে বিষয় তাঁর জন্যে কষ্টদায়ক, তা আমার জন্যে কষ্টদায়ক। অবস্থা এই যে, ফাতেমার কন্যা আপনার বিবাহে আছেন। এমতাবস্থায় আমি আমার কন্যা আপনাকে দান করলে তার জন্যে তা অসহনীয় হবে।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ সেই ব্যক্তি দোযখে দাখিল হবে না, যে আমার পরিবারে বিবাহ করে।

ইবনে আবী আওয়াফার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমি পরওয়ারদেগারের কাছে দোয়া করেছি, আমি আমার উম্মতের যে পরিবারে বিয়ে করি এবং যে আমার পরিবারে বিয়ে করে, তারা যেন জান্নাতে আমার সাথে থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমার এই দোয়া কবুল করেছেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আলী-তনয়া উম্মে কুলছুমকে বিয়ে করতে চান। হযরত আলী (রাঃ) তাতে সম্মত হন এবং বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) মুসলমানদের কাছে এসে বললেন ঃ এ বিয়ের জন্যে তোমরা আমাকে মোবারকবাদ দাও। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সকল বন্ধন ও সকল বংশ লোপ পাবে। কিন্তু আমার বন্ধন ও বংশ লোপ পাবে না। তাই কিয়ামতের দিন আমার সম্পর্কও রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাথে অব্যাহত থাকবে।

নবী করীম (সাঃ) প্রত্যেক সগীরা ও কবীরা গোনাহ থেকে মুক্ত। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ۔

অর্থাৎ, যাতে আল্লাহ আপনার আগে-পিছের সকল গোনাহ মাফ করে দেন।

সুবকী (রহঃ) বলেন ঃ সকল উম্মত এ বিষয়ে একমত যে, রেসালত সম্পর্কিত সকল কবীরা গোনাহ্ এবং নবুওয়তের পরিপন্থী সকল সগীরা গোনাহ থেকে রসূলে করীম (সাঃ) মুক্ত— এ সব গোনাহ ইচ্ছাকৃত সংঘটিত হোক কিংবা ভুলক্রমে। তবে যে সব সগীরা গোনাহ নবুওয়তের পরিপন্থী নয়, সেগুলো থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন কি না, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। মুতাযেলা ও অমুতাযেলা অনেক আলেমের মতে এ ধরনের গোনাহ বৈধ। কিন্তু বিশুদ্ধ মত এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে এরূপ গোনাহ সংঘটিত হতে পারে না। কেননা, উম্মত তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজের অনুসরণ করতে আদিষ্ট। যদি রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে কোন অসমীচীন কাজ প্রকাশ পাওয়া সম্ভবপর হয়, তবে সেই কাজের অনুসরণের আদেশ কিরূপে বৈধ হবে?

ইবনে আতিয়্যা বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে কোন গোনাহ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। কারণ তাঁর শান হচ্ছে ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۔

অর্থাৎ, তিনি খেয়ালখুশীর বশবর্তী হয়ে কথা বলেন না। তাঁর কথা ওহী ছাড়া কিছুই নয়।

সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রত্যেকটি কাজের অনুসরণ সর্বাবস্থায় ওয়াজেব মনে করতেন। তারা তাঁর একান্ত বিষয়াদিরও অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন।

আমর ইবনে শোয়ায়ব (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমার দাদা রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে আরয করলেন ঃ আপনি আমাকে এ বিষয়ের অনুমতি দিন যে, আমি আপনার মুখ থেকে যা শুনি, তা যেন লিপিবদ্ধ করে নেই। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ অবশ্য লিপিবদ্ধ কর। দাদা বললেন ঃ আনন্দ ও ক্রোধ উভয় অবস্থার কথাবার্তা লিখব? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি উভয় অবস্থায় যা হক তাই বলি।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমি যা বলি, তা লিখে নাও। সাহাবীগণ আরয করলেন ঃ আপনি মাঝে মাঝে আমাদের সাথে রসিকতাও করেন। তিনি বললেন ঃ আমি রসিকতাও হক ছাড়া বলি না।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং পয়গম্বরগণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা কখনও উন্মাদ হন না, তবে বেহুশ হতে পারেন। আবূ হামেদ বলেন ঃ দীর্ঘ অচেতনতাও পয়গম্বরগণের বেলায় সংঘটিত হয় না। সুবকী বলেন ঃ পয়গম্বরগণের অচেতনতা সাধারণ মানুষের চেয়ে ভিন্ন হয়ে থাকে। কেননা, রোগ-শোকের প্রাবল্য কেবল তাদের বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের উপর হয়ে থাকে— অন্তরের উপর হয় না। তাঁদের চক্ষু নিদ্রামগ্ন হয় এবং অন্তর জাগ্রত থাকে। নিদ্রায় যখন তাঁদের অন্তর সংরক্ষিত থাকে, তখন অচেতনতায় আরও বেশী সংরক্ষিত থাকবে। পয়গম্বরগণ স্বপ্নদোষ থেকেও মুক্ত এবং তাঁরা অন্ধও হন না। কেননা, অন্ধত্ব একটি দৈহিক ত্রুটি। হযরত শোয়ায়ব (সাঃ)-এর অন্ধত্ব প্রমাণিত নেই। হযরত এয়াকূব (আঃ)-এর চোখে পর্দা পড়েছিল, যা পরবর্তীতে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) স্বপ্ন ওহী। হযরত মুয়ায (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বপ্ন অথবা জাগ্রত অবস্থায় যা দেখেছেন, সবই সত্য।

إِنِّيْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, পয়গম্বরগণের স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে।

স্বপ্নে রসূলুল্লাহর (সাঃ) যিয়ারত সত্য। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে আমাকেই দেখে। কেননা, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

কাযী আবূ বকর বলেন ঃ স্বপ্নে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখা সত্য। এটা বিক্ষিপ্ত ধারণাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়। আলেমগণ বলেছেন ঃ হাদীসের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি হুযূর (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখে, সে প্রকৃতপক্ষে তাঁকে দেখে। শয়তান স্বপ্নে তাঁর আকার ধারণ করে আসতে পারে না।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন ঃ যদি কেউ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বপ্নে কোন মোস্তাহাব কাজের আদেশ করতে এবং নিষিদ্ধ কাজে মানা করতে দেখে, তবে তার জন্যে সেই আদেশ পালন করা মোস্তাহাব।

দুরূদের ফযীলত

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন–

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দুরূদ পাঠ করেন। মুমিনগণ, তোমরাও তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠ কর।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরূদ প্রেরণ করবে, আল্লাহ্ তার প্রতি দশ বার রহমত নাযিল করবেন।

ইবনে আমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রতি একবার দুরূদ প্রেরণ করবে, আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ তার প্রতি সত্তর বার দুরূদ প্রেরণ করবেন।

আবূ তালহা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ আমার কাছে এক ফেরেশতা এসে বলল ঃ আপনার উম্মতের কেউ যখন আপনার প্রতি একবার দুরূদ প্রেরণ করবে, তখন আল্লাহ্ তার প্রতি দশবার রহমত নাযিল করবেন। কেউ আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করলে আল্লাহ্ তার প্রতি দশ বার সালাম প্রেরণ করবেন। এ বিষয়টি আপনার জন্য আনন্দদায়ক নয় কি?

হযরত ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমার কাছে জিবরাঈল এসে বললেন ঃ যে ব্যক্তি আপনার প্রতি এক বার দুরূদ প্রেরণ করবে, আল্লাহ্ তার প্রতি দশ বার রহমত নাযিল করবেন এবং তার দশটি মর্তবা উঁচু করে দেবেন।

আমের ইবনে রবীআর রেওয়ায়েতে আছে–যে ব্যক্তি আমার প্রতি দশ বার দুরূদ প্রেরণ করবে, যে পর্যন্ত সে দুরূদ পাঠ করতে থাকবে, ফেরেশতারা তার প্রতি রহমত নাযিল করতে থাকবে।

ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে—কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি আমার অধিক নিকটে থাকবে, যে আমার প্রতি অধিক দুরূদ পাঠ করবে।

হুসায়ন ইবনে আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে–কৃপণ সেই ব্যক্তি, যার সামনে আমার আলোচনা হয় এবং সে আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করে না।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ যারা কোন মজলিসে বসে এবং আল্লাহর যিকির করে না ও রসূলের প্রতি দুরূদ প্রেরণ করে না, তারা যালেম। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দেবেন, ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা আমার প্রতি দুরূদ প্রেরণ কর। কারণ, তোমাদের দুরূদ তোমাদের গোনাহের কাফফারা।

আবূ উমামা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা প্রতি জুমআর দিনে আমার প্রতি অধিক পরিমাণ দুরূদ প্রেরণ কর। কেননা, প্রত্যেক জুমআর দিনে যে বেশী পরিমাণে দুরূদ পাঠ করবে, সে আমার অধিকতর নিকটবর্তী হবে।

হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, দোয়া আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলন্ত থাকে। যখন দুরূদ পাঠ করা হয়, তখন দোয়া উপরে যায়।

রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর পদ মর্যাদা কারও দোয়ার প্রত্যাশী নয়। কেউ তাঁর জন্যে রহমতের দোয়া করতে পারে না। ইবনে আবদুল বারর বলেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) নামে "রহমতুল্লাহি আলাইহি" বলা জায়েয নয়। কেননা, তিনি مَنْ صَلَّى عَلَيَّ (যে আমার প্রতি দুরূদ পড়ে) বলেছেন এবং مَنْ دَعَالِيْ (যে আমার জন্যে দোয়া করে) বলেননি। অবশ্য صَلٰوةٌ শব্দের অর্থও রহমত। কিন্তু এ শব্দটিকে সম্মানার্থে তাঁর বৈশিষ্ট্য করে দেয়া হয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইচ্ছা করলে যাকে ইচ্ছা কোন বিধানের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করতে পারতেন। ফলে, সেই বিধান অন্য কারও বেলায় প্রযোজ্য হত না। নোমান ইবনে বশীর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) জনৈক বেদুঈনের কাছ থেকে একটি ঘোড়া ক্রয় করেন। বেদুঈন পরে এই ক্রয়-বিক্রয়ের কথা অস্বীকার করে। এমতাবস্থায় সাহাবী খুযায়মা (রাঃ) এসে বললেন ঃ হে বেদুঈন! আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি এই ঘোড়া বিক্রয় করেছ। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ হে খুযায়মা! আমি ঘোড়া ক্রয় করার সময় তোমাকে সাক্ষী করিনি। এমতাবস্থায় তুমি কিরূপে সাক্ষ্য দিচ্ছ? খুযায়মা বললেন ঃ আপনি আকাশের খবর আনেন। আমি তা সত্য বলে বিশ্বাস করি। এই ঘোড়া ক্রয় তো মর্ত্যের ব্যাপার। এটা বিশ্বাস করব না কেন? একথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) একা খুযায়মার সাক্ষ্যকে দু'জন পুরুষের সাক্ষ্যের বরাবর সাব্যস্ত করে দিলেন। খুযায়মা ছাড়া ইসলামে এমন কোন লোক ছিল না, যার সাক্ষ্য দু'জন পুরুষের বরাবর হত।

রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর কারণেই তাঁর পত্নীগণ, পরিবার-পরিজন এবং সাহাবায়ে কেরাম গৌরবের আসনে সমাসীন হয়েছেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۔

অর্থাৎ, হে নবী পরিবারের লোকগণ! আল্লাহ তোমাদের মলিনতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পবিত্র করার ইচ্ছা করেন।

হযরত উম্মে সালামাহ রেওয়ায়েত করেন ঃ আমার গৃহে উপরোক্ত আয়াত

নাযিল হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আলী, ফাতেমা ও তাঁর পুত্রদ্বয়কে ডেকে বললেন ঃ এরা আমার পরিবার।

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ফেরেশতা আকাশ থেকে অবতরণ করে এই সুসংবাদ দিল যে, ফাতেমা জান্নাত রমণীগণের নেত্রী।

হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ফাতেমাকে বললেন ঃ তুমি অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এবং তোমার সন্তুষ্টিতে তিনি সন্তুষ্ট হন।

হযরত বারা' (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন শিশুপুত্র ইবরাহীমের জানাযার নামায শেষে বললেন ঃ তার ধাত্রীমা জান্নাতে তার দুগ্ধপান পূর্ণ করবে। ইবরাহীম সিদ্দীক ও শহীদ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ ইবরাহীমের মৃত্যু হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার জানাযার নামায পড়ালেন এবং বললেন ঃ জান্নাতে তাকে দুধ পান করানো হবে। সে জীবিত থাকলে সিদ্দীক ও নবী হত এবং তার মামা গোষ্ঠী কিবতীরা (মিসরীয়রা) মুক্ত হত এবং কেউ গোলাম থাকত না।

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ হাসান ও হুসায়ন জান্নাতী যুবকদের নেতা। কিন্তু দু'জন খালাত ভাইয়ের নয়।

ইবনে ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ হযরত হাসান ও হুসায়ন (রাঃ)-এর কাছে দু'টি তাবীয ছিল। এগুলোতে হযরত জিবরাঈলের পাখার অংশ ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ জান্নাতের শীর্ষস্থানীয়া মহিলাগণ হচ্ছেন খাদীজা (রাঃ), ফাতেমা (রাঃ), মরিয়ম (আঃ) ও হযরত আসিয়া (রাঃ)।

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে ঃ আমার পরিবারবর্গের প্রতি যে শত্রুতা পোষণ করবে, আল্লাহ তাকে দোযখে দাখিল করবেন।

হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে ঃ শহীদগণের সরদার হচ্ছেন হযরত হামযা (রাঃ)।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমার সাহাবীগণ নক্ষত্র সদৃশ। নক্ষত্র দেখে মানুষ পথের সন্ধান পায়। নক্ষত্র অস্তমিত হওয়ার পর মানুষ পথহারা হয়ে যায়।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক নবীর নযীর আমার উম্মতের মধ্যে রয়েছে। আবূ বকর হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নযীর, ওমর মূসা (আঃ)-এর নযীর, ওছমান হযরত হারূন (আঃ)-এর নযীর, আলী আমার নযীর। যে ব্যক্তি ঈসা ইবনে মরিয়মকে দেখতে চায়, সে যেন আবূ যরকে দেখে নেয়।

হযরত বুরায়দা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমার

সাহাবীগণের যে কেউ কোন শহরে ওফাত পাবে, কিয়ামতের দিন সে সেই শহরের লোকদের ইমাম, নেতা ও নূর হবে।

আলেমগণ একমত যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) সকল সাহাবী উদূল তথা ন্যায়পন্থী। তাঁরা যুগশ্রেষ্ঠ।

আলেমগণ আরও বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমান সহ এক মুহূর্তও রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে কাটিয়েছে, সে সাহাবী। তবে তাবেঈ হওয়ার জন্যে সাহাবীর সঙ্গে দীর্ঘকাল থাকা অত্যাবশ্যক।

ওফাতের প্রাক্কালে প্রকাশিত মো'জেযা

ওয়াছেলা ইবনে আস্‌কা থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) গৃহ থেকে বের হয়ে সাহাবায়ে কেরামকে বললেন ঃ তোমরা কি মনে কর যে, আমি তোমাদের শেষে ওফাত পাব? না, আমি তোমাদের পূর্বেই ওফাত পাব। আমার পরে তোমরা পরস্পরে খুনাখুনিতে লিপ্ত হবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) প্রত্যেক রমযান মাসে দশ দিন এ'তেকাফ করতেন। ওফাতের বছর তিনি বিশ দিন এতেকাফ করলেন। জিবরাঈল (আঃ) প্রতি রমযানে হুযূর (আঃ)-এর সামনে এক খতম কোরআন তেলাওয়াত করতেন। কিন্তু ওফাতের বছর দু'খতম তেলাওয়াত করলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) ফাতেমার সাথে গোপনে কথা বললেন। তিনি তাকে বললেন ঃ জিবরাঈল (আঃ) প্রতি বছর একবার আমাকে কোরআন পাঠ করে শুনাতেন। এ বছর দু'বার শুনিয়েছেন। আমার মনে হয় আমার ওফাত সন্নিকটে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ ওফাতের পূর্বে রুগ্নাবস্থায় হুযূর (সাঃ) ফাতেমাকে ডেকে গোপনে কিছু কথা বললেন, যা শুনে ফাতেমা ক্রন্দন করতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) পুনরায় তাঁকে কাছে ডেকে গোপনে কিছু বললেন। এবার ফাতেমা হাসতে লাগলেন। আমি এ সম্পর্কে ফাতেমাকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ আব্বাজান প্রথমে আমাকে তাঁর মৃত্যুর খবর দিয়েছেন। পুনরায় তিনি বললেন যে, আমি সর্বপ্রথম তাঁর সাথে মিলিত হব।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ফাতেমাকে ডেকে বললেন ঃ আমি আমার ওফাতের খবর পেয়ে গেছি। একথা শুনে হযরত ফাতেমা (রাঃ) কান্না শুরু করলেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ সবর কর। তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। এরপর তিনি আসতে লাগলেন।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) খোতবায় বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এক বান্দাকে দু'টি বিষয়ের মধ্য থেকে

একটি বেছে নেয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন। এক. দুনিয়াতে থাকা এবং দুই. আল্লাহর কাছে যাওয়া। বান্দা শেষোক্ত বিষয়টিই বেছে নিয়েছে। একথা শুনে হযরত আবূ বকর ক্রন্দন করতে লাগলেন। এতে আমরা বিস্মিত হলাম। পরে জানা গেল যে, যে বান্দাকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, সে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ)। আবূ বকর (রাঃ) এই সত্য সম্পর্কে অধিক ওয়াকিফহাল ছিলেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আবূ বকর, কেঁদো না। আমি আবূ বকর দ্বারাই সর্বাধিক উপকৃত হয়েছি। আমি কাউকে খলীল বানালে আবূ বকরকে বানাতাম। কিন্তু আমার ও তার মধ্যে রয়েছে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব।

হযরত আবূ মুহায়বা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে মধ্যরাতে ঘুম থেকে জাগ্রত করে বললেন ঃ আমাকে বাকী' কবরবাসীদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করার আদেশ করা হয়েছে। তুমি আমার সাথে কবরস্তানে চল। আমি তাঁর সাথে বাকী কবরস্তানে এলাম। হুযূর (সাঃ) হাত তুলে দোয়া করলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের মোবারক হোক। তোমরা শান্তিতে জীবন যাপন করেছ। কিন্তু এখন একের পর এক ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ হে মুহায়বা, আমাকে পার্থিব জীবন, পার্থিব ধনভাণ্ডার এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতের মধ্য থেকে একটি বেছে নেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আমি পালনকর্তার মোলাকাত বেছে নিয়েছি। এরপর হুযূর (সাঃ) বাকী থেকে ফিরে এলেন এবং সকাল থেকেই অন্তিম রোগে আক্রান্ত হলেন।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, পৃথিবীকে অত্যন্ত শক্ত ও লম্বা রশি দিয়ে আকাশের দিকে টেনে তোলা হচ্ছে। আমি স্বপ্নের বিষয় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গোরচীভূত করলে তিনি বললেন ঃ এটা তোমার ভাতিজার ওফাত।

রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর ওফাতের দিনক্ষণ ও স্থানের খবর দিয়েছেন। হযরত মাকহূল (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে তিনি বলেন ঃ তোমরা সোমবারের রোযা ছাড়বে না। কেননা, আমি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছি, সোমবারে আমার কাছে ওহী প্রেরণ করা হয়েছে, সোমবারে হিজরত করেছি এবং সোমবারে আমার ওফাত হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তোমাদের নবী সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, সোমবারে নবুওয়ত লাভ করেছেন, সোমবারে হিজরতের জন্যে রওয়ানা হয়েছেন, সোমবারে মদীনায় পৌঁছেছেন, সোমবারে মক্কা জয় করেছেন এবং সোমবারে ইন্তেকাল করেছেন।

মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মদীনা আমার হিজরত ও চির নিদ্রার স্থল।

হযরত হাসান (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে–মদীনা আমার হিজরতের স্থান, ওফাতের স্থান এবং হাশরের স্থান।

নবী করীম (সাঃ)-কে এক সাথে নবুওয়ত ও শাহাদতের ফযীলত দান করা হয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ হুযূর (সাঃ) অন্তিম রোগে বললেন ঃ আমি সর্বদা সেই খাদ্যের বিষ অনুভব করি, যা খায়বরে খেয়েছিলাম। সেই বিষক্রিয়ায় আমার হৃদয়ের শিরা কেটে গিয়েছিল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ উম্মে বিশর (রাঃ) অন্তিমরোগে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এল এবং তাঁর শরীরে হাত বুলিয়ে বলল ঃ আপনার জ্বরের মত জ্বর আমি আর দেখিনি। আমাদের পুরস্কার যেমন বেশী, তেমনি বিপদাপদও কঠোর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমার রোগ সম্পর্কে মানুষ কি বলে? সে বলল ঃ আপনার নিউমোনিয়া (ذات الجنب) হয়েছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ নিউমোনিয়া নয়। আমার রোগ সেই গ্রাসের কারণে, যা আমি খায়বরে খেয়েছিলাম। এ কারণে আমি সর্বক্ষণ কষ্ট করেছি। এখন আমার হৃদয়ের শিরা কেটে যাওয়ার সময়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ রোগেই শাহাদত বরণ করেন।

ওফাতকালীন ঘটনাবলী

ফযল ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ অসুস্থ অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ আমার মাথায় পট্টি বেঁধে দাও। সম্ভবত আমি মসজিদে যেতে পারব। আমি তাঁর মাথায় পট্টি বেঁধে দিলাম। তিনি সকষ্ট পদক্ষেপে মসজিদে এলেন। মিম্বরে বসার পর এরশাদ করলেন ঃ আমার বিদায়ের ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। যার পিঠে আমি আঘাত করেছি, সে আমার কাছ থেকে তার বদ্‌লা নিক। আমি যার কোন অর্থ নিয়েছি, সে তার অর্থ নিয়ে নিক। আমি যাকে গালি-গালাজ করেছি, সে আমাকে গালি-গালাজ করুক। কেউ যেন এরূপ ভয় না করে যে, আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলে আমি তার শত্রু হয়ে যাব।

কেননা, শত্রুতা রাখা আমার পদমর্যাদার পরিপন্থী। এটা আমার চরিত্রও নয়। কোন ব্যক্তি নিজের কোন পাপকর্ম জানলে সে তা বলে দিক। আমি তার সংশোধনের জন্যে দোয়া করব। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল এবং আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি মুনাফিক, কৃপণ, মিথ্যুক এবং অধিক নিদ্রাপ্রিয়। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহ, তুমি তাকে ঈমান ও সততা দান কর। তার নিদ্রা ও কৃপণতা দূর কর এবং তাকে বাহাদুর করে দাও।

ফযল (রাঃ) বলেন ঃ এই দোয়ার পর আমি সেই লোকটিকে দেখেছি, সে সর্বাধিক দানশীল ও যুদ্ধে অসম সাহসী ছিল এবং খুব কম নিদ্রা যেত। অতঃপর জনৈকা মহিলা দণ্ডায়মান হয়ে আপন অঙ্গুলি দিয়ে আপন জিহ্বার দিকে ইশারা করল। হুযূর (সাঃ) তাকে বললেন ঃ তুমি আয়েশার কাছে যাও। আমি সেখানে

আসছি। অতঃপর তিনি মহিলার কাছে গেলেন এবং তার মাথায় একটি শাখা রেখে দোয়া করলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ এই মহিলার জন্যে হুযূর (সাঃ)-এর দোয়া কবুল হল। সে পরবর্তী কালে আমাকে বলত, আয়েশা, নামায উত্তমরূপে পড়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) জ্বরের চেয়ে বেশী জ্বর কারও দেখিনি।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন এত বেশী জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন যে, আমরা তাঁর গায়ে হাত পর্যন্ত লাগাতে পারতাম না। এই অবস্থা দেখে সকলেই সোবহানাল্লাহ বলল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ নবীগণের ভোগান্তি বেশী কঠিন হয়ে থাকে। একারণে প্রতিদানও দ্বিগুণ হয়।

হযরত ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এলাম। তখন তাঁর জ্বরের তীব্রতা কাপড়ের উপরেও অনুভূত হচ্ছিল। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি এমন জ্বর কারও দেখিনি। তিনি বললেন ঃ নবীগণের ভোগান্তি সাধারণ মানুষের তুলনায় বেশী হয় এবং তাদের পুরস্কারও বেশী হয়।

হযরত আবূ মূসা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) গুরুতর অসুস্থ হয়ে বললেন ঃ আবূ বকরকে বল মুসলমানদের নামায পড়াতে। হযরত আয়েশা বললেন ঃ আবূ বকর কোমল প্রাণের মানুষ। তিনি আপনার জায়গায় দাঁড়িয়ে নামায পড়াতে সক্ষম হবেন না। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আবূ বকরকে বল নামায পড়াতে। হযরত আয়েশা আবার আপত্তি করে একই কথা বললেন। হুযূর(সা)-ও আপন উক্তির পুনরাবৃত্তি করলেন এবং বললেন ঃ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ তোমরা ইউসুফ (আঃ)-এর সঙ্গিনী।

অতঃপর হযরত আবূ বকর (রাঃ) রসূলুল্লাহর (সাঃ) জীবদ্দশায় নামায পড়ালেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ উপরোক্ত ঘটনায় আমি বারবার আপত্তি করেছি। কারণ, আমার বিশ্বাস ছিল রসূলুল্লাহর (সাঃ) জায়গায় অন্য কারও দণ্ডায়মান হওয়া জনগণ পছন্দ করবে না এবং একে দুর্নাম মনে করবে। তাই আমি চেয়েছিলাম যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূ বকরের পরিবর্তে অন্য কাউকে নামায পড়াবার আদেশ করুন।

মোহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্তিম রোগ শয্যায় আবূ বকরকে নামায পড়াতে বললেন। আবূ বকর (রাঃ) নামায পড়াচ্ছিলেন, এমন সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) কিছুটা সুস্থবোধ করে বাইরে চলে এলেন। তিনি তাঁর হাত হযরত আবূ বকরের কাঁধে রাখলেন। হযরত আবূ বকর

সরে গেলেন এবং তাঁর ডান দিকে বসে পড়লেন। হুযূর (সাঃ) হযরত আবূ বকরের মুক্তাদী হয়ে নামায আদায় করলেন এবং বললেন ঃ প্রত্যেক নবী ওফাতের পূর্বে উম্মতের পিছনে নামায পড়েছেন।

শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ তিনি ওফাতের সময় রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ হুযূর, আপদ-বিপদের কারণে আমার দুনিয়া সংকীর্ণ হয়ে গেছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ চিন্তা করো না। সিরিয়া ও বায়তুল মোকাদ্দাস বিজিত হবে। তোমার পুত্র তোমার পরে সিরিয়াবাসীদের ইমাম হবে।

ওমর ইবনে আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বপ্রথম বুধবার দিন অসুস্থতা প্রকাশ করেন। তিনি মোট তের দিন অসুস্থ থাকেন।

মৃত্যুর সময়কার মোজেযা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সুস্থ অবস্থায় বলেছিলেন ঃ প্রত্যেক নবী ওফাতের পূর্বে জান্নাতে তাঁর স্থান দেখে নেন। এরপর সেই নবীকে বেছে নেয়ার এখতিয়ার দেয়া হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্তিম রোগে শয্যাশায়ী হলেন। একদিন যখন আমার কোলে তাঁর মাথা ছিল, তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। এরপর জ্ঞান ফিরে এলে তিনি মাথা তুলে ছাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং বললেন ঃ 'আল্লাহুম্মা আর রফীকুল আ'লা'— হে আল্লাহ, সুমহান বন্ধু। তখনই আমি বুঝলাম যে, সুস্থ অবস্থায় তিনি একথাই বলেছিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) আরও রেওয়ায়েত করেন ঃ আমরা বলাবলি করতাম যে, ওফাতের পূর্বে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে একটি বেছে নেয়ার ক্ষমতা দেয়া হবে। সেমতে অন্তিম রোগে যখন তাঁর কণ্ঠস্বর বসে গেল, তখন তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন—

مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ
وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰۤئِكَ رَفِيْقًا ـ

অর্থাৎ,আল্লাহর নেয়ামতপ্রাপ্ত নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে। তারা খুব চমৎকার সঙ্গী।

অর্থাৎ, এতে আমাদের বুঝতে বাকী রইল না যে, তাঁকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে।

হযরত আবুল হুয়ায়রিছ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখনই অসুস্থ হতেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে আরোগ্য প্রার্থনা করতেন। কিন্তু অন্তিম রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি আরোগ্য লাভের জন্যে দোয়া করেননি। তিনি নিজেকে

বলতেন ঃ হে নফস! তোর কি হয়েছে যে, যে-কোন আশ্রয় খুঁজে ফিরিস? রাবী বলেন ঃ অন্তিম রোগে তাঁর কাছে জিবরাঈল (আঃ) এসে বললেন ঃ পরওয়ারদেগার আপনাকে সালাম বলেছেন এবং এরশাদ করেছেন যে, আপনি চাইলে তিনি আপনাকে আরোগ্য দেবেন এবং চাইলে ওফাত দেবেন এবং মাগফেরাত করবেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমার পরওয়ারদেগার যা চান, তাই করুন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে মালাকুল মওত (মৃত্যুর ফেরেশতা) আগমন করল। হুযূর (সাঃ)-এর মাথা তখন হযরত আলীর কোলে ছিল। মালাকুল মওত ভেতরে আসার অনুমতি চেয়ে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' বলল। হযরত আলী (রাঃ) বললেন ঃ আপনি চলে যান। এক্ষণে আমরা আপনার প্রতি মনোযোগ দিতে পারব না। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ আবুল হাসান, ইনি মালাকুল মওত। অতঃপর তিনি মালাকুল মওতকে অনুমতি দিলেন। মালাকুল মওত প্রবেশ করে বলল ঃ আপনার পরওয়ারদেগার আপনাকে সালাম বলেছেন। হযরত আলী বলেন ঃ আমরা জানতে পেরেছি যে, মালাকুল মওত এর আগে কারও পরিবারকে সালাম বলেনি এবং পরেও কাউকে সালাম বলবে না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওফাতের সময় তাঁর হাত প্রসারিত করতেন এবং বলতেন, জিবরাঈল, তুমি কোথায়? এরপর হাত টেনে নিতেন এবং পুনরায় প্রসারিত করতেন। জিবরাঈল তখন 'লাব্বায়কা' 'লাব্বায়কা' (হাযির আছি, হাযির আছি।) বলতেন। তার এই আওয়াজ আমি ছাড়া কেউ শুনেনি।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ কা'বে আহবার হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মদীনায় আসেন। তিনি বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, রসূলে করীম (সাঃ) সর্বশেষ কি কথা বলেছেন? খলীফা বললেন ঃ আলীকে জিজ্ঞেস করুন। কা'ব তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ হুযূর (সাঃ)-এর সর্বশেষ কথা ছিল 'আস সালাত' 'আস সালাত' (নামায, নামায)। কা'ব বললেন ঃ পয়গম্বরগণের শেষ সময় এমনই হয়।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ ওফাতের সময় রসূলুল্লাহর (সাঃ) সর্বশেষ ওসিয়ত ছিল 'আস সালাত' 'আস সালাত। তিনি আরও বলতেন, বাঁদী ও গোলামদের সাথে উত্তম আচরণ কর। এসব কথা বলার সময় তাঁর বুকে গরগর শব্দ হত এবং কথা পরিষ্কার উচ্চারিত হত না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আমার অন্তর ও বুকের মাঝখানে রসূলুল্লাহর (সাঃ) রূহ মোবারক কবয করা হয়। রূহ বের হওয়ার সময় আমি এক অনুপম সুগন্ধি অনুভব করেছি।

হযরত উরওয়া (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ ওফাতের পর আবূবকর সিদ্দীক (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে চুম্বন করেন এবং বলেন ঃ জীবদ্দশায়ও আপনি পূত-পবিত্র ছিলেন এবং মরণেও আপনি কত পবিত্র!

হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ যেদিন রসূলে আকরাম (সাঃ) ওফাত পান, আমি আমার হাত তাঁর পবিত্র বক্ষে রাখলাম। এরপর কয়েক জুমআ পর্যন্ত আহার করার সময় এবং উযূ করার সময় আমি মেশকের সুবাস অনুভব করেছি।

ওয়াকেদী বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাতের ব্যাপারে অনেকেই সন্দেহ করে। কেউ বলল ঃ তিনি ওফাত পেয়ে গেছেন। কেউ বলল ঃ না। আসমা বিনতে উমায়স (রাঃ) তার হাত রসূলুল্লাহর (সাঃ) উভয় কাঁধের মাঝখানে রাখলেন, অতঃপর বললেন ঃ হুযূর ওফাত পেয়ে গেছেন। কেননা, মোহরে নবুওয়ত তুলে নেয়া হয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাত হয়ে গেলে মালাকুল মওত আকাশে কাঁদতে কাঁদতে গেলেন। যিনি হুযূর (সাঃ)-কে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম, আমি কাউকে আকাশে 'ওয়া মোহাম্মদ' বলে ক্রন্দন করতে শুনেছি।

আহলে কিতাব (গ্রন্থধারীরা) রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাতের সংবাদ প্রচার করেছিলেন। হযরত জারীর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন—আমি ইয়ামনে ছিলাম। ইয়ামনের দু'জন প্রবীণ ব্যক্তির সাথে মোলাকাত হলে আমি তাদের সাথে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে আলোচনা করলাম। তারা বলল ঃ তোমার কথা সত্য হলে তিনি তিন দিন পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। অতঃপর তারা উভয়েই আমার সাথে এল। মদীনার সন্নিকটে পৌঁছার পর আমরা তাঁর ওফাতের সংবাদ অবগত হলাম।

হযরত কা'ব ইবনে আদী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি হীরার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রসূলুল্লাহর (সাঃ) দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাদের সামনে ইসলাম পেশ করলেন। আমরা মুসলমান হয়ে হীরায় ফিরে এলাম। কিছুদিন পরেই তাঁর ওফাতের সংবাদ এল। আমার গোত্রের লোকজন মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেল। তারা বলতে লাগল ঃ তিনি সত্যিকার নবী হলে মৃত্যুবরণ করতেন না। আমি বললাম ঃ এর আগেও তো নবীগণ এসেছেন এবং তাঁরাও মৃত্যুবরণ করেছেন। এরপর আমি মদীনায় এলাম। পথিমধ্যে এক সন্ন্যাসীর সাথে দেখা হল। সে তার কিতাব বের করে তাতে রসূলুল্লাহর (সাঃ) বর্ণনা দেখল। এই কিতাবে তাঁর ওফাতের খবর তখনই লিপিবদ্ধ ছিল, যখন তিনি ওফাত পেয়েছিলেন। এ ঘটনায় আমার অন্তশ্চক্ষু অধিক পরিমাণে খুলে গেল। আমি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে ঘটনাটি শুনালাম।

হযরত ওয়াকেদী বর্ণনা করেন— আমর ইবনুল আস (রাঃ) আম্মানের গভর্নর ছিলেন। তাঁর কাছে জনৈক ইহুদী এসে বলল ঃ বলুন তো আপনাকে এখানে কে পাঠিয়েছে? আমর বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) পাঠিয়েছেন। ইহুদী বলল ঃ আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, তিনি আল্লাহর রসূল? আমর বললেন ঃ হ্যাঁ। সে বলল ঃ আপনার কথা সত্য হলে আল্লাহর রসূল অদ্য ওফাত পেয়েছেন। এরপর আমর ইবনুল আসের কাছে মদীনা থেকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাতের সংবাদ পৌঁছে গেল।

হারেছ ইবনে আবদুল্লাহ জুহানী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন—রসূলে করীম (সাঃ) আমাকে ইয়ামনে প্রেরণ করলেন। যদি আমি ধারণা করতাম যে, তাঁর ওফাত হয়ে যাবে, তবে তাঁকে ছেড়ে আমি কিছুতেই যেতাম না। জনৈক ইহুদী আলেম আমার কাছে এসে বলল যে, তাঁর ওফাত হয়ে গেছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ কখন ওফাত পেয়েছেন? সে বলল ঃ অদ্য। আমার কাছে কোন অস্ত্র থাকলে আমি ইহুদীর সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতাম। কিছুদিন পর আমার কাছে হযরত আবূ বকরের পত্র পৌঁছল। তাতে হুযূর (সাঃ)-এর ওফাতের সংবাদ ছিল। আমি ইহুদীকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তুমি এই ওফাতের কথা কিরূপে জানতে পারলে? সে বলল ঃ আমরা তাঁর জীবনালেখ্য আমাদের কিতাবে পেয়ে থাকি। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর আমাদের অবস্থা কিরূপ হবে? সে বলল ঃ আপনারা পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত প্রবল থাকবেন।

হযরত কা'বে আহবার রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে গৃহ থেকে রওয়ানা হয়ে কিরবানুল হিমইয়ারী সরদারের সাথে দেখা করলাম। সে আমাকে বলল ঃ মোহাম্মদ (সাঃ) ওফাত পেয়ে গেছেন।

গোসলের সময়কার মোজেযা

হযরত আয়েশা (রাঃ), রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে গোসল দেয়ার পূর্বে মুসলমানরা বলাবলি করতে লাগল ঃ আমরা কি তাঁর পরনের কাপড় খুলে ফেলব, যেমন আমাদের মৃতদের কাপড় খুলে ফেলি? আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দিলেন। এই অবস্থায় তারা আওয়াজ শুনতে পেল—তাঁকে কাপড়সহ গোসল দেয়া হোক।

হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন— আমি হুযূর (সাঃ)-কে গোসল দিয়েছি। আমি তাঁর পবিত্র দেহ দেখেছি, যা জীবন ও মরণ উভয় অবস্থায় পূত-পবিত্র ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ হযরত আলী নবী করীম (সাঃ)-কে গোসল দিয়েছেন। সাধারণ মৃতদের যেরূপ অবস্থা থাকে, তা তাঁর ছিল না। এটা দেখে আলী বলে উঠলেন ঃ আমার পিতামাতা আপনার জন্যে উৎসর্গ। আপনি জীবন ও মরণে কত পাক-পবিত্র।

হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন—আলী ছাড়া কেউ যেন আমাকে গোসল না দেয়। কেননা, অন্য যে কেউ আমার গোপন অঙ্গ দেখবে, সে অন্ধ হয়ে যাবে।

হযরত আলী বলেন, গোসল দেয়ার কাজে আরও ত্রিশ ব্যক্তি আমার সহযোগী ছিল।

হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ গোসলে আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কোন অঙ্গ উত্তোলন করার ইচ্ছা করলে অঙ্গটি আপনা-আপনি উত্তোলিত হয়ে যেত। আমরা যখন তাঁর গুপ্তাঙ্গ ধৌত করতে লাগলাম, তখন আওয়াজ এল ঃ নবীর দেহ খুলবে না।

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে আবী আওন (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলীকে বললেন ঃ আমি যখন ওফাত পাব, তুমি আমাকে গোসল দেবে। আলী আরয করলেন ঃ আমি কখনও কোন মৃতকে গোসল দেইনি। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি গোসলকে খুব সহজ পাবে। হযরত আলী বলেন ঃ গোসল দেয়ার সময় তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহজে উত্তোলিত হয়ে যেত। হযরত ফযল (রাঃ) তাঁর বগল ধরে রেখেছিলেন। তিনি বলছিলেন ঃ আলী, তাড়াতাড়ি কর। আমার পিঠ ভেঙ্গে যাচ্ছে।

ইমাম ও দোয়াবিহীন জানাযার নামায

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ ওফাতের পর লোকজন রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আসে এবং জামাত ছাড়াই জানাযার নামায পড়ে। এরপর মহিলারা আসে এবং তারাও নামায পড়ে। কোন জামাতের ইমামতি করা হয়নি।

সহল ইবনে সা'দ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) মরদেহ কাফনে জড়িয়ে কবরের কিনারায় রেখে দেয়া হয়। লোকজন আসত এবং নামায পড়ত। কেউ তাদের ইমামতি করত না।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ যখন রসূলুল্লাহর (সাঃ) অসুস্থতা তীব্র আকার ধারণ করল, তখন আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনাকে গোসল দেবে কে? তিনি বললেন ঃ আমার পরিবারের নিকটতম ব্যক্তিগণ প্রচুর সংখ্যক ফেরেশতার সাথে গোসল দেবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনার নামায কে পড়াবে? তিনি বললেন ঃ গোসল দেয়ার পর সুগন্ধি লাগিয়ে কাফন পরিয়ে তোমরা আমাকে খাটে রেখে দেবে। এরপর খাটটি কবরের কিনারে রেখে কিছুক্ষণের জন্যে তোমরা সেখান থেকে ঘরে যাবে। কেননা, প্রথমে জিবরাঈল (আঃ) নামায পড়বেন।

এরপর মালাকুল মওত অনেক ফেরেশতাসহ নামায পড়বেন। এরপর আমার পরিবারবর্গ যেন নামায পড়ে। এরপর সকল মুসলমান নামায পড়বে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করা হল ঃ কে আপনাকে কবরে নামাবে? তিনি বললেন ঃ আমার পরিবারবর্গ ও প্রচুর সংখ্যক ফেরেশতা, যারা তোমাদেরকে দেখবে; কিন্তু তোমরা তাদেরকে দেখবে না।

হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে খাটে রাখার পর আওয়াজ শুনা গেল— কেউ যেন তাঁর ইমামতি না করে। কেননা, তিনি জীবনে ও মরণে ইমাম। সেমতে মুসলমানরা ইমাম ছাড়াই নামায পড়তে থাকে। তারা তাকবীর বলে এরূপ বলত ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَللّٰهُمَّ اِنَّا
نَشْهَدُ اَنْ قَدْ بَلَّغَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ وَنَصَحَ لِاُمَّتِهٖ وَجَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ حَتّٰى اَعَزَّ اللّٰهُ دِيْنَهُ وَتَمَّتْ كَلِمَتُهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ
يَّتَّبِعُ مَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ وَثَبِّتْنَا بَعْدَهُ وَاجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ .

অর্থাৎ, হে নবী! আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত। হে আল্লাহ! আমরা সাক্ষ্য দেই যে, তিনি অবতীর্ণ বিষয়সমূহ পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, উম্মাহর কল্যাণ সাধন করেছেন এবং ফী সাবীলিল্লাহ জেহাদ করেছেন। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তাঁর দীনকে শক্তিশালী করেছেন এবং তাঁর কালেমা পূর্ণতা লাভ করেছে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাঁর প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত কর, তাঁর পরে আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং আমাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত কর। এই দোয়া শুনে সকলেই "আমীন" বলত। প্রথমে পুরুষরা নামায পড়ল, এরপর মহিলারা, এরপর বালকরা।

আবূ হাযেম মাদানী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাত হলে প্রথমে মুহাজিরগণ নামায পড়ে, এরপর আনসারগণ, এরপর মদীনাবাসীরা নামায পড়ে। অতঃপর মহিলারা নামায পড়তে যায়। তারা অধৈর্যের পরিচয় দেয় এবং সশব্দে কান্নাকাটি করতে থাকে। তখন একটি আওয়াজ এল—প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির জন্যে সবর করতে হবে। প্রত্যেক বিপদের পুরস্কার আছে। প্রত্যেক প্রয়াত বস্তুর উত্তরসূরী আছে। সেই বিপদগ্রস্ত, যাকে ছওয়াব থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়।

নবী করীম (রাঃ)-এর দাফনে অনিবার্য কারণে বিলম্ব ঘটে। তিনি যে স্থানে

শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, সেখানেই সমাধিস্থ হয়েছেন। দাফনের সময়ও কতিপয় মোজেযা প্রকাশিত হয়।

হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) সোমবারে ওফাত পান এবং বুধবার দিবাগত রাত্রে সমাধিস্থ হন।

সহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাঃ) এক প্রশ্নের জওয়াবে বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সোমবারে ওফাত পান এবং সোমবার ও মঙ্গলবার পর্যন্ত রক্ষিত থাকেন। অবশেষে বুধবারে তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মসজিদে দাফন করা হবে, না বাকী কবরস্তানে–এ বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) বলেছিলেন যে, যে নবীর যেখানে ইন্তেকাল হয়, তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়। সেমতে ওফাতের জায়গাতেই তাঁর জন্যে কবর খনন করা হয়।

হযরত মালেক ইবনে ওবায়দ (রাঃ) বলতেন, রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাত হলে হযরত আবূ বকরকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওফাত পেয়েছেন? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই। প্রশ্ন হল ঃ নামায কিরূপে পড়া হবে? তিনি বললেন ঃ নামাযের জন্যে মানুষ দলে দলে যেতে থাকবে এবং নামায পড়তে থাকবে। প্রশ্ন করা হল ঃ তাঁকে কোথায় দাফন করা হবে? তিনি বললেন ঃ সেখানেই দাফন করা হবে, যেখানে পবিত্র রূহ কব্য করা হয়েছে।

ইবনে সাঈদ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কবরে নামানোর সাথে সাথে আমরা আমাদের অন্তরের অবস্থা পরিবর্তিত অনুভব করি।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ যে দিন নবী করীম (সাঃ) ওফাত পান, মদীনার প্রতিটি বস্তু তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আমরা হাতের মাটি ঝাড়ার পূর্বেই অন্তরে অভূতপূর্ব পরিবর্তন অনুভব করি। যে দিন রসূলে করীম (সাঃ) ওফাত পান, আমি সে দিনের চেয়ে কুদিন আর দেখিনি।

শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা

হযরত জাবের (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাত হলে ফেরেশতাগণ তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। পরিবারের সদস্যবর্গ ফেরেশতাগণকে দেখতেন না– অনুভব করতেন। ফেরেশতাগণ বললেন ঃ

আসসালামু আলাইকুম আহলাল বায়তি ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু– প্রত্যেক বিপদে সবর করবে। প্রত্যেক মৃতের উত্তরসূরী আছে। আল্লাহর উপর ভরসা রাখ এবং তাঁর কাছেই আশাবাদী হও। সেই বঞ্চিত, যাকে ছওয়াব থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর ওফাতের

পর সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গেলেন। এক ব্যক্তি এল, যার শ্মশ্রু সাদা ও লাল ছিল। সে ছিল শুভ্র ও সুঠামদেহী। সে কাঁদল এবং সাহাবায়ে কেরামকে বলল ঃ প্রত্যেক বিপদে সবর করতে হবে। প্রত্যেক মৃতের বিনিময় ও উত্তরসূরী আছে। আল্লাহর কাছেই দোয়া কর। বিপদগ্রস্ত সেই ব্যক্তি, যাকে ছওয়াব থেকে বঞ্চিত করা হয়। লোকটি যখন ফিরে গেল, তখন সাহাবায়ে কেরাম একে অপরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনারা এই লোকটিকে চিনেন কি? হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) বললেন ঃ আমরা চিনি। ইনি হুযূর (সাঃ)-এর ভাই হযরত খিযির (আঃ)।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কবরে নামায পড়া হারাম। হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) অন্তিম রোগশয্যায় এরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ ইহুদী ও খৃস্টানদের প্রতি অভিসম্পাত করুন, তারা তাদের পয়গম্বরগণের কবরসমূহকে মসজিদ (সেজদা করার স্থান) করে নিয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ এরূপ না হলে হুযূর (সাঃ) তাঁর কবর মোবারককে উঁচু তৈরী করার আদেশ করতেন। কিন্তু তাঁর কবরকে মসজিদ করে নেয়ার আশংকায় তিনি উঁচু করতে বলেননি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র দেহ কবরে সংরক্ষিত আছে। হযরত আওস ইবনে আওস ছকফী রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ উত্তম দিন হচ্ছে জুমআর দিন। এ দিন আমার প্রতি অধিক পরিমাণে দুরূদ প্রেরণ কর। তোমাদের দুরূদ কবরে আমার সামনে পেশ করা হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ তখন পর্যন্ত পবিত্র দেহ সংরক্ষিত থাকবে কি? তিনি বললেন ঃ পয়গম্বরগণের দেহ ভক্ষণ করা আল্লাহ পাক মৃত্তিকার জন্যে হারাম করে দিয়েছেন।

হযরত হাসান (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ রূহুল কুদ্দুস (জিবরাঈল) যার সাথে কথা বলেছেন, তাঁকে খাওয়ার সাধ্য মৃত্তিকার নেই।

আবুল আলিয়া রেওয়ায়েত করেন ঃ পয়গম্বরগণের দেহ মৃত্তিকা নষ্ট করতে পারে না।

রসূলে আকরাম (রাঃ) কবর মোবারকে জীবিত আছেন। সেখানে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছে, যে মানুষের সালাম পৌঁছায় এবং তিনি সালামের জওয়াব দেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার কবরের কাছে দাঁড়িয়ে আমার প্রতি দুরূদ প্রেরণ করবে, আমি তার দুরূদ স্বয়ং শুনব। আর যে দূর থেকে দুরূদ প্রেরণ করবে, তার দুরূদ আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে।

হযরত আম্মার (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন–

আল্লাহ তা'আলার একজন ফেরেশতা আছে। সে সমগ্র সৃষ্টির কথাবার্তা শ্রবণ করে। সে আমার কবরে নিযুক্ত থাকবে। কেউ আমার প্রতি দুরূদ প্রেরণ করলে তা এই ফেরেশতা আমার কাছে পৌঁছাবে।

হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে– তোমরা যেখানেই থাক, আমার প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করতে থাক। তোমাদের দুরূদ ও সালাম আমার কাছে পৌঁছতে থাকবে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে ঃ আল্লাহ তা'আলার অনেক ফেরেশতা ভূপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করে এবং আমার উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌঁছায়।

আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা আমার রূহ ফিরিয়ে দিবেন এবং আমি তার সালামের জওয়াব দিব।

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি গ্রীষ্মের গরম রাতে মসজিদে নববীতে এলে কবর মোবারক থেকে আযানের ধ্বনি শুনতে পেতাম। অন্য এক রেওয়ায়েতে তিনি বলেন ঃ আমি গরমের দিনে মসজিদে এসে আযান ও একামতের ধ্বনি শুনতে পেতাম।

হযরত আনাস রেওয়ায়েত করেন ঃ নবীগণ নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন এবং সেখানেই নামায পড়েন।

কাযী ইসমাঈল (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে ঃ আমার জীবন তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। আমার মরণও তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। তোমাদের আমলসমূহ আমার সামনে পেশ করা হবে। সৎ আমলের জন্যে আমি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করব এবং মন্দ আমলের জন্যে আল্লাহর কাছে মাগফেরাত চাইব।

আতা ইবনে আবী রাবাহ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন বিপদে পতিত হলে সে যেন আমার ওফাতের বিপদকে স্মরণ করে। কেননা, আমার ওফাতের বিপদ সর্ববৃহৎ বিপদ।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্দা উত্তোলন করলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে হযরত আবূ বকরের পেছনে নামায পড়তে দেখলেন। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন ঃ নবীর ওফাতের পূর্বে তার উম্মতের এক ব্যক্তি ইমামতি করছে। এরপর তিনি বললেন ঃ মুসলমানগণ, আমার যে কেউ কোন বিপদে পতিত হয়, সে যেন আমার এই বিপদকে স্মরণ করে সবর করে নেয়। কেননা, আমার পরে কাউকে আমার বিপদ অপেক্ষা বেশী বিপদে ফেলা হবে না।

হযরত উম্মে সালামাহ্ থেকে বর্ণিত আছে ঃ তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর ওফাত স্মরণ করে বললেন ঃ এই বিপদের পর আমরা যখন নিজেদের কোন

বিপদকে সামনে রেখেছি, তখন আমাদের বিপদ আমাদের দৃষ্টিতে তুচ্ছই মনে হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমার পিতা (হযরত আবূ বকর) অসুস্থ হয়ে এই ওসিয়ত করলেন ঃ আমার ওফাতের পর আমাকে হুযূর (সাঃ)-এর কবরের কাছে নিয়ে যাবে এবং এই আরয করবে, ইনি আবূ বকর। তাঁকে আপনার কাছে দাফন করতে চাই। যদি অনুমতি পাওয়া যায়, তবে সেখানে দাফন করবে। নতুবা বাকী গোরস্তানে নিয়ে যাবে। সেমতে ওফাতের পর তাকে কবর শরীফের কাছে নিয়ে যাওয়া হল এবং বলা হল ঃ ইনি আবূ বকর। ইনি আপনার কাছে সমাহিত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছেন। তখনই অনুমতিসূচক এই আওয়াজ শুনা গেল–

أُدْخُلُوْا وَكَرَامَةٌ.

অর্থাৎ, কিন্তু আমরা কাউকে দেখলাম না।

হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আবূ বকরের ওফাতের সময় ঘনিয়ে এলে তিনি আমাকে শিয়রে বসালেন এবং বললেন ঃ আমি মারা গেলে তুমি আমাকে সেই হাতে গোসল দেবে, যে হাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে গোসল দিয়েছ। সুগন্ধি মাখার পর আমাকে কবর মোবারকে নিয়ে যাবে এবং হুযূর (সাঃ)-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করবে। যদি দরজা খুলে যায়, তবে আমাকে সেখানেই দাফন করে দিবে। নতুবা মুসলমানদের গোরস্তানে নিয়ে যাবে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আবূ বকরকে গোসল দেয়া হল এবং কাফন পরানো হল। অতঃপর আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! ইনি আবূ বকর। অনুমতি প্রার্থনা করেন। এরপর আমি দরজা খুলে যেতে দেখলাম। কেউ বলল ঃ

أُدْخُلُوا الْحَبِيْبَ اِلٰى حَبِيْبِهٖ فَاِنَّ الْحَبِيْبَ اِلَى الْحَبِيْبِ مُشْتَاقٌ.

অর্থাৎ, বন্ধুকে বন্ধুর কাছে প্রবেশাধিকার দাও। কেননা, বন্ধু বন্ধুর জন্যে পাগলপাড়া

ওফাতের পর বিভিন্ন যুদ্ধে প্রকাশিত মোজেযা

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি আলা ইবনে হাযরামীর নেতৃত্বে জেহাদে গমন করলাম। সেখানে তার অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হল। আমি জানি না, এগুলোর মধ্যে কোন্ ঘটনাটি অধিক আশ্চর্যজনক। আমরা এক নদীর তীরে পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নাম নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়। সেমতে আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে নদী পার হয়ে গেলাম। পানিতে কেবল আমাদের উটের পায়ের তালু সিক্ত হল।

ফেরার পথে আমরা এক বালুকাময় মরুভূমির উপর দিয়ে গমন করলাম, যেখানে পানির নাম-নিশানা পর্যন্ত ছিল না। হযরত আলা দু'রাকআত নামায পড়ে দোয়া করলেন। এরপরই আমরা মেঘমালাকে ঢালের মত বিদ্যমান দেখতে পেলাম। দেখতে দেখতে এই মেঘমালা মশকের মুখ খুলে দিল। এ স্থানেই আলা ইবনে হাযরামীর ইন্তেকাল হয়ে গেল। আমরা তাঁকে সেখানেই দাফন করে দিলাম। কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর আমরা আশংকা করলাম যে, কোন হিংস্র প্রাণী তাঁকে খেয়ে না ফেলে। আমরা ফিরে এলাম। কিন্তু তাঁর এবং তাঁর কবরের কোন চিহ্ন দেখলাম না।

হযরত ইবনুল আকইয়াল বর্ণনা করেন ঃ সেনাপতি সা'দ দজলা নদীর তীরে পৌঁছে নৌকা তলব করলেন। কিন্তু কোন নৌকা পাওয়া গেল না। সফর মাসের কয়েক দিন তারা সেখানে অবস্থান করলেন। ইতিমধ্যে নদীতে জোয়ারের পানি এসে গেল। সা'দ স্বপ্নে দেখলেন মুসলিম বাহিনী নদী পথেই ওপারে পৌঁছে গেছে। অথচ দজলা তখন বিক্ষুব্ধ ও প্রমত্ত ছিল। সেনাপতি সা'দ নদী পার হওয়ার ইচ্ছায় সৈন্যবাহিনীকে আদেশ দিলেন ঃ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড় এবং এই দোয়া পাঠ কর–

نَسْتَعِيْنُ بِاللّٰهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ .

অর্থাৎ, আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁর উপর নির্ভর করি। আল্লাহ আমাদের জন্যে যথেষ্ট। তিনি চমৎকার কার্য নির্বাহী। মহান সুউচ্চ আল্লাহ্ ছাড়া শক্তি ও সামর্থ আশা করা যায় না।

এরপর গোটা বাহিনী দজলার পানিতে নেমে পড়ল এবং তরঙ্গমালার পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে গেল। তারা পরস্পরে আলাপচারিতাও করত। এই অভূতপূর্ব শৌর্যবীর্য দেখে পারস্যবাসীরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তারা পরাজয় স্বীকার করে নিল। মুসলিম বাহিনী ১৪ হিজরীতে পারস্যে প্রবেশ করে এবং পারস্য রাজের প্রাসাদ ও অগণিত ধনসম্পদ অধিকার করে নেয়।

আবু ওছমান বর্ণনা করেন ঃ আমরা দজলা নদীকে ঘোড়া ও চতুষ্পদ জন্তু দিয়ে ঢেকে নিয়েছিলাম। এর উভয় প্রান্ত পর্যন্ত পানি দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। আমরা যখন পারস্যবাসীদের দিকে ধাবমান হলাম, তখন আমাদের অশ্বের গ্রীবাস্থ কেশর থেকে পানি টপকে পড়ছিল। অশ্ব হন্‌হন্ রবে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিল। এই দৃশ্য দেখে পারসিক বাহিনী লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেল। একটি পিয়ালা ছাড়া আমাদের কোন বস্তু পারসিকদের কাছে যায়নি। পিয়ালাটি পুরাতন রশি দিয়ে

বাঁধা ছিল। রশি ছিঁড়ে যাওয়ায় রশি পানিতে ভেসে যায়। ঢেউ-এর তোড়ে পিয়ালাটি আবার আমাদের কাছে ফিরে আসে এবং আসল মালিকের হস্তগত হয়।

হাবীব ইবনে সাহবান (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ মাদায়েন যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী দজলা অতিক্রম করলে পারসিকরা বলে উঠল ঃ এরা মানুষ নয়-জিন।

সোলায়মান ইবনে মুগীরা রেওয়ায়েত করেন ঃ আবূ মুসলিম খাওলানী প্রমত্ত দজলার পানিতে চলতে শুরু করেন। এক রেওয়ায়েত আছে, আবূ মুসলিম দজলার তীরে দাঁড়িয়ে গেলেন, আল্লাহর হামদ করলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে নদী পার করিয়েছেন। এরপর তিনি ঘোড়াকে শাসালেন। ঘোড়া তাকে নিয়ে পানিতে নেমে গেল। এরপর বাহিনীর সকলেই তাঁর পিছনে নদী পার হয়ে গেল। ওপারে পৌঁছে আবূ মুসলিম সঙ্গীদেরকে বললেন ঃ তোমাদের কোন বস্তু হারিয়ে থাকলে বল। আমরা তা ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করব।

আবূ সফর রেওয়ায়েত করেন ঃ খালিদ ইবনে ওয়ালীদ হীরা পৌঁছলে তাঁকে সেখানকার বিষ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে বিষ নিয়ে এস। অতঃপর তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলে সেই বিষ পান করে ফেললেন। বিষ অকার্যকর হয়ে গেল। এক রেওয়ায়েতে আছে-হীরাবাসীরা খালিদ ইবনে ওয়ালীদের কাছে আবদুল মালীহকে প্রেরণ করল। তার সঙ্গে ছিল প্রাণঘাতী বিষ। খালিদ এই দোয়া পাঠ করলেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ رَبِّ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَيْئٌ

অর্থাৎ,আল্লাহর নামে পান করছি, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর পালনকর্তা। সেই আল্লাহর নামে পান করছি, যার নামে পান করলে কোন বস্তু ক্ষতি করতে পারে না।

এরপর তিনি বিষ খেয়ে ফেললেন। বিষ তার কোন ক্ষতি করল না। আবদুল মালীহ্ ফিরে গিয়ে সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলল ঃ মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তি করে নাও।

হযরত খায়ছামা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদের কাছে আগমন করল। তার কাছে শরাব ছিল। খালিদ দোয়া করলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ عَسَلًا (আল্লাহ, একে মধু করে দাও।) ফলে, সেই শরাব মধু হয়ে গেল। ইবনে আবিদ্দুনিয়ার রেওয়ায়েতে আছে-এক ব্যক্তি শরাব নিয়ে

যাচ্ছিল। হযরত খালিদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এটা কি? সে বলল ঃ সিরকা। খালিদ বললেন ঃ আল্লাহ্, একে সিরকা করে দাও। এরপর সকলেই দেখল যে, সেই শরাব সিরকা হয়ে গেল।

হারেছ ইবনে আবদুল্লাহ ইযদী রেওয়ায়েত করেন ঃ আবূ ওবায়দা ইবনুল জাররাহ সেনাবাহিনী নিয়ে ইয়ারমুক উপনীত হলে তার কাছে জিরজীর নামক এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ আমি রোমক সেনাপতি মাহানের দূত। মাহান আপনাদের সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক। তাই কোন সমঝদার ব্যক্তিকে পাঠান, যে তার প্রশ্নের সঠিক জওয়াব দিতে পারে। আবূ ওবায়দা হযরত খালিদকে মাহানের কাছে যেতে বললেন। খালিদ বললেন ঃ আমি সকাল বেলায় যাব। এরপর নামাযের সময় হল। মুসলিম সৈন্যরা নামায পড়তে লাগল। রোমক দূত তাদেরকে নামায পড়তে এবং দোয়া করতে দেখতে লাগল। অতঃপর সে আবূ ওবায়দাকে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনারা এই ধর্ম কবে গ্রহণ করেছেন? আবূ ওবায়দা বললেন ঃ বিশ বছরের কিছু উপরে হবে। সে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনাদের রসূল অন্য কোন নবীর আগমনের সংবাদ দিয়েছেন কি? আবূ ওবায়দা বললেন ঃ না। বরং তিনি বলেছেন যে, তাঁর পরে কেউ নবী হবে না। তিনি আরও বলেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। দূত একথা শুনে বলল ঃ আমিও এবিষয়ের সাক্ষ্য দেই।

হযরত ঈসা (আঃ) আমাদেরকে একজন নবীর সংবাদ দিয়েছেন, যিনি উটের পিঠে সওয়ার হবেন। সেই নবী নিশ্চিতরূপে তিনিই। আপনাদের নবী হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে কি বলেন? আবূ ওবায়দা বললেন ঃ আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ·

অর্থাৎ, নিশ্চয় ঈসার দৃষ্টান্ত আল্লাহর কাছে আদমের অনুরূপ, যাকে তিনি মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ পাক আরও বলেন ঃ

يٰۤاَهْلَ الْكِتَابِ لَاتَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ ·

অর্থাৎ, গ্রন্থধারীরা, তোমরা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না।

একজন দোভাষী রোমক ভাষায় এসব আয়াতের উদ্দেশ্য দূতকে বুঝিয়ে দিল। সে বলল ঃ নিঃসন্দেহে হযরত ঈসা (আঃ) এরূপই। আপনাদের নবী তিনিই, যার সম্পর্কে হযরত ঈসা (আঃ) সুসংবাদ দিয়েছেন। অতঃপর দূত মুসলমান হয়ে গেল।

হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক হয়ে আলেকজান্দ্রিয়া গেলাম। সেখানকার অধিপতি আমার

কাছে একজন দূত প্রেরণ করল, যাতে আলোচনার জন্যে আমি কাউকে তার কাছে প্রেরণ করি। আমি নিজেই তার সাথে আলোচনার জন্যে গেলাম এবং তাকে বললাম ঃ আমরা আরব। আমরা বায়তুল্লাহর প্রতিবেশী। ইতিপূর্বে আমরা মৃত ভক্ষণ করতাম এবং লুটতরাজ করতাম। আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আবির্ভূত হল। সে বলল ঃ আমি আল্লাহর রসূল। সে আমাদেরকে এমন এমন কাজ করতে বলল, যা আমরা জানতাম না। সে আমাদেরকে বাপ-দাদার ধর্ম অনুসরণ করতে মানা করল। আমরা তাকে মূল্য দিলাম না, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলাম এবং তাকে গালিগালাজ করলাম। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক তাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করল, তার প্রতি ঈমান আনল এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার করল। আমাদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হল। যুদ্ধে সে বিজয়ী হল। একথা শুনে সম্রাট বলল ঃ আল্লাহর রসূল ঠিকই বলেছেন। আমাদের পয়গম্বরগণের শিক্ষাও ছিল অনুরূপ। আমরা আমাদের নবীগণের শিক্ষা মেনে চলি। আপনারাও যতদিন নবীর শিক্ষা মেনে চলবেন, অপরাজেয় থাকবেন। কিন্তু যদি খেয়ালখুশীর অনুসরণ করেন, তবে শক্তি ও সংখ্যায় আমাদেরকে অতিক্রম করতে পারবেন না।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ হযরত আবূ তালহা জেহাদের উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক সফরে রওয়ানা হন এবং সফরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। সাতদিন পর তারা একটি দ্বীপে অবতরণ করেন এবং সেখানেই মৃতদেহ দাফন করেন। এই সাত দিনে মৃতদেহে কোন পরিবর্তন আসেনি।

একটি অক্ষয় মোজেযা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যার হজ্জ কবুল হয়, তার নিক্ষিপ্ত কংকরসমূহ আসমানে তুলে নেয়া হয়।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হাজীগণের নিক্ষিপ্ত অগণিত কংকর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ যে হজ্জ কবুল হয়, তার কংকরসমূহ উপরে তুলে নেয়া হয়। এরূপ না হলে কংকরের সুবিশাল পাহাড় গড়ে উঠত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, কংকর তুলে নেয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। যে সকল কংকর কবুল হয়, সেগুলো তুলে নেয়া হয় এবং যেগুলো কবুল হয় না, সেগুলো ছেড়ে দেয়া হয়।

হযরত আবূ নঈম (রহঃ) বলেন ঃ এটি একটি প্রকাশ্য মোজেযা, যা আমাদের প্রিয় নবীর সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। কেননা, তাঁর শরীয়তই হজ্জ ফরয করেছে।

সমাপ্ত